স্টিফেন হকিং ও লিওনার্ড ম্লোডিনো

অ্যা ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম

অনুবাদ : আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

অ্যা ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম

মূল

স্টিফেন হকিং

লিওনার্ড স্লোডিনো

অনুবাদ

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

www.pathagar.com

অ্যা ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম
মূলঃ স্টিফেন হকিং লিওনার্ড ম্লোডিনো
অনুবাদঃ আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

স্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭

অন্বেষা ৫৫৩

প্রকাশক
মো. শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
৯ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৯৮৫, ০১৯১১৩৯৪৯১৭

প্রচ্ছদ
লেখক

অক্ষর বিন্যাস
মোঃ নাছির উদ্দিন

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

আমেরিকা পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ২৭০.০০ টাকা মাত্র

A Briefer History of Time by
Stephen Hawking and Leonard Mlodinow
Translated by Abdullah Adil Mahmood.
First Published February Book Fair 2017
Md. Shahadat Hossain
Annesha Prokashon, 9 Banglabazar. Dhaka.

e-mail : annesha2005@gmail.com

Price : Tk. 270.00 only US $ 11.00
ISBN : 978 984 92773 0 9 Code : 553

www.pathagar.com

ভূমিকা

এ বইটির নাম A Briefer History of Time, যার অর্থ আগের বইটির সাথে এর পার্থক্য মাত্র দুটো অক্ষরের। A Brief History of Time বইটি ২৩৭ সপ্তাহ ধরে সানডে টাইমস বেস্ট সেলার বইয়ের তালিকায় ছিল। বিশ্বের প্রতি ৭৫০ জন মানুষের বিপরীতে বইটির একটি করে কপি বিক্রি হয়েছিল, যা উল্লেখ করার মতো একটি সাফল্য। বইটিতে আধুনিক পদার্থবিদ্যার অন্যতম জটিল কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। অন্যদিকে এই জটিল বিষয়গুলোই কিন্তু কৌতূহলী মনকে অসম্ভব রকম নাড়া দেয়। কারণ এর মূলে আছে কিছু বড় এবং মৌলিক প্রশ্ন। আমরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে কী জানি? যা জানি তা কীভাবেই বা জানি? মহাবিশ্ব কোথা থেকে এ এবং ভবিষ্যতে এর কী হতে চলেছে? A Brief History of Time বইটির মূল আলোচ্য বিষয় ছিল এগুলোই। এ বইটিরও আলোচনার মূল অংশে এগুলোই থাকবে।

A Brief History of Time প্রকাশিত হবার পর বহু মতামত আসে। সারা বিশ্ব থেকে, সব বয়স এবং পেশার মানুষ বিভিন্ন রকম মতামত পাঠান। বইটির একটি নতুন সংস্করণ বের করার অনুরোধ আসত খুব নিয়মিত। পাঠকদের প্রত্যাশা ছিল, এতে আগের বইটির বিষয়গুলোই থাকবে, তবে তা হবে আরো স্পষ্ট ও সহজবোধ্যভাবে। অনেকেই হয়তো ভেবেছেন এই বইতে কালের ইতিহাস আরো সংক্ষেপে তুলে ধরা হবে। কিন্তু অনেকের মতামত ছিল আবার আরেকটু বেশি জানার পক্ষে, যা কলেজ পর্যায়ের কসমোলজির কোর্সের সমান মানের হবে। এ বইটি লেখার পেছনে এই উদ্দেশ্যগুলোই কাজ করেছে। বইটিতে আমরা আগের বইয়ের বিষয়গুলো অক্ষুণ্ন রেখে প্রয়োজন অনুসারে কিছু কথা যোগ করেছি। কিন্তু আবার এর পরিসর ও সহজবোধ্যতার দিকেও চোখ রেখেছি। আমরা আগের বইয়ের কিছু বিষয় বাদ দিয়েছি বলে আসলেই একে

www.pathagar.com

আগের চেয়ে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলা চলে। আসলে তা করতে গিয়ে বইটির প্রধান ও মূল বিষয়কেই আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এই সুযোগে আমরা বইটিকে আপডেটও করেছি এবং এতে নতুন তাত্ত্বিক ও পর্যবেক্ষণমূলক ফলাফল যুক্ত করেছি। যেমন পদার্থবিদ্যার সকল বলের একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব অনুসন্ধানের পথে সাম্প্রতিক অগ্রগতি এতে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে এতে স্ট্রিং থিওরির অগ্রগতির কথা আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে ডুয়ালিটি বা দ্বৈততা তথা আপাতদৃষ্টিতে দেখতে আলাদা মনে হওয়া বিভিন্ন তত্ত্বের সাদৃশ্য নিয়ে। এই সম্পর্ক এই ইঙ্গিত দেয় যে পদার্থবিদ্যায় একটি একীভূত তত্ত্ব (Unified Theory) আছেই। অন্যদিকে, এতে পর্যবেক্ষণবিষয়ক কিছু নতুন তথ্যও আছে। এতে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপ্লোরার (COBE) এবং হাবল স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে পাওয়া ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে রিচার্ড ফাইনম্যান বলেছিলেন, 'আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যেখানে আমরা এখনও নানা কিছু আবিষ্কার করছি। অনেকটা যেন আমেরিকা আবিষ্কারের মতো–এটা তো মাত্র একবারই আবিষ্কৃত হয়। আমরা এমন যুগে বাস করছি, যখন আমরা প্রকৃতির একেবারে মৌলিক নিয়মগুলো আবিষ্কার করছি।'

আমরা মহাবিশ্বের রহস্য জানার ক্ষেত্রে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক কাছে চলে এসেছি। এমন কিছু রহস্য ও তার ফলাফল সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরাই এ বইটি লেখার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য।

স্টিফেন হকিং ও লিওনার্ড স্লোডিনো

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
ভাবনায় মহাবিশ্ব ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণার ক্রমবিকাশ ১২

তৃতীয় অধ্যায়
বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ১৯

চতুর্থ অধ্যায়
নিউটনের মহাবিশ্ব ২৫

পঞ্চম অধ্যায়
আপেক্ষিক তত্ত্ব ৩৩

ষষ্ঠ অধ্যায়
স্থানের বক্রতা ৪৬

সপ্তম অধ্যায়
সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব ৫৯

অষ্টম অধায়
বিগ ব্যাং, ব্ল্যাকহোল এবং মহাবিশ্বের বিবর্তন ৭৮

নবম অধ্যায়
কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি ৯৭

দশম অধ্যায়
ওয়ার্মহোল ও টাইম মেশিন ১১৬

একাদশ অধ্যায়
প্রকৃতির বলসমূহ এবং পদার্থবিদ্যার একীভবন ১৩১

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়
উপসংহার ১৫৪

পরিভাষা ১৬০
আলবার্ট আইনস্টাইন ১৬৯
গ্যালিলিও গালিলেই ১৭১
আইজ্যাক নিউটন ১৭৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়
ভাবনায় মহাবিশ্ব

এক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর মহাবিশ্বে আমাদের বাস। এর বয়স, আকার, উন্মত্ততা এবং সৌন্দর্যের গভীরে পৌঁছতে হলে প্রয়োজন অসম্ভব রকম কল্পনাশক্তি। এই বিশাল মহাবিশ্বে আমাদের মতো মানুষের অবস্থান নগণ্য মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ জন্যই আমরা এর সব কিছু জানতে চাই, দেখতে চাই এতে আমাদের অবস্থান কোথায়। কয়েক দশক আগে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী (কারো কারো মতে তিনি ছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেল) জ্যোতির্বিদ্যার ওপরে একটি লেকচার দেন। তিনি এতে বলেন, পৃথিবী কীভাবে সূর্যের চারদিকে ঘুরেছে, সূর্য নিজেই কীভাবে আবার অনেক নক্ষত্রের সমন্বয়ে গঠিত আমাদের ছায়াপথের (galaxy) কেন্দ্রকে ঘিরে পাক খাচ্ছে ইত্যাদি।

বক্তব্য শেষ হবার পর হলের পেছন থেকে একজন ছোটখাটো বৃদ্ধা মহিলা দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি আমাদের যা বললেন, তার সব বানানো কথা। আসলে পৃথিবী হলো থালার মতো চ্যাপ্টা, আর এটি বসে আছে একটি দৈত্যাকার কচ্ছপের পিঠে।'

বিজ্ঞানীর জ্ঞানগর্ভ ও হাসিমাখা প্রশ্ন, 'কচ্ছপটি তাহলে কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে?'

মহিলা জবাব দিলেন, 'ইয়াং ম্যান, আপনি খুবই চালাক, তবে নিচে কিন্তু আসলে ঐ কচ্ছপটিই আছে!'

কচ্ছপের ওপর স্থাপিত মহাবিশ্বের চিত্রটি এখন অনেকের কাছেই হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু আমরা খুব ভালো জানি, এমনটা মনে করা ঠিক হবে কি? বিশ্ব সম্পর্কে আপনি যা জানেন অথবা জানেন বলে মনে করেন তা একটিবারের জন্য একটু ভুলে যান। এবার তাকিয়ে দেখুন রাতের আকাশের দিকে : ঐসব আলোক বিন্দুকে আপনার কী মনে হচ্ছে? এরা কি আগুনের কোনো ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ? এদের সম্পর্কে সত্যিকারের ধারণা

www.pathagar.com

করা কঠিন, কেননা এদের প্রকৃত পরিচয়ের সাথে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের কোনোই মিল নেই। নিয়মিত রাতের আকাশের খোঁজখবর রেখে থাকলে আপনি গোধূলির সময় একটি ক্ষণস্থায়ী আলোকে দিগন্তের ওপর ভেসে থাকতে দেখবেন। এটা আসলে বুধ গ্রহ। কিন্তু এর সাথে আমাদের গ্রহের (পৃথিবী) কোনোই মিল নেই। বুধ গ্রহের এক দিন তার এক বছরের তিন ভাগের দুই ভাগের সমান। দিনেরবেলায় সূর্যের উপস্থিতিতে এর তাপমাত্রা ৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে, যা রাতেরবেলায় নেমে আসে হিমাঙ্কের ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে। তবে বুধ গ্রহ আমাদের গ্রহের চেয়ে আলাদা–এটা বুঝতে পারার চেয়ে নক্ষত্র যে আলাদা সেটা বোঝা তুলনামূলক সহজ। একেকটি নক্ষত্র একেকটি বিশাল চুল্লি, যা প্রতি সেকেন্ডে বিলিয়ন বিলিয়ন (এক বিলিয়ন সমান একশ কোটি) পাউন্ড পদার্থ পুড়িয়ে এর কেন্দ্রের তাপমাত্রা কোটি কোটি ডিগ্রি পর্যন্ত উন্নীত করে।

গ্রহ এবং নক্ষত্রদের প্রকৃত দূরত্ব কল্পনা করাও অনেক কঠিন। প্রাচীনকালে চীন দেশের মানুষ ভালো করে তারা দেখার জন্য পাথর দিয়ে টাওয়ার বানাত। গ্রহ এবং নক্ষত্রদেরকে এদের প্রকৃত দূরত্বের চেয়ে কাছে মনে করা খুব স্বাভাবিক। অন্তত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা মহাকাশের বিশাল বড় দূরত্বের সাথে পরিচিত নই। এই দূরত্বগুলো এত বেশি বড় যে এদেরকে আমাদের বহুল পরিচিত ফুট বা মাইল দিয়ে হিসাব করা অর্থহীন। এর পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করি আলোকবর্ষ নামক একটি একক, যা আলোর এক বছরে অতিক্রান্ত দূরত্বের সমান। এক সেকেন্ডে একটি আলোকরশ্মি ১,৮৬,০০০ মাইল যেতে পারে। অতএব, আলোকবর্ষ অনেক বড় একটি দূরত্ব। সূর্যের পরে আমাদের নিকটতম নক্ষত্র হলো প্রক্সিমা সেন্টোরি (এর অপর নাম আলফা সেন্টোরি সি)। এটি প্রায় ৪ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এই দূরত্বটি এত বড় যে বর্তমান সময়ে আমাদের কল্পনাযোগ্য সবচেয়ে দ্রুতগামী মহাকাশযানে চেপে ওখানে যেতে প্রায় ১০ হাজার বছর সময় লাগবে।

প্রাচীনকালেও মানুষ মহাবিশ্বকে বুঝতে অক্লান্ত চেষ্টা করেছে। কিন্তু তখনো এ সময়ের মতো গণিত ও বিজ্ঞানের এমন অগ্রগতি হয়নি। বর্তমানে আমাদের কাছে আছে উন্নত যন্ত্র। যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক যন্ত্র হিসেবে রয়েছে গণিত ও বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জগতে রয়েছে কম্পিউটার ও টেলিস্কোপের মতো যন্ত্র। যন্ত্রগুলোর সাহায্যে বিজ্ঞানীরা মহাকাশের অনেকগুলো তথ্যকে জোড়া দিতে পেরেছেন। কিন্তু মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমরা

www.pathagar.com

ঠিক কী জানি এবং তা কীভাবে জানি? মহাবিশ্বের উৎপত্তি কীভাবে হলো? ভবিষ্যতে এর কী হতে যাচ্ছে? মহাবিশ্বের কি কোনো শুরু ছিল? যদি থেকেই থাকে তবে তার আগে কী ছিল? সময় আসলে ঠিক কী? এর কি কোনো শেষ আছে? আমরা কি অতীতের দিকে যেতে পারি? পদার্থবিদ্যার সাম্প্রতিক অগ্রগতির মাধ্যমে দীর্ঘদিন জমে থাকা এসব প্রশ্নের মধ্যে অনেকগুলোর জবাব হাতে এসেছে। একসময় হয়তো এই প্রশ্নগুলোর জবাব পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে ঘোরার মতোই পরিষ্কার হয়ে যাবে। অথবা হয়তো কচ্ছপের টাওয়ারের মতো হাস্যকর মনে হবে। এর উত্তর কেবল সময়ই বলতে পারে, তা সময়ের পরিচয় যাই হোক।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণার ক্রমবিকাশ

ক্রিস্টোফার কলম্বাসের সময়েও এমন মানুষ খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যেত, যারা ভাবত পৃথিবী সমতল। এমনকি আজকের দিনেও এমন কিছু লোক খুঁজে পাওয়া যাবে। তবু আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার শুরু কিন্তু সেই গ্রিকদের আমলেই। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৩৪০ বছর আগে অ্যারিস্টটল On the Heavens (বাংলায় বলা চলে মহাকাশ প্রসঙ্গ) নামে একটি বই লিখেন। বইটিতে তিনি থালার মতো চ্যাপ্টা পৃথিবীর বদলে গোলক আকৃতির পৃথিবীর সপক্ষে কিছু ভালো যুক্তি তুলে ধরেন।

একটি যুক্তি ছিল চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে। অ্যারিস্টটল বুঝতে পেরেছিলেন, পৃথিবী সূর্য ও চাঁদের মাঝে এসে পড়লে চন্দ্রগ্রহণ হয়। এ অবস্থায় চাঁদে পৃথিবীর ছায়া পড়ার কারণে গ্রহণটি ঘটে। অ্যারিস্টটল দেখলেন, পৃথিবীর ছায়া সব সময় গোল হয়ে পড়ে। পৃথিবী যদি চ্যাপ্টা চাকতি বদলে গোলকের মতো হয়, তবেই কেবল এমনটা সম্ভব। পৃথিবী যদি চাকতির মতো সমতল হতো, তবে গোল ছায়া শুধু তখনই পড়ত যখন সূর্য চাকতির ঠিক কেন্দ্র বরাবর থাকত। অন্য সময় ছায়া লম্বা হয়ে উপবৃত্তের মতো হয়ে যেত (একটি বৃত্তকে একদিকে টেনে লম্বা করে দিলে যে আকৃতি পাওয়া যায় সেটিই হলো উপবৃত্ত)।

পৃথিবীর আকৃতি গোলকীয় হবার পক্ষে গ্রিকদের আরেকটি যুক্তি ছিল। পৃথিবী যদি সমতল হতো, তবে দূর থেকে আসা কোনো জাহাজকে দিগন্তের কাছে একটি ছোট্ট ও সাধারণ বিন্দু হিসেবে দেখা যেত। এরপর ক্রমেই কাছে আসতে থাকলে এর আরো খুঁটিনাটি যেমন পাল, কাঠামো ইত্যাদি দেখা যেত। কিন্তু বাস্তবে এমন হয় না। জাহাজ আসার সময় দিগন্তের দিকে তাকালে আমরা সবার আগে দেখি জাহাজের পাল। এর আরো অনেকক্ষণ পরে চোখে পড়ে এর মূল কাঠামো। জাহাজের লম্বা মাস্তুল এর মূল কাঠামো থেকে অনেক উঁচুতে থাকায় সবার আগে একে দিগন্তে উঁকি দিতে দেখা যায়। এ থেকে প্রমাণ হয়, পৃথিবীর আকৃতি গোলকের মতো (সমতল নয়)।

www.pathagar.com

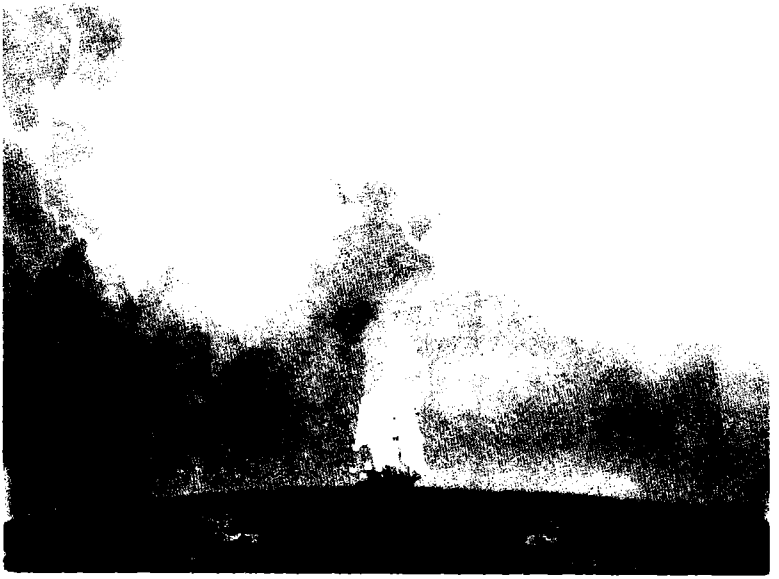

চিত্র : দিগন্ত থেকে আসা জাহাজের ছবি

পৃথিবীর আকৃতি গোলকীয় হবার কারণে দিগন্ত থেকে আসা জাহাজের পাল ও মাস্তুল এর মূল কাঠামোর আগে চোখে পড়ে।

রাতের আকাশের ব্যাপারেও গ্রিকরা দারুণ উৎসাহী ছিল। অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই কয়েক শতক ধরে মানুষ রাতের আকাশের আলোগুলোর চলাচলের তথ্য লিখে রাখত। তারা দেখল, আকাশজুড়ে হাজার হাজার আলোর সবাই একই সাথে চললেও এদের পাঁচজন (চাঁদ বাদে) এই নিয়ম মানছে না। কখনো এরা নিয়মমাফিক পূর্ব-পশ্চিম পথে চলতে থাকে, কখনো আবার যেতে থাকে উল্টো দিকে। এই আলোগুলোর নাম দেওয়া হলো প্ল্যানেট বা গ্রহ[১] (Planet)। ইংরেজি প্ল্যানেট শব্দটি গ্রিক ভাষায় যাযাবর বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। গ্রিকদের চোখে শুধু পাঁচটি গ্রহই ধরা পড়েছিল, কারণ আমরা খালি চোখে বাকি গ্রহদের দেখতে পাই না। আমরা খালি চোখে দেখি বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে। বর্তমানে আমরা জানি, গ্রহরা কেন এই অদ্ভুত পথে চলে। আমাদের সৌরজগতের সাপেক্ষে নক্ষত্রদেরকে প্রায় স্থির বলা চলে, কিন্তু গ্রহরা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এ কারণে রাতের আকাশে গ্রহদের চলাচলের পথ দূরবর্তী নক্ষত্রদের তুলনায় অনেক জটিল।

www.pathagar.com

অ্যারিস্টটল মনে করতেন, পৃথিবী স্থির এবং সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ এবং নক্ষত্ররা পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। তাঁর এই বিশ্বাসের কারণ ছিল একটি অতিন্দ্রীয় যুক্তি। পৃথিবীর অবস্থান মহাবিশ্বের কেন্দ্রে এবং বৃত্তাকার গতিই হচ্ছে সবচেয়ে নিখুঁত। দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরেক গ্রিক পণ্ডিত টলেমি এই ধারণাকে একটি পরিপূর্ণ মডেলে রূপ দান করেন। তাঁর গবেষণা সম্পর্কে তিনি আবেগসিক্ত ভাষায় বলেন, 'বৃত্তাকার পথে চলনশীল নক্ষত্রদের গতির কথা ভাবতে থাকলে আমার মনেই হয় না আমি এই পৃথিবীতে আছি।'

টলেমির মডেলে আটটি ঘূর্ণায়মান গোলক পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছিল। এর প্রতিটি আগেরটি চেয়ে ক্রমান্বয়ে বড় ছিল, অনেকটা রুশদের নেস্টিং ডলের[২] মতো। এই গোলকদের কেন্দ্রে ছিল পৃথিবীর অবস্থান। সবচেয়ে বাইরের গোলকের পরে কী আছে তা কখনোই স্পষ্ট করে বলা হয়নি, তবে একে মানুষের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের (Observable Universe) মধ্যেও গণ্য করা হয়নি। ফলে বাইরের গোলকটিই ছিল মহাবিশ্বের সীমানা বা ধারক। এই গোলকের মধ্যে নক্ষত্ররা স্থিরভাবে বসেছিল, ফলে গোলকটি আবর্তন করলেও নক্ষত্রদের পারস্পরিক অবস্থান একই থাকত এবং এরা দলবেঁধে একই সাথে পুরো আকাশজুড়ে আবর্তন করত।

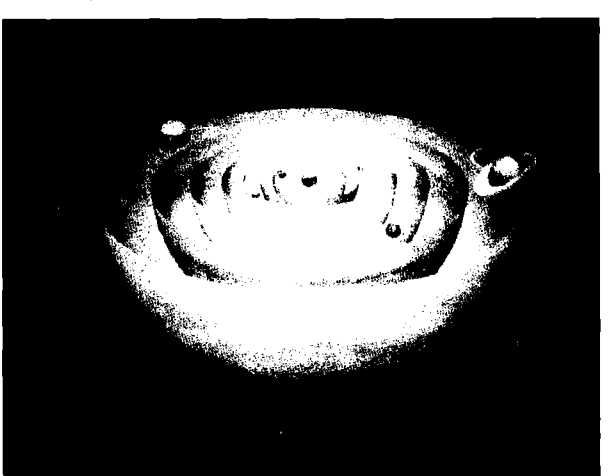

চিত্র : টলেমির মডেল

টলেমির মডেলে পৃথিবীর অবস্থান ছিল মহাবিশ্বের কেন্দ্রে এবং একে ঘিরে রাখা আটটি গোলক মহাকাশের সবগুলো বস্তুকে ধারণ করে রেখেছিল

www.pathagar.com

গ্রহদের গোলক ছিল ভেতরের দিকে। এরা এদের নিজস্ব গোলকের মধ্যে নক্ষত্রদের মতো স্থির ছিল না বরং গোলকের মধ্যেই এরা আবার ছোট ছোট বৃত্তাকার পথে চলত। এই বৃত্তাকার পথকে বলা হত মন্দবৃত্ত (Epicycle)। গ্রহরা গোলকের সাথে ঘূর্ণনের পাশাপাশি নিজেরাও গোলকের মধ্যে চলাচল করছে বলে পৃথিবী থেকে দেখতে এদের চলাচলের পথকে জটিল দেখাচ্ছে। এভাবে টলেমি আকাশে গ্রহদের দৃশ্যমান কক্ষপথকে প্যাঁচানো দেখা যাচ্ছে কেন তার একটি ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হলেন।

টলেমির মডেলের সাহায্যে আকাশের বস্তুদের অবস্থানের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল। কিন্তু এই অবস্থানগুলোর সঠিক পূর্বাভাস দিতে গিয়ে মেনে নিতে হচ্ছিল যে চাঁদের কক্ষপথ একে কোনো কোনো সময় অন্য সময়ের চেয়ে পৃথিবীর দ্বিগুণ কাছে নিয়ে আসে। এটা সঠিক হলে কোনো কোনো সময় চাঁদকে অন্য সময়ের দ্বিগুণ বড় দেখানোর কথা ছিল। টলেমি তাঁর মডেলের এই খুঁত সম্পর্কে জানতেন। তবুও তাঁর মডেলটি সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল, যদিও সবাই তা মেনে নেয়নি। ধর্মগ্রন্থের সাথে মিলে যাওয়ায় খ্রিস্টানদের গির্জায়ও এই মডেলকে স্বাগত জানানো হয়। গির্জার জন্য এই মডেলের সুবিধা ছিল, এতে স্থির গোলকদের বাইরে স্বর্গ ও নরকের জন্য যথেষ্ট জায়গা উপস্থিত ছিল।

কিন্তু ১৫১৪ সালে পোলিশ যাজক নিকোলাস কোপার্নিকাস অন্য একটি মডেল উপস্থাপন করেন। সম্ভবত গির্জাবিরোধী হিসেবে পরিচিত হবার ভয়ে শুরুতে তিনি এটি প্রকাশ করেন নাম গোপন রেখে। তিনি একটি বৈপ্লবিক মতামত প্রকাশ করলেন। তাঁর মতে, মহাকাশের সব কিছু পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে–এটা সত্য নয়। বরং সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে স্থির আছে এবং পৃথিবী ও গ্রহরা সূর্যের চারপাশে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে। টলেমির মডেলের মতোই এটিও কিছুটা সফল হলো, কিন্তু পর্যবেক্ষণের সাথে পুরোপুরি মিলল না। এটি টলেমির মডেলের চেয়ে অনেক সরল ছিল বলে একে মেনে নেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু এক শতাব্দী পার হয়ে গেলেও এটি কোথাও গুরুত্ব পেল না। এরপর দুজন জ্যোতির্বিদ–জার্মানির জোহানেস কেপলার ও ইতালির গ্যালিলিও গালিলেই প্রকাশ্যে কোপার্নিকান তত্ত্বের পক্ষে অবস্থান নেন।

১৬০৯ সালে গ্যালিলিও তার কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশ দেখা শুরু করেন। তিনি বৃহস্পতির (Jupiter) দিকে তাকিয়ে দেখেন, এর চারপাশে কিছু ছোট ছোট উপগ্রহ একে প্রদক্ষিণ

www.pathagar.com

করছে। এর অর্থ হচ্ছে অ্যারিস্টটল ও টলেমিদের চিন্তা সঠিক নয়–সব কিছুকে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। একই সময়ে কেপলার কোপার্নিকাসের তত্ত্বটি উন্নত করেন। নতুন তত্ত্বের বক্তব্য ছিল, গ্রহরা বৃত্তাকার পথে নয়, চলছে উপবৃত্তাকার পথে। এই পরিবর্তনের ফলে তত্ত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ মিলে গেল। এ ছিল টলেমির মডেলের কফিনে শেষ পেরেক।

উপবৃত্তাকার কক্ষপথের মাধ্যমে কোপার্নিকাসের মডেল উন্নত হলেও কেপলার নিজে একে চূড়ান্ত মনে করতেন না। এর কারণ ছিল প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর কিছু বদ্ধমূল ধারণা, যেগুলোকে তিনি পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের চেয়ে শক্তিশালী মনে করতেন। অ্যারিস্টটলের মতো তিনিও মনে করতেন উপবৃত্তর চেয়ে বৃত্তের কম সুন্দর। তাঁর মতে, এমন ত্রুটিপূর্ণ পথে গ্রহদের চলার বিষয়টি বিশ্রী লাগছে, যা চূড়ান্ত সত্য হতে পারে না। এই ধারণা অবিশ্বাস করার পেছনে তাঁর আরেকটি কারণ ছিল। তাঁর মতে, গ্রহরা সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে সূর্যের চৌম্বক বলের কারণে, যার ফলাফল উপবৃত্তাকার পথের সাথে মেলে না। যদিও তিনি ভুল করে গ্রহদের কক্ষপথের জন্য চৌম্বক বলকে দায়ী করেছেন, তবুও আমরা তাঁকে এর পেছনে কোনো বলের উপস্থিতি থাকার বিষয়টি বুঝতে পারার জন্য কৃতিত্ব দিতে পারি। এর আরো অনেক পরে, ১৬৮৭ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন সূর্যের চারদিকে গ্রহদের কক্ষপথের সঠিক ব্যাখ্যা দেন। এটি প্রকাশিত হয় ফিলোসোফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) প্রবন্ধে। সম্ভবত এটিই পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক অবদান।

প্রিন্সিপিয়াতে নিউটনের একটি সূত্রের বক্তব্য ছিল, কোনো বল কাজ করার আগ পর্যন্ত সকল স্থির বস্তু স্থিরই থাকবে। এতে তিনি আরো দেখালেন যে বলের প্রভাবে কীভাবে একটি বস্তু চলতে শুরু করে বা গতির পরিবর্তন করে। তাহলে গ্রহরা সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে চলে কেন? নিউটনের মতে, এর পেছনে দায়ী হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট বল। তাঁর মতে, এই একই বলের কারণে ওপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু ভূমিতে ফিরে আসে। তিনি এই বলের নাম দিলেন মহাকর্ষ বা গ্র্যাভিটি (Grvaity)। নিউটনের আগে gravity শব্দটি মেজাজের রুক্ষতা বা ওজনের গুণ হিসেবেই শুধু ব্যবহৃত হত।

www.pathagar.com

এ ছাড়া মহাকর্ষ বা অন্য কোনো বলের প্রভাবে বস্তুর কী প্রতিক্রিয়া হয় তাও তিনি গাণিতিকভাবে বের করে ফেললেন। সমাধান করলেন উদ্ভূত সমীকরণগুলো। এভাবে তিনি দেখাতে সক্ষম হলেন যে সূর্যের মহাকর্ষের ফলেই পৃথিবী ও অন্য গ্রহরা উপবৃত্তাকার পথে চলে। এটি মিলে গেল কেপলারের বক্তব্যের সাথে। নিউটনের মতে, এই সূত্র মহাবিশ্বের সব কিছুর জন্যই প্রযোজ্য, তা চাই পড়ন্ত আপেল হোক অথবা গ্রহ বা নক্ষত্রই হোক। ইতিহাসে এই প্রথম কেউ গ্রহদের গতির এমন ব্যাখ্যা দিলেন, যা পৃথিবীর গতিও নিয়ন্ত্রণ করে। আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার এখানেই পথচলা শুরু।

টলেমির গোলকীয় ধারণা বাদ দিলে মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক কোনো সীমানা (সর্ববহিঃস্থ গোলক) আছে বলে মনে করার আর কোনো কারণ বাকি ছিল না। অন্যদিকে যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে রাতের আকাশের নক্ষত্ররা শুধু পৃথিবীর আবর্তনের[৩] কারণে আকাশের অবস্থান ঘুরে যাবার ফলেই তাদের অবস্থান পরিবর্তন করছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই বোঝা গেল, এরাও সূর্যের মতোই বস্তু কিন্তু অনেক দূরে অবস্থিত। আমরা শুধু পৃথিবীকেই মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে সরাইনি, বরং সূর্য এমনকি সৌরজগৎও যে মহাবিশ্বের বিশেষ কোনো অংশ হতে পারে–এমন ধারণাও বাদ দিয়েছি। মতের এই পরিবর্তনের সাথে চিন্তার জগতেও বড় একটি পরিবর্তন সাধিত হয়। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আধুনিক জ্ঞানেরও সূচনা এখানেই।

www.pathagar.com

অনুবাদকের নোট

১. পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তনের কারণে রাতের আকাশের তারাদের প্রতি রাতেই পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখা যায়। আবার সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণের কারণে প্রতি রাতের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো তারাকে আগের রাতের চেয়ে একটু পশ্চিমে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে কোনো তারাকে আগের দিনের চেয়ে প্রায় চার মিনিট আগে একই জায়গায় দেখা যায়। এভাবে চলতে চলতে এক বছর পর একটি তারাকে আবার একই সময়ে আগের জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু গ্রহরা এ রকম নির্দিষ্ট কোনো চক্র মেনে চলে না। একেকটি রাত আসতে আসতে এদেরকে কখনো পশ্চিমে আবার কখনো পুবে সরতে দেখা যায়।

২. অনেকগুলো ছোট-বড় পুতুলকে সাইজ অনুসারে একটিকে ক্রমান্বয়ে আরেকটির ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা হলে একে নেস্টিং ডল বলে।

৩. পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করায় রাতের আকাশের তারাদের পশ্চিমে যাচ্ছে বলে মনে হয়। নক্ষত্রদের আরো নানা রকম গতি থাকলেও এরা বহু দূরে থাকায় সেসব গতির ফলাফল আমাদের চোখে কয়েক শ বছরেও ধরা পড়ে না।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্য এবং এর কোনো শুরু আছে কি নেই–এসব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আগে জানা দরকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কাকে বলে। সোজা কথায় বললে, থিওরি বা তত্ত্ব হচ্ছে মহাবিশ্বের একটি মডেল বা নমুনা, অথবা সেই নমুনার কোনো সীমিত অংশবিশেষ এবং এমন একগুচ্ছ নিয়ম বা সূত্র, যে সূত্রগুলো পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যকে মডেলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারবে। এই তত্ত্ব থাকে আমাদের মস্তিষ্কে এবং এর অন্য রকম কোনো বাস্তবতা নেই (বাস্তবতার সংজ্ঞা যা হয় হোক)। একটি তত্ত্বকে ভালো বলা হয়, যদি এর মধ্যে দুটো গুণ পাওয়া যায়। এক, অনেকগুলো পর্যবেক্ষণকে এটি অল্প কথায় সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে। দুই, একে ভবিষ্যৎ পর্যবেক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস[১] দিতে হবে। অ্যারিস্টটল এমপেডোক্লেসের এই তত্ত্ব মেনে নিয়েছিলেন যে জগতের সব কিছু মাটি, বায়ু, আগুন ও পানি–এই চারটি উপাদান দিয়ে তৈরি। তত্ত্বটি যথেষ্ট সরল ছিল, কিন্তু এটি কোনো সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস দিতে পারেনি। অন্যদিকে, নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বটি উপস্থাপন করা হয় আরো সরলভাবে। এই তত্ত্বে বস্তুরা একে অপরকে তাদের ভরের সমানুপাতিক ও তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক বলে আকর্ষণ করে। তত্ত্বটি দেখতে সরল হলেও এটি অনেক নিখুঁতভাবে সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহদের গতির পূর্বাভাস দিতে পারে।

যেকোনো ভৌত তত্ত্বই (physical theory) এই অর্থে অস্থায়ী যে এটি শুধুই একটি অনুমান। একে কখনোই পুরোপুরি প্রমাণ করা যাবে না। পরীক্ষার ফলাফলের সাথে হাজারবার মিলে গেলেও আপনি কখনোই নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না এটি পরের বার বিপরীত ফলাফল দেবে না। উল্টো দিকে একটি তত্ত্বকে ভুল বলার জন্য এর বিপক্ষে একটিমাত্র পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট। বিজ্ঞানের দার্শনিক কার্ল পপার যেমন জোর দিয়ে

www.pathagar.com

বলেছেন, একটি ভালো তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে এমন অনেকগুলো পূর্বাভাস থাকবে যাদেরকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভুল বা মিথ্যা প্রমাণ করার সুযোগ থাকবে। যখনই নতুন কোনো পরীক্ষার সাথে এর পূর্বাভাস মিলে যাবে, তত্ত্বটি বেঁচে যাবে। কিন্তু কখনো নতুন কোনো পর্যবেক্ষণ এর সাথে না মিললে আমাদেরকে তত্ত্বটিকে পরিত্যাগ বা সংস্কার করতে হবে।

এটাই হচ্ছে সাধারণ নীতি। কিন্তু যিনি পরীক্ষা চালিয়েছেন তাঁর দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তো তোলা যেতেই পারে।

বাস্তবে দেখা যায় নতুন তত্ত্ব আসলে আগের তত্ত্বেরই পরিবর্ধন মাত্র। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বুধ গ্রহের গতির কথা। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের পূর্বাভাসের সাথে এর গতির সামান্য ভিন্নতা দেখা দেয়। আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব নিউটনের তত্ত্বের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন অনুমান প্রদান করে, যা পর্যবেক্ষণের সাথে ঠিক ঠিক মিলে যায়। নিউটনের তত্ত্বের জায়গায় নতুন এই তত্ত্বের জায়গা করে নিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবু এখনও আমরা বাস্তবে নিউটনের তত্ত্বই বেশি ব্যবহার করি, কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দুটো থিওরির পার্থক্য সামান্য। নিউটনের তত্ত্বের আরেকটি সুবিধা হলো এটি আইনস্টাইনের সূত্রের চেয়ে অনেক সরল।

বিজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি তত্ত্ব প্রদান করা, যা সমগ্র মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করতে পারবে। অবশ্য অধিকাংশ বিজ্ঞানীই বাস্তবে সমস্যাটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে কাজ করেন। প্রথমত, কিছু সূত্র আমাদেরকে বলছে যে সময়ের সাথে সাথে মহাবিশ্বের কীরূপ পরিবর্তন ঘটছে। (আমরা যদি কোনো একটি সময়ে মহাবিশ্বের অবস্থা জানি, এই ভৌত সূত্রগুলো আমাদের বলবে পরবর্তী কোনো সময়ে মহাবিশ্ব কী অবস্থায় থাকবে।) দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো মহাবিশ্বের আদি অবস্থা নিয়ে। কেউ কেউ মনে করেন, বিজ্ঞানের উচিত শুধু প্রথম অংশটি নিয়ে কাজ করা। তাঁদের মতে, মহাবিশ্বের আদি অবস্থার বিষয়টি অধিবিদ্যা[২] বা ধর্মের আলোচ্য বিষয়। তাঁদের মতে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মহাবিশ্বের সূচনা নিজের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই করেছেন[৩]। তা হলেও হতেও পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ঈশ্বর মহাবিশ্বকে কোনো অনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াতেই বিবর্তিত হতে দিতেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে তিনি একে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন করেছেন, যা কিছু সূত্র মেনে চলছে। কাজেই মহাবিশ্বের আদি অবস্থাও কিছু নিয়ম মেনে চলছিল মনে করাটাই যুক্তির দাবি।

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের সব কিছুকে একই তত্ত্বে গেঁথে ফেলা কঠিন একটি কাজ। ফলে আমরা একে ভেঙে অনেকগুলো আংশিক তত্ত্ব তৈরি করি। এই আংশিক তত্ত্বদের প্রতিটি কিছু নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা ও পূর্বাভাস দিতে পারে। এর আওতার বাইরের বিষয়গুলো সম্পর্কে এটি নীরব থাকে অথবা তাদেরকে কিছু সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করে। খুব সম্ভব, এটি একটি ভুল পদ্ধতি। যদি মৌলিক জায়গাটিতে মহাবিশ্বের সব কিছু অন্য সব কিছুর ওপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে এদেরকে আংশিকভাবে মূল্যায়ন করে পূর্ণাঙ্গ সমাধানে পৌঁছা সম্ভব নাও হতে পারে। তবুও আমরা অতীতে কিন্তু এটাই করে এসেছি। উদাহরণ হিসেবে আবারও বলব নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের কথা। এটি বলছে, দুটো বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল বস্তুদ্বয়ের একটিমাত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ওপর (ভর) নির্ভরশীল[৪]। বস্তু কী দিয়ে তৈরি তার ওপর এই বল নির্ভর করে না। কাজেই গ্রহদের কক্ষপথের হিসাব বের করার জন্য এদের এবং সূর্যের গঠন ও উপাদানের জন্য আমাদের আলাদা কোনো তত্ত্বের প্রয়োজন নেই।

বর্তমানে মহাবিশ্বের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানীরা দুটি মৌলিক আংশিক তত্ত্ব কাজে লাগাচ্ছেন। এরা হলো জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি বা সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স। এই দুটি তত্ত্ব বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বুদ্ধির জগতের এক বিরাট অর্জন। সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব মহাকর্ষ বল ও মহাবিশ্বের বড় দৈর্ঘ্যের কাঠামোকে (Large scale structure) ব্যাখ্যা করে। মাত্র কয়েক মাইল থেকে শুরু করে অন্তত এক হাজার কোটি কোটি কোটি (১-এর পরে ২৪টি শূন্য) মাইল তথা পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের আকারের সমপরিমাণ অংশ এই তত্ত্বের আওতায় আছে। অন্যদিকে কোয়ান্টাম মেকানিক্স কাজ করে এক ইঞ্চির এক লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগের মতো অত্যন্ত ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের জগতে। এই দুটি তত্ত্ব আবার একে অপরের বিরোধী–এদের দুটোই যে ঠিক হবে সেটি সম্ভব নয়। বর্তমানে পদার্থবিদ্যার একটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নতুন একটি তত্ত্ব প্রদান করা, যা এই দুটো তত্ত্বকে একীভূত করে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি নামে কমন একটি তত্ত্বের জন্ম দেবে। এই তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা এই বইয়েরও একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা এখনও এমন তত্ত্ব প্রস্তুত করতে পারিনি। হতে পারে, আমরা এখনও এর থেকে বহু দূরে আছি। কিন্তু এই তত্ত্বের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত তার অনেকগুলোই আমরা ইতোমধ্যে জেনে গেছি। পরের অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখব কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি নামক তত্ত্বটিকে কী কী পূর্বাভাস দিতে পারতে হবে তা সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যেই অনেক কিছু জানি।

www.pathagar.com

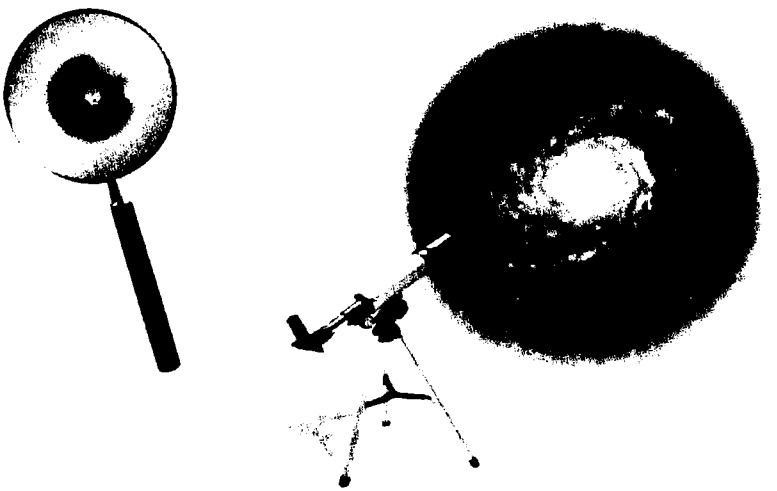

চিত্র : পরমাণু থেকে মহাবিশ্ব

[বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলো কাজ করত শুধু দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রগুলোতে। এরপরে এসে পদার্থবিদ্যার পরিধি বিস্তৃত হয়ে পৌছায় মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম চৌহদ্দি পর্যন্ত।]

এখন আমরা যদি বিশ্বাস করি যে মহাবিশ্ব এলোমেলোভাবে নয় বরং চলছে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে, তাহলে এই আংশিক সূত্রগুলোকে অবশ্যই একটি পূর্ণাঙ্গ একীভূত তত্ত্বে রূপদান করতে হবে, যা ব্যাখ্যা দেবে মহাবিশ্বের সব কিছুর। কিন্তু এ রকম একটি একীভূত তত্ত্বের সন্ধানে নামলে একটি সঙ্কটের মুখে পড়তে হয়। ওপরে উল্লিখিত বিজ্ঞানের এই চিন্তা- ভাবনাগুলোতে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে আমরা বুদ্ধিমান জীব, যারা স্বাধীনভাবে মহাবিশ্বকে দেখছি ও তা থেকে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। যদি এটা সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে আমরা উন্নতি করতে করতে একদিন মহাবিশ্বের কার্যকরী নিয়মগুলোর কাছাকাছি পৌছতে পারব বলে মনে করা খুবই স্বাভাবিক। অন্যদিকে, এমন কোনো পূর্ণাঙ্গ একীভূত সূত্র যদি থাকেই তবে সেটি নির্ধারণ করবে আমাদের নিজেদের কাজকর্মও[৫]। তার মানে তত্ত্ব নিজেই এর অনুসন্ধানের ফলাফল নির্ধারণ করবে! তাহলে সেই তত্ত্ব কেন এটাই নির্ধারণ করবে যে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছব? সেটা তো আমাদের জন্য এটাও নির্ধারণ করে রাখতে পারে যে আমরা ভুল সিদ্ধান্তে পৌছব, তাই না? অথবা এমনও হতে পারে, এটি নির্ধারণ করে রাখবে যে আমরা কোনো সিদ্ধান্তেই পৌছতে পারব না!

www.pathagar.com

এই সমস্যার জবাব দেওয়ার জন্যে আমাদের মাথায় ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural selection) নীতি ছাড়া আর কিছু আসছে না। এই নীতি অনুসারে, স্বপ্রজননে সক্ষম প্রাণীদের নিজেদের মধ্যে জিনগত উপাদান ও বেড়ে ওঠার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকবে। এই পার্থক্যের কারণে এদের কেউ কেউ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ও সেই অনুসারে কাজ করতে অন্যদের চেয়ে বেশি দক্ষ হয়ে উঠবে। অন্যদের চেয়ে এদের টিকে থাকা ও সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা হবে বেশি। ফলে এদের আচরণ ও চিন্তাই হবে প্রভাবশালী। অতীতে এটাই সত্য হয়ে এসেছে এবং এই বুদ্ধিও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার টিকে থাকার ক্ষেত্রে একটি সুবিধা প্রদান করেছে। নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না যে এটাই এ ক্ষেত্রেও হচ্ছে। আমাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো আমাদের ধ্বংসের কারণও হয়ে যেতে পারে। আর যদি তা নাও হয়, একটি পূর্ণাঙ্গ একীভূত তত্ত্ব হয়তো আমাদের টিকে থাকার সম্ভাবনায় খুব বেশি পরিবর্তন আনবে না। অবশ্য মহাবিশ্ব যদি একটি নিয়ম মেনে তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে আমরা আশা করতে পারি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাপ্ত আমাদের বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ একীভূত তত্ত্ব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও আমাদের সহায় হবে, যাতে আমরা ভুল সিদ্ধান্তের দিকে চলে না যাই।

অতিরিক্ত চরম কিছু অবস্থার কথা বাদ দিলে আমাদের বর্তমান আংশিক তত্ত্বগুলো সব ক্ষেত্রেই পূর্বাভাস দিতে সক্ষম। এ কারণে বাস্তব জগতের কথা ভাবলে মহাবিশ্বের চূড়ান্ত তত্ত্বের সন্ধান করাকে অযৌক্তিক মনে হয়। (উল্লেখ্য যে, একই রকম যুক্তি আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিপক্ষেও তোলা যেত, কিন্তু এই তত্ত্বগুলো আমাদের জন্য নিউক্লিয়ার শক্তি ও মাইক্রোইলেকট্রনিক্স বিপ্লব সম্ভব করেছে) কাজেই, একীভূত তত্ত্ব মানব প্রজাতিকে টিকে থাকার ব্যাপারে সাহায্য করবে–এমনটি বলা যাচ্ছে না। এটি হয়তো আমাদের লাইফস্টাইলে কোনো প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু সভ্যতার শুরু থেকেই দেখা গেছে, মানুষ বিভিন্ন ঘটনাকে সম্পর্কহীন ও ব্যাখ্যাতীত মনে করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। আমরা জগতের অন্তর্নিহিত রহস্য জানার জন্য অধীর থেকেছি। আজও আমরা জানতে উৎসুক, আমরা কেন এখানে আছি এবং কোথা থেকেই বা এসেছি। গভীর জ্ঞান পিপাসাই আমাদের অবিরত অনুসন্ধান চালিয়ে যাবার পেছনে একটি যৌক্তিক কারণ। আমরা যে মহাবিশ্বে বাস করি তার একটি সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়ার চেয়ে ছোট নয় আমাদের উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

অনুবাদকের নোট

১. যেমন আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি বা সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব। ১০০ বছর আগে এর মহাকর্ষ তরঙ্গের পূর্বাভাস ২০১৬ এসে প্রমাণিত হয়। ফলে এটি ভালো তত্ত্ব হিসেবে আরো জোরালো স্বীকৃতি লাভ করে।

২. অধিবিদ্যা (Metaphysics) হলো দর্শনের একটি শাখা। অন্য অনেক কিছুর মতো এরও জনক অ্যারিস্টটল। বিশ্বের অস্তিত্ব, আমাদের অস্তিত্ব, সত্যের ধারণা, বস্তুর গুণাবলি, সময়, স্থান, সম্ভাবনা ইত্যাদি এর আলোচ্য বিষয়।

৩. অর্থাৎ তাদের মতে নির্দিষ্ট কোনো সূত্র প্রয়োগ করে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা হয়নি, তাই সেই আদি অবস্থার ব্যাখ্যা দেবার মতো কোনো নির্দিষ্ট সূত্রের ব্যাখ্যা খোঁজা অনর্থক।

৪. মহাকর্ষ বল বস্তুদের দূরত্বের ওপরও নির্ভরশীল–এটা ঠিক, কিন্তু দূরত্ব তো আর বস্তুর নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য নয়।

৫. কারণ আমরাও তো মহাবিশ্বেরই একটি অংশ।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
নিউটনের মহাবিশ্ব

বস্তুর গতি সম্পর্কে আমরা এখন যা জানি তার পেছনে কৃতিত্ব হলো গ্যালিলিও এবং নিউটনের। তার আগে সবাই বিশ্বাস করত অ্যারিস্টটলের কথার ওপর, যিনি বলেছিলেন যে স্থিরাবস্থায় থাকাই হচ্ছে বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম। বস্তু গতিশীল হবে, যদি এতে কোনো বল বা ঘাত কাজ করে। সে ক্ষেত্রে হালকা বস্তুর চেয়ে ভারী বস্তুর পতন দ্রুত হবার কথা, কারণ পৃথিবী একে টানবে বেশি বলে। অ্যারিস্টটলপন্থীদের আরেকটি মত ছিল যে মহাবিশ্বে ক্রিয়াশীল সবগুলো সূত্র নিছক চিন্তাশক্তি দিয়েই বের করা সম্ভব, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করার কোনো প্রয়োজন নেই। ফলে ভিন্ন ওজনের বস্তুরা আসলেই ভিন্ন বেগে পতিত হচ্ছে কি না, তা গ্যালিলিওর আগে কেউ পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেনি।

কথিত আছে, গ্যালিলিও ইতালির পিসার হেলানো টাওয়ার থেকে ভার নিক্ষেপ করে অ্যারিস্টটলের বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণ করেন। এই গল্পটি যে অসত্য তা মোটামুটি নিশ্চিত। তবে গ্যালিলিও এ রকমই কিছু একটা করেছিলেন। তিনি একটি মসৃণ ঢালু পথে ভিন্ন ভিন্ন ওজনের বল গড়িয়ে দেন। ওপর থেকে ভারী বস্তুর সোজা নিচে পড়ার মতোই ঘটনাই এখানেও ঘটবে, কিন্তু এখানে গতি অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার ফলে পর্যবেক্ষণ করা হবে সহজ।

গ্যালিলিওর পরিমাপ থেকে বোঝা গেল, ভর যাই হোক না কেন প্রতিটি বস্তুর গতি একই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন ধরুন, কোনো ঢালু পথ দিয়ে একটি বলকে গড়িয়ে পড়তে দিলে আপনি দশ মিটার নামতে নামতে এটি এক মিটার নিচে নামে। তাহলে এক সেকেন্ড সময় পরে এটি সেকেন্ডে এক মিটার বেগে নিচের দিকে নামবে, দুই সেকেন্ড পরে সেকন্ডে দুই মিটার বেগে নামবে ইত্যাদি[১]। বলটির ভর কমবেশি করা হলেও একই ঘটবে। হ্যাঁ, সিসা দিয়ে তৈরি একটি বস্তু একটি পালকের চেয়ে দ্রুত পড়বে। কিন্তু

www.pathagar.com

তার কারণ হলো এটাই যে বাতাসের বাধার কারণে পালকের গতি কমে যাচ্ছে। বাতাসের বাধার অনুপস্থিতিতে আপনি যদি সিসারও আলাদা ভরের দুটি বস্তুকে নিচে পড়তে দেন, তবে দেখা যাবে তারা একই হারে নিচে পড়তে থাকবে (একটু পরই আমরা দেখব, কেন এমন হয়) । চাঁদের বুকে বস্তুর বেগ কমিয়ে দেবার জন্য কোনো বাতাসের উপস্থিতি নেই। মহাকাশচারী ডেভিড স্কট এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে পালক ও সিসার ভরের পরীক্ষাটি চালিয়ে দেখেন যে এরা আসলেই একই সাথে ভূমি স্পর্শ করছে।

গ্যালিলিওর এই পরিমাপগুলোই ছিল নিউটনের গতি সূত্রের ভিত্তি। গ্যালিলিওর পরীক্ষা অনুসারে, ঢালু বেয়ে নামার সময় কোনো বস্তু একটি ফোর্স বা বলের প্রভাবের মধ্যেই থাকে[২]। এই বলের প্রভাবে অবিরাম এর গতি বেড়ে চলে। দেখা গেল যে বলের কাজ শুধু বস্তুকে গতিশীল করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বস্তুর বেগের পরিবর্তন ঘটানোই হচ্ছে বলের সত্যিকারের কাজ, যদিও আগে তা মনে করা হতো না। এ থেকে আরো বোঝা গেল, বস্তুর ওপর কোনো বল ক্রিয়াশীল না হলে এটি একই বেগে সরলরেখায় চলতে থাকবে। সর্বপ্রথম ১৬৮৭ সালে এই ধারণা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হলো। নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকায় প্রকাশিত এই কথাই এখন নিউটনের প্রথম সূত্র হিসেবে পরিচিত। এর বক্তব্য হচ্ছে, কোনো বস্তু এর ওপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতে ত্বরিত হবে তথা গতির পরিবর্তন করবে। যেমন, বল যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে ত্বরণ (বেগের পরিবর্তন) দ্বিগুণ হবে। বস্তুর ভর যত বেশি হবে ত্বরণ আবার সেই হারে কম হবে। (একই বল দ্বিগুণ ভরের কোনো বস্তুর ওপর কাজ করলে অর্ধেক ত্বরণ তৈরি করবে।) এ ক্ষেত্রে গাড়ি একটি পরিচিত উদাহরণ। ইঞ্জিন যত শক্তিশালী হবে, এর ত্বরণও হবে তত বেশি। কিন্তু আবার গাড়ি যত বেশি ভারী হবে, একই বল এতে তত কম ত্বরণ উৎপন্ন করতে সক্ষম হবে।

নিউটনের গতি সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি বলের প্রভাবে বস্তুর মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। অন্যদিকে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা মহাকর্ষ নামক বিশেষ বলটির শক্তি বের করতে জানলাম। আমরা আগেও বলেছি যে এই তত্ত্ব বলছে, প্রত্যেকটি বস্তু একে অপরকে এদের ভরের সমানুপাতিক একটি বলে আকর্ষণ করছে। কাজেই, কোনো একটি বস্তুর ভর দ্বিগুণ করলে এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল দ্বিগুণ হবে। এটা কেন হয় তা সহজেই বোধগম্য। কারণ নতুন বস্তুটিকে আগের ভরবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন বস্তু মনে করা যেতে পারে। এই দুটি বস্তুই অন্য বস্তুটিকে প্রাথমিক বলে আকর্ষণ করবে। ফলে নতুন অবস্থায় বস্তুদের আকর্ষণ আগের তুলনায়

www.pathagar.com

দ্বিগুণ হবে। আবার ধরুন, একটি বস্তুর ভর ছয় গুণ হলো, অথবা একটি বস্তুর ভর দ্বিগুণ এবং অপরটির ভর তিন গুণ হলো, তাহলে তাদের মধ্যকার নতুন বল ছয় গুণ শক্তিশালী হবে।

এবার বোঝা যাচ্ছে, কেন সকল বস্তু একই হারে পড়ে। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে দ্বিগুণ ভরের বস্তু দ্বিগুণ মহাকর্ষ বলে নিচের দিকে পড়বে। কিন্তু ভর দ্বিগুণ হবার কারণে আবার নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে এতে ত্বরণও হয়ে যাবে অর্ধেক। নিউটনের সূত্রের এই দুই প্রভাব একে অপরকে পুরোপুরি বাতিল করে দেয়। ফলে, ভর যাই হোক, ত্বরণ হবে একই।

ভরের সাথে মহাকর্ষের সম্পর্ক

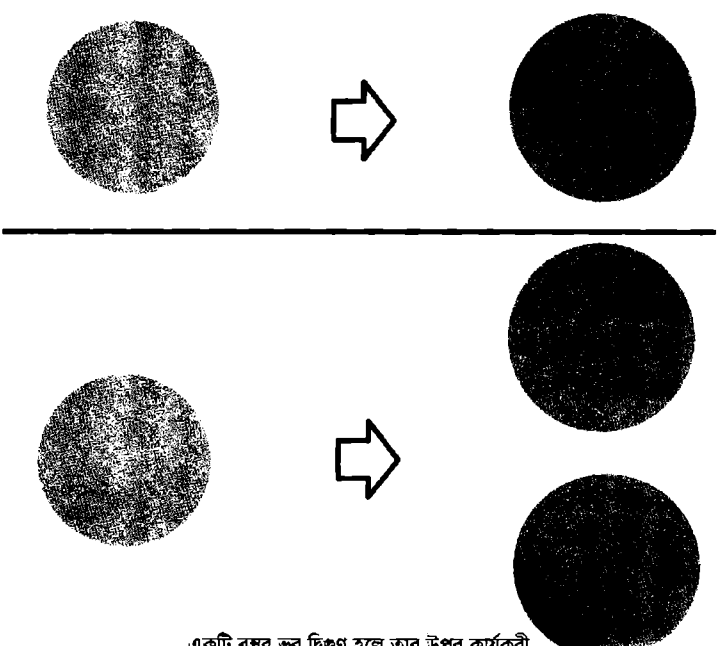

একটি বস্তুর ভর দ্বিগুণ হলে তার উপর কার্যকরী মহাকর্ষও দ্বিগুণ হবে।

চিত্র : দুইয়ের বেশি বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষীয় টান
[একটি বস্তুর ভর দ্বিগুণ হয়ে গেলে, এর ওপর ক্রিয়াশীল মহাকর্ষও হবে দ্বিগুণ]

www.pathagar.com

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র আরও বলছে, বস্তু যত দূরে থাকবে বল হবে তত কম। সূত্রের বক্তব্য হচ্ছে, কোনো নক্ষত্রের মহাকর্ষীয় টান এর অর্ধেক দূরত্বে থাকা একই ভরের নক্ষত্রের চার ভাগের এক ভাগ হবে। এই সূত্রের মাধ্যমে পৃথিবী, চাঁদ এবং গ্রহদের কক্ষপথের পূর্বাভাস অনেকটা নির্ভুলভাবে পাওয়া গিয়েছিল। যদি দূরত্বের পরিবর্তনের সাথে সাথে মহাকর্ষের পরিবর্তন আরেকটু কম বা বেশি হতো তবে গ্রহদের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার (Elliptical) হতে পারত না; হয় এরা সর্পিল পথ বেয়ে সূর্যের দিকে চলে যেত অথবা হারিয়ে যেত সূর্য থেকে দূরে।

অ্যারিস্টটলের সাথে নিউটন ও গ্যালিলীয় মতের একটি বড়সড় পার্থক্য আছে। অ্যারিস্টটল স্থির অবস্থাকে বস্তুর মৌলিক ধর্ম মনে করেছিলেন, বলেছিলেন বল বা ঘাত প্রযুক্ত না হলে বস্তু স্থিরই থাকবে। বিশেষ করে, তিনি পৃথিবীকে স্থির ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু নিউটনের সূত্র থেকে দেখা যায় যে নির্দিষ্ট কোনো বস্তুকে আদর্শ স্থির বলার উপায় নেই। একটি বস্তু 'ক' স্থির আছে এবং আরেকটু বস্তু 'খ' 'ক'-এর সাপেক্ষে গতিশীল–এটা যেমন বলা যেতে পারে, একইভাবে বলা যেতে পারে যে 'খ' স্থির এবং 'ক'ই বরং 'খ'-এর সাপেক্ষে নির্দিষ্ট বেগে গতিশীল। যেমন আপনি যদি কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে আবর্তন এবং সূর্যের চারদিকে এর ঘূর্ণন গতির কথা ভুলে যান, তাহলে আপনি চাইলে বলতে পারেন যে পৃথিবী স্থির এবং এর ওপর দিয়ে একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে উত্তর দিকে যাচ্ছে। আবার চাইলে এটাও বলতে পারেন যে ট্রেনটা স্থির এবং পৃথিবীই ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। আপনি গতিশীল বস্তু নিয়ে ট্রেনের মধ্যে কোনো পরীক্ষা চালালেও নিউটনের সবগুলো সূত্র আগের মতোই ঠিকঠাক কাজ করবে। কে ঠিক তাহলে, নিউটন নাকি অ্যারিস্টটল? এবং আপনি তা কীভাবে বুঝবেন?

একটি পরীক্ষা হবে এমন : ধরুন আপনি কোনো বক্সে আবদ্ধ আছেন এবং আপনি জানেন না বক্সটি কি কোনো চলন্ত ট্রেনের মেঝেতে আছে নাকি নিরেট পৃথিবীর বুকে আছে। এ ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলের মত অনুসারে পৃথিবী হচ্ছে আদর্শ স্থির বস্তু। এখন আসলে আপনি কোথায় আছেন তা বলার কোনো উপায় আছে কি? যদি উপায় থেকে থাকে, তাহলে অ্যারিস্টটল ঠিকই বলেছেন অর্থাৎ পৃথিবীতে স্থির থাকা একটি বিশেষ ব্যাপার। কিন্তু আপনি যদি চলন্ত ট্রেনে রাখা বক্সে কোনো পরীক্ষা চালান তাহলে সেটি ট্রেনের 'স্থির' প্ল্যাটফর্মে রাখা বক্সের মধ্যে চালানো পরীক্ষার

www.pathagar.com

মতো হুবহু একই ফল দেবে। এখানে অবশ্য আমাদেরকে ধরে নিতে হবে ট্রেন চলার সময় কোনো ধাক্কা, মোড় বা অন্য কোনো অস্বাভাবিকতা থাকবে না। ট্রেনের ভেতরে পিন-পং খেললেও দেখা যাবে রেললাইনের পাশের কোনো টেবিলে পিং-পং খেলার সাথে এর কোনো পার্থক্য নেই। আপনি যদি বক্সে বসে পৃথিবীর সাপেক্ষে বিভিন্ন বেগে যেমন ঘণ্টায় শূন্য, পঞ্চাশ ও ৯০ মাইল বেগে গেমটি খেলেন, তাহলে প্রতি ক্ষেত্রেই বল একই আচরণ করবে। প্রকৃতি এভাবেই কাজ করে আর নিউটনের সূত্রের গাণিতিক দিকও এটাই বলতে চায়। পৃথিবী গতিশীল নাকি ট্রেন–তা বলার কোনো উপায় নেই। গতির বিষয়টা অর্থবহ হয়ে ওঠে তখনই, যখন একে অন্য বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়।

অ্যারিস্টটল নাকি নিউটন সঠিক তার সত্যিই কি কোনো গুরুত্ব আছে? পার্থক্যটা শুধু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা দর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কি না? বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব কতখানি? সত্যি বলতে, পরম আদর্শ স্থিরবস্তুর অভাব পদার্থবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর অর্থ হচ্ছে, ভিন্ন সময়ে ঘটা দুটো ঘটনা ঠিক একই স্থানে ঘটেছে কি না তা আমরা বলতে পারব না।

আরেকটু স্পষ্ট করি। মনে করুন, কেউ ট্রেনের মধ্যে একটি পিং-পং বল উঠা-নামা করাচ্ছে। বলটি এক সেকেন্ড পর পর টেবিলের একই বিন্দুতে ধাক্কা খাচ্ছে। এই লোকটির কাছে বলের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাক্কার স্থান একই থাকছে। কিন্তু রেললাইনের পাশে দাঁড়ানো কারো কাছে মনে হবে, বলের দুটি ধাক্কা ৪০ মিটার দূরে দূরে হচ্ছে, কারণ ততক্ষণে ট্রেন এই পরিমাণ পথ অতিক্রম করেছে। নিউটনের মতে দুই পর্যবেক্ষকেরই নিজেকে স্থির মনে করার সমান অধিকার আছে। তার মানে দুটো মতই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। অ্যারিস্টটলের বিশ্বাসের বিপরীতে কোনো একটির ওপর অন্য কোনোটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। ট্রেনে ও রেললাইনের পাশে থাকা ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন ঘটনার দৃশ্যমান অবস্থান ও তাদের মধ্যকার দূরত্বের হিসাব ভিন্ন ভিন্ন হবে। একজনের তুলনায় আরেকজনের পর্যবেক্ষণকে ভালো বলার পেছনে কোনো যুক্তি নেই।

পরম অবস্থান বা কথিত পরম স্থান নামক জিনিসটির অভাব নিউটনকে চিন্তিত করে তোলে, কারণ এটা তাঁর পরম ঈশ্বরের ধারণার সাথে খাপ খাচ্ছিল না। এবং তিনি পরম স্থানের অভাবকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন, যদিও তাঁর নিজেই সূত্রই দিয়েছিল তার বিপরীত ইঙ্গিত। এই অযৌক্তিক বিশ্বাসের জন্য অনেকেই তাঁর তীব্র সমালোচনা করেন। এদের

www.pathagar.com

মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দার্শনিক বিশপ বার্কলে। তিনি আবার বিশ্বাস করতেন যে সব জড় বস্তু এবং স্থান ও কাল আসলে শুধুই মস্তিষ্কের কল্পনা। বিখ্যাত ড. জনসন বার্কলের মন্তব্য শুনে বড় একটি পাথরের মধ্যে লাথি মেরে চিৎকার করে বলেন,

চিত্র : স্থানের আপেক্ষিকতা

[একটি বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং চলাচলের পথ ভিন্ন ভিন্ন দর্শকের কাছে আলাদা মনে হতে পারে।]

'আমি এই কথাকে এইভাবে খণ্ডন করছি।'

অ্যারিস্টটল ও নিউটন দুজনেই সময়কে পরম করতেন। অর্থাৎ তাঁদের বিশ্বাস ছিল, ভালো একটি ঘড়ির সাহায্যে কেউ দুটো ঘটনার মধ্যবর্তী সময় সঠিকভাবে মাপতে পারবেন এবং যে কারো মাপা সময় একই পাওয়া যাবে। পরম স্থানের ধারণা নিউটনের সূত্রে ভুল মনে হলেও পরম সময়ের ব্যাপারে এতে কোনো রকম অসংগতি ছিল না। অধিকাংশ মানুষও একেই স্বাভাবিক ঘটনা বলে ধরে নেবে। কিন্তু বিংশ শতকে পদার্থবিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, স্থান এবং সময় দুটো সম্পর্কেই প্রচলিত ধারণা বদলে ফেলতে হবে। আমরা পরে দেখব, তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে বিভিন্ন ঘটনা যেমন

www.pathagar.com

পিং-পং বল কোথায় ধাক্কা খাচ্ছে তার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যাবধান নির্ভর করছে পর্যবেক্ষকের ওপর। তাঁরা আরও আবিষ্কার করলেন, সময় স্থান থেকে একেবারে আলাদা ও স্বতন্ত্র নয়। আলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এই উপলব্ধির পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে। একে আমাদের অভিজ্ঞতার বিপরীত মনে হতে পারে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ধীর বস্তু যেমন আপেল বা গ্রহদের বেলায় আমাদের সহজাত ধারণা বেশ ভালো কাজ করলেও আলোর সমান বা কাছাকাছি বেগে চলন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে তা একেবারেই অকেজো।

www.pathagar.com

অনুবাদকের নোট

১. সময়ের সাথে বেগের এই পরিবর্তনকেই আমরা ত্বরণ বলি। একটু পরেই এই ধারণা আবার কাজে লাগবে।

২. বলটি হলো বস্তুর ওজন। আমরা সাধারণত যাকে ওজন বলি, বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলা হয় ভর। একটি বস্তুতে মোট কতটুকু পদার্থ আছে সেটাই হলো তার ভর। আর ওজন হলো এক প্রকার বল। পৃথিবী কোনো বস্তুকে যে বলে নিজের দিকে টানে সেটাই হল তার ওজন। গাণিতিকভাবে এর মান বের করা হয় ভরের সাথে পৃথিবীর অভিকর্ষজনিত ত্বরণ (যার মান প্রতি বর্গ সেকেন্ডে গড়ে ৯.৮১ মিটার) গুণ করে। সাধারণত পৃথিবীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলেও ওজন কথাটি অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ বা নক্ষত্রের বেলায়ও ব্যবহৃত হতে পারে।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়
আপেক্ষিক তত্ত্ব

ড্যানিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওলে ক্রিস্টেনসেন রোমা (Ole Christensen Roemer) ১৬৭৬ সালে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন আলো অনেক বিশাল বেগে চললেও বেগটির কিন্তু একটি সসীম মান আছে। বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগুলো পর্যবেক্ষণ করলে আপনি দেখবেন, মাঝে মাঝে এরা চোখের আড়ালে চলে যায়, কারণ তখন এরা বিশাল গ্রহটির পেছনে থাকে। মনে করা হয়েছিল যে বৃহস্পতির উপগ্রহদের গ্রহণ (বৃহস্পতির আড়ালে চলে যাওয়া) নির্দিষ্ট সময় পর পর ঘটবে। কিন্তু রোমা খেয়াল করলেন, গ্রহণগুলো নির্দিষ্ট সময় মেনে হচ্ছে না। তাহলে কি উপগ্রহগুলো তাদের কক্ষপথে থাকা অবস্থায় কোনোভাবে গতি বাড়িয়ে বা কমিয়ে ফেলে? তাঁর কাছে ছিল আরেকটি বিকল্প ব্যাখ্যা। আলো যদি অসীম বেগে চলে, তাহলে পৃথিবীতে বসে আমরা নিয়মিত বিরতিতে গ্রহণ দেখব–ঠিক যে মুহূর্তে তা ঘটবে তখনই, কসমিক ক্লকের দেওয়া টিকের মতো। যেহেতু আলো যে কোনো দূরত্বই মুহূর্তের মধ্যে পার হয়ে যাবে, তাই বৃহস্পতি পৃথিবীর কাছে আসল কি দূরে গেল তাতে কোনো পার্থক্য তৈরি হবে না।*

এবার কল্পনা করুন যে আলো একটি নির্দিষ্ট বেগে চলছে। সে ক্ষেত্রে আমরা প্রতিটি গ্রহণ দেখব তা ঘটে যাবার কিছু সময় পরে[১]। কতটুকু দেরি হবে তা নির্ভর করবে আলোর বেগ এবং পৃথিবী থেকে বৃহস্পতির দূরত্বের ওপর। বৃহস্পতি থেকে যদি পৃথিবীর দূরত্ব অপরিবর্তিত থাকে তাহলে প্রতিটি গ্রহণের ক্ষেত্রে একই পরিমাণ করে দেরি হবে। কিন্তু বাস্তবে বৃহস্পতি অনেক সময় পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসে। এ সময়গুলোতে প্রতিটি গ্রহণের চিত্র আমাদের চোখে পৌঁছতে ক্রমান্বয়ে কম দূরত্ব পাড়ি দিতে হবে। ফলে গ্রহণের দৃশ্য আমাদের চোখে ক্রমান্বয়ে আগের চেয়ে দ্রুত আসবে। উল্টোভাবে বৃহস্পতি যখন পৃথিবী থেকে দূরে সরবে তখন

www.pathagar.com

প্রতিটি গ্রহণকে ক্রমান্বয়ে দেরিতে ঘটতে দেখা যাবে। কতটুকু আগে বা পরে গ্রহণের এই দৃশ্য পৌঁছবে তা নির্ভর করবে আলোর বেগের ওপর। ফলে আমরা আলোর বেগ মাপার উপায় পেয়ে যাচ্ছি। রোমা সাহেব এ কাজটিই করেছিলেন।

তিনি লক্ষ করলেন, পৃথিবী বৃহস্পতির কক্ষপথের নিকটবর্তী হবার সময় বৃহস্পতির একটি উপগ্রহের[২] গ্রহণ অপেক্ষাকৃত আগে ঘটছে এবং পৃথিবী বৃহিস্পতি থেকে দূরে সরার সময় গ্রহণ অপেক্ষাকৃত দেরিতে হচ্ছে। এই পার্থক্য কাজে লাগিয়ে তিনি আলোর বেগ হিসাব করে ফেললেন। অবশ্য তিনি খুব বেশি নিখুঁতভাবে পৃথিবী ও বৃহস্পতির দূরত্বের পরিবর্তন পরিমাপ করতে পারেননি। ফলে তাঁর মাপা আলোর বেগ হয়েছিল সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল, যার আধুনিক মান হলো সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। তবুও আলোর বেগকে সসীম প্রমাণ করা এবং একই সাথে তার মান বের করার ক্ষেত্রে রোমার অর্জনটুকু ছিল বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথম্যাটিকা প্রকাশিত হবার দশ বছর আগেই তিনি তাঁর এই ফলাফল ঘোষণা করেন।

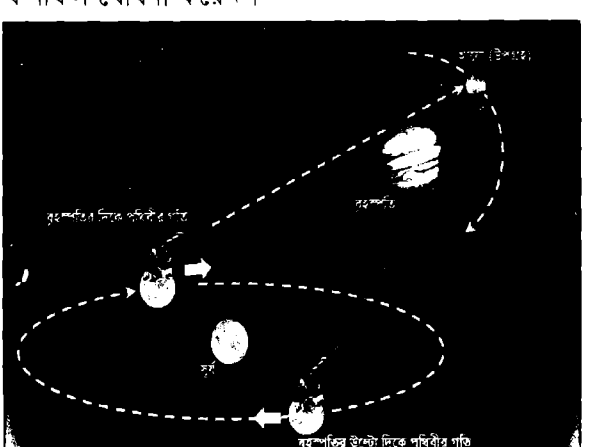

চিত্র : আলোর গতি ও গ্রহণের সময়

[বৃহস্পতির উপগ্রহদের গ্রহণ কখন দেখা যাবে সেটা একদিকে গ্রহণের সময়ের ওপরও নির্ভর করে, আবার বৃহস্পতি থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগে তার ওপরও নির্ভর করে ফলে বৃহস্পতি যখন পৃথিবীর কাছে আসে, তখন গ্রহণ বেশি বেশি হতে দেখা যায়। আর গ্রহটি পৃথিবী থেকে দূরে যেতে থাকলে গ্রহণ কম চোখে পড়ে।]

www.pathagar.com

আলোর চলাচল সম্পর্কে প্রকৃত তত্ত্ব পেতে তবু ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল কিছু বিচ্ছিন্ন তত্ত্বকে জোড়া দিতে সক্ষম হলেন। এই তত্ত্বগুলো সেই সময় পর্যন্ত তড়িৎ ও চৌম্বক বলের ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হতো। প্রাচীনকাল থেকেই তড়িৎ ও চৌম্বক বলের সাথে মানুষের পরিচয় থাকলেও মাত্র অষ্টাদশ শতকে এসে ব্রিটিশ রসায়নবিদ হেনরি ক্যাভেন্ডিশ ও ফরাসি পদার্থবিদ চার্লস কুলম্ব দুটো চার্জিত বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল তড়িৎ বল পরিমাপ করার সূত্র তৈরি করেন। কয়েক দশক পর ঊনবিংশ শতকের শুরুতে কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী চৌম্বক বলের জন্যও অনুরূপ সূত্র বানিয়ে ফেলেন। ম্যাক্সওয়েল গাণিতিকভাবে দেখালেন যে কণিকাদের সরাসরি পারস্পরিক ক্রিয়ার কারণে এই তড়িৎ ও চৌম্বক বলের সৃষ্টি হয় না; বরং প্রতিটি তড়িৎ আধান (চার্জ) ও প্রবাহ (কারেন্ট)-এর চারপাশের অঞ্চলে একটি ক্ষেত্র (Field) তৈরি করে। এই ক্ষেত্রই নিকটস্থ অন্য সব আধান ও প্রবাহের ওপর বল প্রয়োগ করে। তিনি দেখলেন যে একটিমাত্র ক্ষেত্রই তড়িৎ ও চৌম্বক বল বহন করে। অর্থাৎ, তড়িৎ ও চৌম্বক বল আসলে একই বলের অবিচ্ছেদ্য রূপ। তিনি এর নাম দিলেন তড়িচ্চুম্বকীয় বল (Electromagnetic force)। আর বল বহনকারী ক্ষেত্রটির নাম দিলেন তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র।

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ থেকে পূর্বাভাস পাওয়া গেল, তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্যে তরঙ্গের মতো উত্তেজনা (disturbance) দেখা যেতে পারে। এ ছাড়াও এই তরঙ্গ চলবে একটি নির্দিষ্ট গতিতে, অনেকটা পুকুরে সৃষ্ট ঢেউয়ের মতো। এই গতি পরিমাপ করে তিনি দেখলেন, এর মান হচ্ছে আলোর বেগের সমান! আজকে আমরা জানি, ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটারের[৩] মধ্যে থাকলে তা আমাদের চোখে দৃশ্যমান আলো হিসেবে ধরা দেয়। (ক্রমান্বয়ে চূড়া ও খাঁজ তৈরি হওয়াকে বলে তরঙ্গ, আর চূড়া ও খাঁজগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে) যেসব তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে কম তাদেরকে অতিবেগুনি, এক্স-রে এবং গামা রশ্মি বলে। অন্যদিকে, আরো বড় দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে বেতার (এক মিটার বা তার চেয়ে বড়), মাইক্রোওয়েভ (প্রায় এক সেন্টিমিটার) অথবা অবলোহিত বিকিরণ (এক সেন্টিমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম কিন্তু দৃশ্যমান পাল্লার চেয়ে বড়) বলে।

www.pathagar.com

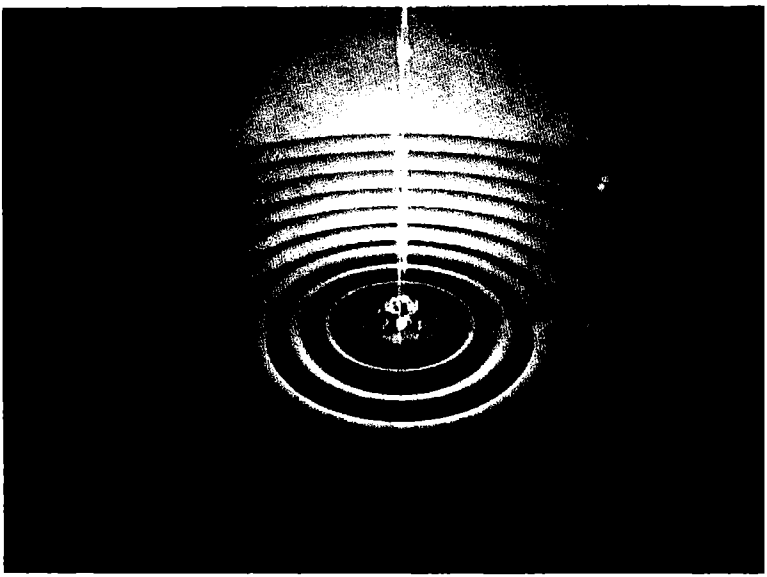

চিত্র : তরঙ্গ

[পর পর দুটি চূড়া বা খাঁজের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে।]

ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল, বেতার বা আলোক তরঙ্গ একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলবে। পরম আদর্শ স্থির বস্তু বলতে কিছু নেই--নিউটনের এই বক্তব্যের সাথে এই কথাকে ঐকতানে আনা কঠিন হয়ে গেল। কারণ এমন কোনো আদর্শ না থাকলে একটি বস্তুর গতির ব্যাপারে সবাই একমত হতে পারবে না। এটি কেন হয় বুঝতে হলে আবারও মনে করুন আপনি ট্রেনের মধ্যে পিং-পং খেলছেন। আপনি ট্রেনের সামনের দিকে বলটিকে ছুড়ে দিলেন। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে যদি এর বেগ ঘণ্টায় দশ মাইল হয়, তাহলে আপনি আশা করবেন যে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো কোনো পর্যবেক্ষক বলটিকে ঘণ্টায় একশ মাইল বেগে যেতে দেখবে। এর মধ্যে দশ হচ্ছে ট্রেনের সাপেক্ষে বেগ এবং নব্বই হচ্ছে প্ল্যাটফর্মের সাপেক্ষে ট্রেনের নিজস্ব বেগ। বলের গতিবেগ আসলে কত, ঘণ্টায় দশ মাইল নাকি একশ মাইল? আপনি একে কার সাপেক্ষে বলবেন--ট্রেনের নাকি পৃথিবীর? পরম আদর্শ স্থির বস্তু বলে কিছু না থাকলে আপনি বলটির জন্য কোনো পরম গতি নির্ধারণ করতে পারবেন না। একইভাবে আপনি কার সাপেক্ষে বলছেন তার

www.pathagar.com

ওপর ভিত্তি করে ঐ একই বলের গতি যেকোনো কিছু হতে পারে। নিউটনের তত্ত্ব সত্য হলে একই নীতি মানতে হবে আলোকেও। তাহলে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বে আলোক তরঙ্গের বেগ নির্দিষ্ট থাকার কী অর্থ?

চিত্র : পিং-পং বলের বিভিন্ন গতিবেগ

[আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে, কারো মত অন্য কারো সাথে যদি নাও মেলে, তবুও প্রত্যেকেরই নিজস্ব মত সঠিক।]

ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বকে নিউটনের সূত্রের সাথে সন্ধি করানোর জন্য ইথার নামক একটি বস্তু কল্পনা করা হলো। ধরে নেওয়া হলো যে এটি সব জায়গায় উপস্থিত। এমনকি এটি আছে শূন্য স্থানেও। বিজ্ঞানীরা এই ইথারের ধারণাকে লুফে নিলেন। তাঁরা ভাবলেন, যেমনি করে জল তরঙ্গের জন্য পানি বা শব্দ তরঙ্গের জন্য বাতাস দরকার, তেমনি তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তির প্রবাহের জন্যও একটি মাধ্যমের প্রয়োজন। এই মত অনুসারে, শব্দ তরঙ্গ যেভাবে বাতাস বেয়ে চলে তেমনি আলোক তরঙ্গ চলে ইথার বেয়ে।

www.pathagar.com

ফলে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত আলোর বেগকে ইথারের সাপেক্ষে বিবেচনা করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষক আলোকে ভিন্ন বেগে আসতে দেখবে ঠিকই, কিন্তু ইথারের সাপেক্ষে এর বেগ থাকবে একই।

এই মতের পরীক্ষা নেওয়া যেত। মনে করুন, একটি উৎস থেকে আলো নির্গত হলো। ইথার তত্ত্ব অনুসারে, আলো এর নিজস্ব বেগে ইথার ভেদ করে চলে। আপনি ইথারের মধ্য দিয়ে আলোর দিকে যেতে থাকলে, আলোর দিকে আপনার গতিবেগ হবে ইথারে আলোর বেগ ও ইথারে আপনার নিজস্ব বেগের যোগফলের সমান। আপনি স্থির থাকলে বা অন্য কোনো দিকে গেলে আলোর বেগ যা হতো, এ ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি হবে। কিন্তু আমরা কোনো আলোক উৎসের দিকে সর্বোচ্চ যে বেগে যেতে পারি তার তুলনায় আলোর বেগ অনেক বেশি হওয়ায় বেগের এই পার্থক্য পরিমাপ করা সহজ কাজ ছিল না।

১৮৮৭ সালে অ্যালবার্ট মাইকেলসন (যিনি পরে প্রথম আমেরিকান হিসেবে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পান) ও এডওয়ার্ড মর্লি নিবিড় যত্নের সাথে একটি কঠিন পরীক্ষা পরিচালনা করেন[৪]। পরীক্ষার স্থান ছিল ক্লিভল্যান্ডের কেইস স্কুল অব অ্যাপ্লাইড সায়েন্স (বর্তমানে এর নাম কেইস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটি)। তাঁরা বুঝতে পারলেন, যেহেতু পৃথিবী এর কক্ষপথে সূর্যকে কেন্দ্র করে সেকন্ডে প্রায় বিশ মাইল বেগে ঘুরছে, তাহলে তাদের পরীক্ষাগারও ইথারের মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি বেগে ছুটবে। কিন্তু কেউই জানত না কোন দিকে বা কত গতিতে ইথার সূর্যের সাপেক্ষে গতিশীল অথবা আদৌ এটি গতিশীল কি না। কিন্তু বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবী এর কক্ষপথের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে (এবং ভিন্ন দিকে গতিশীল) থাকায় একই পরীক্ষা বারবার করার মাধ্যমে এই অজানা বিষয়টি জেনে ফেলার আশা ছিল। এই উদ্দেশ্যে মাইকেলসন ও মর্লি সাহেব পরীক্ষাটিকে এভাবে সাজালেন–ইথারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গতির দিকে (যখন আমরা আলোক উৎসের দিকে গতিশীল) প্রাপ্ত আলোর বেগকে এই গতির সমকোণের দিকে (যখন আমরা উৎসের দিকে গতিশীল নই) আলোর বেগের সাথে তুলনা করতে হবে। বিস্ময়ের সাথে তাঁরা লক্ষ করলেন, উভয় দিকেই আলোর বেগ ঠিক একই!

১৮৮৭ থেকে ১৯০৫ সাল। ইথার তত্ত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা কম করা হলো না। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ছিল ডাচ

www.pathagar.com

পদার্থবিজ্ঞানী হেনড্রিক লরেন্টজের। তিনি মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের ব্যখ্যা দেবার জন্য বললেন, ইথারের মধ্য দিয়ে চলার সময় বস্তুর দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে যায় ও ঘড়ি ধীরে চলে। কিন্তু ১৯০৫ সালে সুইশ প্যাটেন্ট অফিসের একজন অখ্যাত ব্যক্তি একটি বিখ্যাত গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন। ব্যক্তিটি আর কেউ নন, স্বয়ং আলবার্ট আইনস্টাইন। তিনি বললেন, আমরা যদি পরম সময়ের ধারণা বাদ দিতে রাজি হই, তাহলে ইথারের কোনো প্রয়োজনই পড়ে না (আমরা একটু পরই এর কারণ দেখব)। কয়েক সপ্তাহ পরে বিখ্যাত ফরাসি গণিতবিদ অঁরি পয়েনকেয়ার একই রকম কথা বললেন। পয়েনকেয়ারের চেয়ে আইনস্টাইনের যুক্তিগুলো পদার্থবিদ্যার মূলনীতির বেশি কাছাকাছি ছিল। পয়েনকেয়ার সমস্যাটিকে নিতান্তই গাণিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছিলেন। এমনকি তিনি তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্তও আইনস্টাইনের ব্যাখ্যা মেনে নেননি।

আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্যে বললেন, যেকোনো বেগে মুক্তভাবে গতিশীল সকল পর্যবেক্ষকের জন্য বিজ্ঞানের সূত্রগুলো একই থাকবে। নিউটনের গতি সূত্রের জন্যও এটি সঠিক ছিল। কিন্তু আইনস্টাইন একে আরেকটু লম্বা করে এতে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বও নিয়ে এলেন। অন্য কথায়, যেহেতু ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব বলছে আলোর বেগের একটি নির্দিষ্ট মান আছে, অতএব মুক্তভাবে গতিশীল সকল পর্যবেক্ষক এই একই মান পাবেন। এ ক্ষেত্রে তারা কত বেগে উৎস থেকে দূরে যাচ্ছেন বা কাছে আসছেন তা মোটেই বিবেচ্য নয়। এই সাধারণ বক্তব্যের মাধ্যমে ইথার বা অন্য কোনো পছন্দনীয় প্রসঙ্গ কাঠামোর ব্যবহার করা ছাড়াই ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের অর্থ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো। এর অনেকগুলো সুদূরপ্রসারী ভূমিকা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ছিল স্বাভাবিক বুদ্ধির বিপরীত।

যেমন, সকল পর্যবেক্ষক যদি আলোর বেগ একই মাপেন তাহলে আমদেরকে সময়ের ধারণা পাল্টে ফেলতে হয়। গতিশীল ট্রেনের কথা আবার একটু ভাবুন। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, কেউ ট্রেনের মধ্যে পিং-পং বলকে ওপরে ও নিচে বাউন্স করিয়ে এদেরকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি নড়তে দেখলেও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো কেউ বলটিকে প্রায় চল্লিশ মিটার যেতে দেখবে। একইভাবে ট্রেনে থাকা পর্যবেক্ষক কোনো আলো জ্বালালে আলোর অতিক্রান্ত দূরত্ব সম্পর্কেও দুই পর্যবেক্ষক ভিন্ন মত দেবেন। আমরা জানি,

www.pathagar.com

দূরত্বকে সময় দ্বারা ভাগ দিলে বেগ পাওয়া যায়। তাহলে তাদের দুজনের মাপা দূরত্ব যদি ভিন্ন হয়, সে ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের পরিমাপকৃত আলোর বেগ একই হতে হলে তাদের দুজনের মাপা সময়ও ভিন্ন হতে হবে। অর্থাৎ, আপেক্ষিক তত্ত্ব আমাদের মাথা থেকে পরম সময়ের ভাবনা সরিয়ে ফেলতে চায়। বরং প্রত্যেক পর্যবেক্ষক তাঁর ঘড়িতে সময়ের জন্য নিজস্ব একটি মান পাবেন। একই রকম ঘড়ি দিয়ে সময় মেপেও অন্য কেউ একই মান নাও পেতে পারেন।

আপেক্ষিক তত্ত্ব মেনে নিলে ইথার নামক কোনো কিছুর উপস্থিতির প্রয়োজনই নেই। মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষায় এই ইথারের কোনো অস্তিত্ব ধরা পড়েনি। বরং আপেক্ষিক তত্ত্বের দাবি হলো, স্থান ও কাল সম্পর্কে আমাদের মৌলিক ধারণাটিই পাল্টে ফেলতে হবে। আমাদেরকে মেনে নিতে হবে যে 'কাল' 'স্থান' থেকে একেবারে আলাদা ও স্বতন্ত্র নয়। দুটো একত্রে মিলেমিশে তৈরি করেছে স্থান-কাল নামে একটি জিনিস। এই ধারণাগুলো বুঝে নেওয়া একটু কঠিনই বটে। পদার্থবিজ্ঞানীরাও আপেক্ষিক তত্ত্বকে মেনে নিতে অনেকগুলো বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। আইনস্টাইন আগেভাগেই এটি বুঝে ফেলার মাধ্যমে তাঁর উন্নত কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। নিজের যুক্তির প্রতি আত্মবিশ্বাস তাঁকে সেই যুক্তিগুলোর ফলাফল বের করতে উদ্বুদ্ধ করে, যদিও সেই ফলাফল নিয়ে যাচ্ছিলে অদ্ভুত কিছু সিদ্ধান্তের দিকে।

আমরা সবাই জানি, কোনো স্থানের একটি বিন্দুর অবস্থান বোঝানোর জন্য আমরা তিনটি সংখ্যা বা স্থানাঙ্ক ব্যবহার করি। যেমন আমরা হয়তো বলতে পারি, কোনো কক্ষের একটি বিন্দু কোনো একটি দেয়াল থেকে ৭ মিটার দূরে আছে, অপর একটি দেয়াল থেকে ৩ মিটার এবং মেঝে থেকে ৫ মিটার ওপরে আছে। অথবা আমরা বলতে পারি এভাবে–একটি বিন্দু একটি নির্দিষ্ট অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে এবং সমুদ্র স্তর থেকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় আছে। আমরা আমাদের সুবিধামতো যেকোনো তিনটি স্থানাঙ্ক ব্যবহার করতে পারি। অবশ্য এই স্থানাঙ্কদের গ্রহণযোগ্যতার একটা সীমারেখা আছে।

চাঁদের অবস্থানকে পিকাডিলি সার্কাসের পশ্চিম ও উত্তর এবং সমুদ্র স্তর থেকে উচ্চতার মাধ্যমে বোঝানো হলে তা অবশ্যই বাস্তবসম্মত হবে না। এ ক্ষেত্রে বরং আমরা এ রকম তিনটি স্থানাঙ্ক ব্যবহার করতে পারি : এক. সূর্য

www.pathagar.com

থেকে এর দূরত্ব। দুই, গ্রহদের কক্ষীয় তল থেকে দূরত্ব এবং তিন, সূর্য ও চাঁদের সংযোজক রেখা এবং সূর্য ও কাছাকাছি থাকা অন্য কোনো নক্ষত্র যেমন প্রক্সিমা সেন্টোরির সংযোজক রেখা দুইটি দ্বারা উৎপন্ন কোণ। আবার আমাদের গ্যালাক্সিতে সূর্যের অথবা লোকাল গ্রুপে[৫] আমাদের গ্যালাক্সির অবস্থান বর্ণনা করতে গেলে এই স্থানাঙ্কগুলোও কাজে আসবে না। সত্যি বলতে পরস্পরকে ছেদ করা অনেকগুলো দাগের মাধ্যমে আমরা পুরো মহাবিশ্বের অবস্থান নির্দেশ করতে পারি। সে ক্ষেত্রে একটি বিন্দুর অবস্থান বোঝানোর জন্য প্রতিটি দাগে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানাঙ্ক বসাতে হবে।

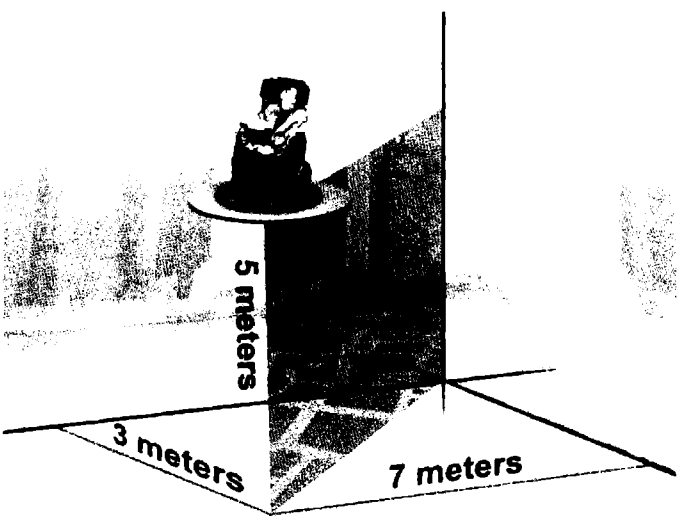

চিত্র : স্থানাঙ্ক

স্থানের তিনটি মাত্রা (Dimension) আছে বলতে আমরা বুঝি একটি বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করতে আমরা তিনটি সংখ্যা বা স্থানাঙ্ক ব্যবহার করি। এর সাথে সময় যোগ করলে স্থান চার মাত্রার স্থান-কালে পরিণত হয়।

নির্দিষ্ট কোনো স্থান ও সময়ে ঘটা কোনো ঘটনাকে আপেক্ষিক তত্ত্বের স্থান-কালে চারটি সংখ্যা বা স্থানাঙ্ক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এখানেও স্থানাঙ্কের ব্যবহার নির্ভর করে ইচ্ছার ওপর। আমরা সময়ের সাথে স্থানের

www.pathagar.com

যেকোনো তিনটি সুসংজ্ঞায়িত স্থানাঙ্ক ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে স্থান ও কালের স্থানাঙ্কের মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই। স্থানের যেকোনো দুটি স্থানাঙ্কের মধ্যে যেমন সত্যিকারের কোনো পার্থক্য থাকে না ব্যাপারটা ঠিক তেমনই। আমরা চাইলে নতুন একগুচ্ছ স্থানাঙ্ক ব্যবহার করতে পারি। যেমন স্থানের প্রথম স্থানাঙ্কটি বানানো হবে স্থানের আগের স্থানাঙ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাঙ্কের সমন্বয়ে। তাহলে পৃথিবীতে কোনো বিন্দুর অবস্থান বোঝানোর জন্য জায়গাটি পিকাডিলি থেকে কত মাইল উত্তরে ও পশ্চিমে আছে তা না বলে আমরা বলতে পারি এটি পিকাডিলি থেকে কত মাইল উত্তর-পূর্ব ও কত মাইল উত্তর-পশ্চিমে আছে। একইভাবে আমরা সময়ের জন্য নতুন স্থানাঙ্ক ব্যবহার করতে পারি। আগের সময়ের (সেকেন্ডের হিসাবে) সাথে পিকাডিলির উত্তর দিকের দূরত্ব সমন্বিত করে এটা তৈরি করা যেতে পারে। এই দূরত্বের একক হতে পারে আলোক সেকেন্ড[৬]।

আপেক্ষিক তত্ত্বের আরেকটি সুপরিচিত ফলাফল হলো ভর ও শক্তির সমতুল্যতা। আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে। এখানে E হল শক্তি, m হলো ভর এবং c হল আলোর গতিবেগ। অল্প কিছু ভরকে বিশুদ্ধ তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণে রূপান্তরিত করলে কী পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে তা বের করতে এই সূত্র খুব বেশি কাজে লাগে। আলোর বেগের মান অনেক বড় একটি সংখ্যা হওয়ায় পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তর করে বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। হিরোশিমা শহরকে ধ্বংস করেছে যে বোমা তাতে ভর ছিল এক আউন্সেরও[৭] কম। কিন্তু সূত্রটি থেকে আমরা আরও জানতে পারছি যে বস্তুর শক্তি বাড়তে থাকলে এর ভরও বেড়ে যায়। আর ভর বাড়লেই কিন্তু ত্বরণ (বেগ বৃদ্ধি) বাধাপ্রাপ্ত হয়।

শক্তির একটি রূপ হচ্ছে গতিশক্তি। একটি গাড়িকে গতিশীল করতে যেমন শক্তির প্রয়োজন হয়, তেমনি যেকোনো বস্তুর গতি বাড়াতেই শক্তির প্রয়োজন। বস্তুকে গতিশীল করতে যে শক্তি খরচ করতে হয়, গতিশীল বস্তুর গতিশক্তির সাথে তার আদৌ কোনো পার্থক্য নেই। এর ফলে বস্তু যত বেশি দ্রুত চলে, ততই এর গতিশক্তি বেড়ে যেতে থাকে। কিন্তু ভর ও শক্তির সমতুল্যতা অনুসারে গতিশক্তি বাড়ার কারণে বস্তুর ভরও বেড়ে যায়। এ

www.pathagar.com

কারণে একটি বস্তু যত বেশি দ্রুত চলে, তার গতি আরও বৃদ্ধি করা ততই কঠিন হয়ে পড়ে[৮]।

আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে চলা বস্তুর ক্ষেত্রে এই প্রভাব সত্যিই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। যেমন, আলোর ১০ শতাংশ গতিতে চলা বস্তুর ভর স্বাভাবিকের চেয়ে মাত্র ০.৫ শতাংশ বেশি হবে। কিন্তু আলোর ৯০ শতাংশ গতিতে চলা বস্তুর ক্ষেত্রে ভর স্বাভাবিকের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি হবে। আলোর গতির কাছাকাছি যেতে থাকলে ভর আরও বেশি বাড়তে থাকে। ফলে বেগ আরও বাড়াতে তুলনামূলক আরও বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়। আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে একটি বস্তু কখনোই আলোর সমান গতি অর্জন করতে পারবে না। কারণ ততক্ষণে এর ভর হয়ে যাবে অসীম। আর ভর ও শক্তির সমতুল্যতা অনুসারে আলোর গতি অর্জন করতে হলে খরচ করতে হবে অসীম পরিমাণ শক্তি। এই কারণেই যেকোনো সাধারণ বস্তু সব সময় আলোর চেয়ে অল্প গতিতে চলতে বাধ্য হয়। আলো বা যেসব তরঙ্গদের অভ্যন্তরীণ কোনো ভর নেই, তারাই কেবল আলোর সমান গতিতে চলতে পারে।

১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় আইনস্টাইনের বিশেষ আপক্ষিক তত্ত্ব। একে বিশেষ বলার কারণ হচ্ছে, সকল পর্যবেক্ষকের কাছে আলোর বেগ কেন একই থাকে এবং আলোর কাছাকাছি গতিতে চললে কী ঘটবে এটি তা ব্যাখ্যা করতে পারলেও নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্রের সাথে এর বনিবনা হচ্ছিল না। নিউটনের তত্ত্ব বলছে, কোনো একটি মুহূর্তে বস্তুরা একে অপরের সাথে যে বলের মাধ্যমে আকৃষ্ট হয় তা এদের সেই মুহূর্তের দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল। এর অর্থ হবে, আপনি একটি বস্তুকে সরিয়ে দিলে আরেকটির ওপর এর দ্বারা ক্রিয়াশীল বল সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাবে। যেমন ধরুন, হঠাৎ করে সূর্য উধাও হয়ে গেল। ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা জানি, আরও আট মিনিট পৃথিবী আলোকিত থাকবে (কারণ সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে এটুকু সময়ই লাগে)। কিন্তু নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র অনুসারে সূর্য উধাও হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী সূর্যের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে এবং কক্ষপথ থেকে ছিটকে দূরে চলে যাবে। অর্থাৎ, সূর্য উধাও হয়ে যাবার মহাকর্ষীয় প্রভাব আমাদের কাছে চলে আসবে অসীম গতিতে। কিন্তু আলোর চেয়ে বেশি এই গতি বিশেষ আপেক্ষিক

www.pathagar.com

তত্ত্বের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বকে মহাকর্ষীয় তত্ত্বের সাথে জোড়া লাগাতে আইনস্টাইন ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে অনেকগুলো প্রচেষ্টা চালান। ব্যর্থ হন তাঁর প্রতিটিতেই। শেষ পর্যন্ত ১৯১৫ সালে তিনি এর চেয়ে বড় বৈপ্লবিক তত্ত্ব নিয়ে আসেন। একেই এখন আমরা জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি বা সার্বিক (বা সাধারণ) আপেক্ষিক তত্ত্ব বলি।

www.pathagar.com

অনুবাদকের নোট

* মনে রাখতে হবে, আমরা কোনো বস্তু দেখি যখন এটি থেকে নির্গত/ প্রতিফলিত আলো আমাদের চোখে এসে পড়ে।

১. কারণ আমরা কোনো কিছু দেখি বস্তু থেকে আসা আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করলে।

২. এটি ছিল বৃহস্পতির উপগ্রহ আয়ো।

৩. এক ন্যানোমিটার এক মিটারের একশো কোটি ভাগের কে ভাগের সমান।

৪. পরীক্ষাটি পথমে মাইকেলসন একা চালিয়েছিলেন। পরে দুজনে মিলে করে আরো নিখুঁত ফল পান।

৫. আমাদের সূর্যকে ধারণকারী মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেসহ ৫৪টির বেশি গ্যালাক্সি নিয়ে তৈরি একটি গ্যালাক্সি গ্রুপের নাম লোকাল গ্রুপ।

৬. অর্থাৎ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল, যেহেতু আলো এক সেকেন্ডে এই পরিমাণ দূরত্ব যায়

৭. এক আউন্স ২৮ গ্রামের একটু বেশি।

৮. যেহেতু বেশি ভরের বস্তুর গতি বাড়াতে বেশি শক্তি ব্যয় করতে হয়।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
স্থানের বক্রতা

আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বও একটি বৈপ্লবিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কথাটি হলো, মহাকর্ষ আসলে অন্যান্য বলের মতো কোনো বল নয়। আগে স্থান-কালকে সমতল মনে করা হতো, সার্বিক। আর মহাকর্ষ এই অসমতল স্থান-কালেরই ফলাফল। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে ভর ও শক্তির উপস্থিতিতে স্থান-কাল বেঁকে যায়। পৃথিবীর মতো বস্তুরা মহাকর্ষ নামক কোনো বলের কারণে বক্র কক্ষপথে চলছে না, বরং বক্র কক্ষপথে চলার কারণ হলো, এরা বক্র স্থানে সরলরেখা বরাবর নিকটতম বস্তুকে অনুসরণ করে। এই পথকে বলা হয় জিওডেসিক (Geodesic)। পারিভাষিক অর্থে এর মানে হলো, কাছাকাছি দুটি বিন্দুর মধ্যে ক্ষুদ্রতম (বা বৃহত্তম) পথ।

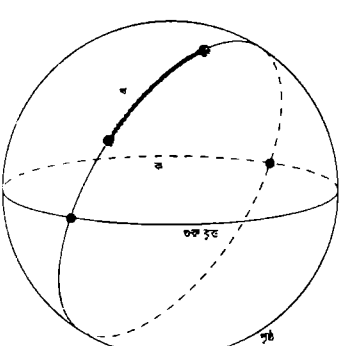

চিত্র : অনুবাদক

চিত্র : এই গোল বস্তুকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ মনে করা হলে পৃথিবীর কেন্দ্রকে কেন্দ্র ধরে পৃষ্ঠের ওপর অঙ্কিত যেকোনো বৃত্তই গুরুবৃত্ত হবে যেমন বিষুব রেখা বরাবর 'ক' যেমন গুরুবৃত্ত, তেমনি 'খ'ও গুরুবৃত্ত

www.pathagar.com

সমতল দ্বিমাত্রিক স্থানের একটি উদাহরণ হলো জ্যামিতিক তল। এখানে জিওডেসিকরা হলো রেখা। পৃথিবীর পৃষ্ঠ দ্বিমাত্রিক বক্র স্থানের একটি উদাহরণ। এই পৃষ্ঠের জিওডেসিকদেরকে এক একটি গুরুবৃত্ত (Great Circle) বলা হয়। বিষুবরেখাও[১] একটি গুরুবৃত্ত। পৃথিবীর পৃষ্ঠে যদি এমন কোনো বৃত্ত আঁকা হয়, যার কেন্দ্র হবে পৃথিবীর কেন্দ্রেই, তবে সেটিও হবে গুরুবৃত্ত। (এদেরকে গুরুবৃত্ত বলার কারণ হচ্ছে, পৃথিবীর পৃষ্ঠের ওপর ওপরে সর্বোচ্চ এই আকারের বৃত্তই আঁকা যাবে)

দুটি বিমানবন্দরের মধ্যে ক্ষুদ্রতম পথও একটি জিওডেসিক। তাই বিমানের ন্যাভিগেটররা পাইলটদেরকে এই পথ ধরে চলার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যেমন ধরুন, আপনি নিউ ইয়র্ক থেকে মাদ্রিদ স্পেন যাবেন। আপনি যদি কম্পাস নিয়ে এদের অক্ষাংশ বরাবর প্রায় সোজা পূর্ব দিকে চলেন তাহলে যেতে হবে ৩,৭০৭ মাইল পথ। আর যদি আপনি একটি গুরুবৃত্ত অনুসরণ করে প্রথমে উত্তর- পূর্ব ও পরে ক্রমান্বয়ে পূর্ব দিকে ঘুরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যান তাহলে যেতে হবে ৩,৬০৫ মাইল। পৃথিবীর মানচিত্রে পৃষ্ঠ বিকৃত করে ছড়ানো থাকে বলে দুই পথের চিত্র বোঝা মুশকিল। আপনি যখন সোজা পূর্ব দিকে যাচ্ছেন, আসলে তখন আপনি সোজা যাচ্ছেন না। অন্তত এই অর্থে যে আপনি সবচেয়ে সরাসরি পথ তথা জিওডেসিক দিয়ে যাচ্ছেন না[২]।

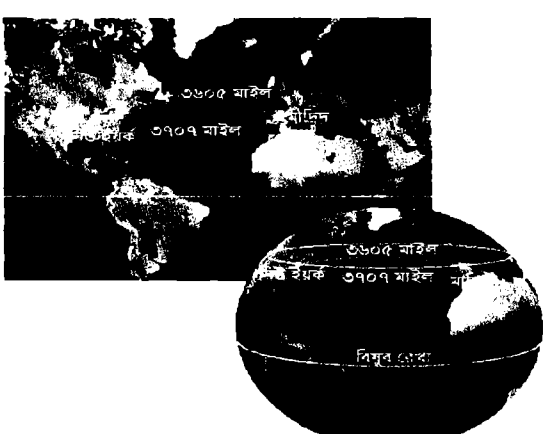

চিত্র : পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব

[দুটি স্থানের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব হলো একটি গুরুবৃত্তের অংশ। সমতল মানচিত্রে দেখলে এটি কিন্তু সরলরেখা হবে না।]

www.pathagar.com

সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে চতুর্মাত্রিক স্থান-কালে বস্তুরা সব সময় জিওডেসিক দিয়ে চলাচল করে। পদার্থের অনুপস্থিতিতে চতুর্মাত্রিক স্থান-কালের জিওডেসিক ত্রিমাত্রিক স্থানের সরলরেখার ন্যায় আচরণ করে। কিন্তু পদার্থের উপস্থিতি চতুর্মাত্রিক স্থান-কালকে বিকৃত করে দেয়। এর ফলে ত্রিমাত্রিক স্থানে চলতে থাকা বস্তুর পথ বেঁকে যায়। এই বেঁকে যাওয়ার প্রক্রিয়াটিই আগের নিউটনীয় তত্ত্বে মহাকর্ষীয় আকর্ষণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যখ্যা করা হয়েছিল। পাহাড়ি এলাকার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বিমান দেখার সাথে এর তুলনা করা চলে। বিমানটি হয়তো ত্রিমাত্রিক স্থানের মধ্য দিয়ে সরল পথেই চলছে। কিন্তু তৃতীয় মাত্রা তথা উচ্চতার কথা বাদ দিয়ে পাহাড়ি অঞ্চলের দ্বিমাত্রিক ভূমিতে নজর রাখলে দেখা যাবে বিমানের ছায়া একটি বক্র পথ অনুসরণ করছে[৩]।

চিত্র : মহাকাশযানের ছায়ার চলাচলের পথ

[সরলরেখা ধরে চলা মহাকাশযানের ছায়াকে পৃথিবীর দ্বিমাত্রিক পৃষ্ঠে বক্র মনে হবে।]

www.pathagar.com

অথবা মনে করুন, একটি মহাকাশযান উত্তর মেরুর ঠিক ওপর দিয়ে সরলরেখা বরাবর উড়ে যাচ্ছে (উপরের ছবির মতো)। নিচের পৃথিবীর দ্বিমাত্রিক পৃষ্ঠের ওপর এর গতিপথের ছবি একেঁ আপনি একটি অর্ধবৃত্ত পাবেন। রেখাটি হবে উত্তর গোলার্ধের উপরস্থ একটি দ্রাঘিমা রেখা। কল্পনা করা কঠিন হলেও আরেকটি উদাহরণ হলো সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর গতি। সূর্যের ভর স্থান-কালকে এমনভাবে বাঁকায় যে পৃথিবী চতুর্মাত্রিক স্থান-কালের মধ্য দিয়ে সরল পথে চললেও আমাদের কাছে মনে হয় এটি যেন ত্রিমাত্রিক স্থানের মধ্য দিয়ে প্রায় বৃত্তাকার পথে চলছে।

বস্তুত সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব ও নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বে গ্রহদের কক্ষপথের পরিমাপ ভিন্ন উপায়ে করা হয়। তবে দুই ক্ষেত্রেই কক্ষপথের পূর্বাভাস প্রায় একই রকম হয়। সবচেয়ে বড় পার্থক্য দেখা যায় বুধ গ্রহের কক্ষপথ হিসাব করতে গিয়ে। এটি সূর্যের নিকটতম গ্রহ হওয়াতে সবচেয়ে বেশি মহাকর্ষীয় টান অনুভব করে। এর উপবৃত্তাকার কক্ষপথ কিছুটা প্রসারিত। সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে উপবৃত্তের বড় অক্ষটি সূর্যের সাপেক্ষে প্রতি দশ বছরে প্রায় এক ডিগ্রি করে আবর্তন করবে। এই প্রভাব খুবই সামান্য হলেও ১৯১৫ সালের অনেক আগেই (তৃতীয় অধ্যায় দেখুন) এটি জানা গিয়েছিল। আইনস্টাইনের তত্ত্বের পক্ষে এটিও ছিল একটি প্রমাণ। সাম্প্রতিক সময়ে রেডারের (RADAR) সাহায্যে অন্য গ্রহদেরও কক্ষপথের বিচ্যুতি পরিমাপ করা হয়েছে। দেখা গেছে যে এই পরিমাপের সাথে নিউটনীয় হিসাবের একটু অমিল থাকলেও তা মিলে গেছে সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের পূর্বাভাসের সাথে।

আলোক রশ্মিরাও স্থান-কালের মধ্যে জিওডেসিক পথে চলতে বাধ্য। আর স্থান যেহেতু বেঁকে আছে, তাই আলোকেও সরল পথে চলতে দেখা যাবে না। কাজেই সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের পূর্ভাবাস হলো, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র আলোকে বাঁকিয়ে দেবে। এই তত্ত্ব অনুসারে অনুসারে, সূর্যের ভরের কারণে এর আশপাশ দিয়ে আসা আলো ভেতরের দিকে কিছুটা বেঁকে যাবে। এর ফলে দূর থেকে কোনো তারার আলো সূর্যের কাছ দিয়ে আসার সময় একটি ছোট্ট কোণে সরে যাবে।

www.pathagar.com

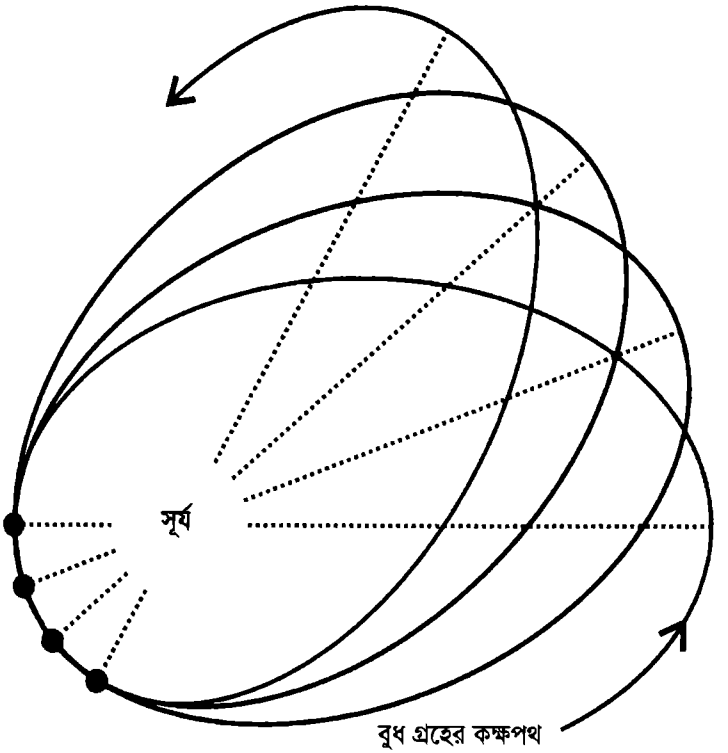

চিত্র : বুধ গ্রহের কক্ষপথের বিচ্যুতি

[বুধ গ্রহ সূর্যের চারপাশে ঘোরার সাথে সাথে এর উপবৃত্তাকার কক্ষপথের প্রধান (বড়) অক্ষও আবর্তন করতে থাকে, যা ৩৬০,০০০ বছরে একটি পূর্ণ চক্র সম্পন্ন করে।]

এ কারণে পৃথিবী থেকে দেখলে তারাটিকে ভিন্ন অবস্থানে দেখা যাবে। অবশ্য তারাটির আলো যদি সব সময়ই সূর্যের খুব কাছ দিয়ে আসে তাহলে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারব না যে আলো বিচ্যুত হয়েছে নাকি তারাটিকে সঠিক জায়াগায়ই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে বলে পৃথিবী থেকে দেখলে একেক সময় একেক তারা সূর্যের পেছনে চলে যায়। এ সময় অন্যদের তুলনায় এ তারাদের আপাত অবস্থান বদলে যায়।

www.pathagar.com

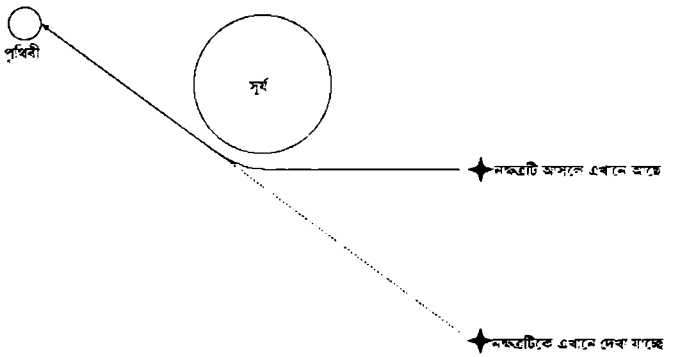

চিত্র : সূর্যের পাশ-ঘেঁষে আসা আলোর বক্রতা

[যখন সূর্য পৃথিবী ও দূরবর্তী কোনো নক্ষত্রের ঠিক মাঝখানে থাকে, তখন এর মহাকর্ষীয় আকর্ষণের কারণে নক্ষত্র থেকে আসা আলো বেঁকে যায়। ফলে এর আপাত অবস্থান পাল্টে যায়।]

সাধারণত এই প্রতিক্রিয়া খুব সহজে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। কারণ সূর্যের আলোর কারণে এর আশপাশে আকাশের তারাদের দেখা পাওয়া অসম্ভব।[৪] কিন্তু সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদ সূর্যের আলোকে ঢেকে ফেলে বলে এ সময় তারাদের আলো দেখা সম্ভব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল বলে আলোর বিচ্যুতি সম্পর্কে আইনস্টাইনের এই ভবিষ্যদ্বাণী ১৯১৫ সালে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১৯১৯ সালে ঠিকই সম্ভব হলো। এই বছর একদল ব্রিটিশ গবেষক (বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটনের নেতৃত্বে- অনুবাদক) আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন। দেখা গেল আইনস্টাইনের কথা মতোই আলো বিচ্যুত হচ্ছে। একটি জার্মান তত্ত্ব ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে প্রামণিত হওয়ায় এটি যুদ্ধের পর দুই দেশের সমঝোতার পক্ষে কাজ করে। কিন্তু হাস্যকর ব্যাপার হলো, এই অভিযানের সময় তোলা ছবিগুলো পরে পরীক্ষা করে দেখা যায়, যেটুকু প্রতিক্রিয়া তাঁরা পরিমাপ করতে চেয়েছিলেন, তাতে সমান পরিমাণ ভুলও ছিল। পরিমাপের ক্ষেত্রে ভাগ্য তাঁদের সহায়ক ছিল। অথবা বলা যায় যে সম্ভবত তাঁরা যে ফলাফল চাচ্ছিলেন তা আগেই জানতেন বলেই পেয়ে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের জগতে এমন ঘটনা হরহামেশাই ঘটে। তবে আলোর বিচ্যুতির ঘটনা কিন্তু পরবর্তীতে অনেকগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

www.pathagar.com

সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের আরেকটি পূর্ভাবাস হলো, বড় ভরের বস্তুর আশেপাশে সময়কে ধীরে চলতে দেখা যাবে। যেমন পৃথিবীর ক্ষেত্রে এমনটা ঘটবে। বিষয়টি সর্বপ্রথম আইনস্টাইনের মাথায় আসে ১৯০৭ সালে। এর পাঁচ বছর পরে তিনি বুঝতে পারেন, মহাকর্ষ স্থানের আকৃতিও বদলে দেয়। আরও তিন বছর পর তিনি তত্ত্বটি সম্পূর্ণ করেন। এই প্রতিক্রিয়া বের করতে তিনি তাঁর সমতুল্যতার নীতি (Principle of equivalence) ব্যবহার করেন। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে আপেক্ষিকতার মৌলিক স্বীকার্য যে ভূমিকা পালন করেছিল, সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে সেই একই ভূমিকা পালন করেছিল এই নীতিটি।

মনে আছে নিশ্চয়, বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্যের বক্তব্য ছিল, মুক্তভাবে গতিশীল সকল পর্যবেক্ষকের কাছে বিজ্ঞানের সূত্রগুলো একই থাকবে, বেগ যাই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। বলা চলে, সমতুল্যতার নীতি আগের এই স্বীকার্যকে আরেকটু লম্বা করেছে। ফলে এটি এমন পর্যবেক্ষকের জন্যও খাটবে, যিনি মুক্তভাবে গতিশীল নন, কিন্তু মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মধ্যেই আছেন। এই নীতিকে সংক্ষেপে তুলে ধরতে হলে কিছু পারিভাষিক বিষয় মাথায় রাখতে হয়। যেমন, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সুষম (সব দিকে একই রকম) নয়। ফলে নীতিটিকে আলাদা আলাদাভাবে অনেকগুলো ছোট ছোট ও পরস্পরচ্ছেদী অংশে ভাগ করতে হবে। অবশ্য এটা আমরা এখানে করব না। আমাদের উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখে আমরা এই নীতিকে এভাবে বলতে পারি, 'যথেষ্ট ক্ষুদ্র স্থানের অঞ্চলে অবস্থান করে এটা বলা সম্ভব নয় যে আপনি কোনো মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে স্থিরাবস্থায় আছেন, নাকি শূন্য স্থানে সুষম হারের ত্বরণ (বেগ বৃদ্ধি) নিয়ে চলছেন।'

মনে করুন, আপনি মহাশূন্যের মধ্যে এমন একটি লিফটে আছেন, যেখান মহাকর্ষ অনুপস্থিত। ফলে এখানে ওপর বা বা নিচ বলতে কিছু নেই। আপনি মুক্তভাবে ভেসে আছেন। একটু পর লিফটখানা সমত্বরণে চলতে শুরু করল। এখন কিন্তু হঠাৎ করে আপনি ওজন অনুভব করবেন। আপনি লিফটের এক প্রান্তের দিকে একটি টান অনুভব করবেন। এখন এ দিকটিকেই আপনার কাছে মেঝে মনে হবে! আপনি এখন হাত থেকে একটি আপেল ছেড়ে দিলে এটি মেঝের দিকে চলে যাবে। আসলে এখন আপনার মতোই লিফটের ভেতরের সব কিছুর ত্বরণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে

www.pathagar.com

আসলে লিফটটা আসলে মোটেই গতিশীল নয়, বরং এটি একটি সুষম মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে স্থির অবস্থায় আছে। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন, ট্রেনের ভেতরে বসে যেমন আপনি বলতে পারেন না যে আপনি সম বেগে চলছেন কি না, তেমনি লিফটের ভেতরে বসেও আপনি বুঝতে পারবেন না আসলে আপনি সুষম ত্বরণে চলছেন, নাকি কোনো সুষম মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মধ্যে আছেন। আইনস্টাইনের এই চিন্তার ফলাফলই হলো সমতুল্যতার নীতি।

সমতুল্যতার নীতি এবং এর ওপরের উদাহরণটি সত্য হলে বস্তুর জড় ভর (Inertial mass) ও মহাকর্ষীয় ভরকে (Gravitational mass) অবশ্যই একই জিনিস হতে হবে। বল প্রয়োগের ফলে কতটুকু ত্বরণ হবে তা নির্ভর করে জড় ভরের ওপর। এই ভর নিয়েই কথাই বলা হয়েছে নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রে। আর অন্যদিকে মহাকর্ষীয় ভরের কথা আছে নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্রে। আপনি কতটুকু মহাকর্ষীয় বল অনুভব করবেন তা নির্ভর করে এই ভরের ওপর (চতুর্থ অধ্যায় দেখুন)। এই দুটি ভর যদি একই হয়ে থাকে তবেই কেবল কোনো মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে উপস্থিত সকল বস্তু একই হারে পতনশীল হবে এবং সে ক্ষেত্রে এই পতন এদের ভরের ওপর নির্ভর করবে না। আর যদি সমতুল্যতার নীতি সঠিক না হতো, তাহলে মহাকর্ষের প্রভাবে কিছু বস্তু অন্যদের চেয়ে দ্রুত পতনশীল হতো। এর অর্থ হলো, আপনি মহাকর্ষীয় টানের সাথে সুষম ত্বরণের (যেখানে সব কিছু একই হারে পতিত হচ্ছে) পার্থক্য ধরতে পারতেন[৫]। জড় ও মহাকর্ষীয় ভরের এই সমতুল্যতা কাজে লাগিয়েই আইনস্টাইন তাঁর সমতুল্যতার নীতি এবং শেষ পর্যন্ত পুরো সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব দাঁড় করান। এর জন্য দরকার ছিল যুক্তির এমন অবিরত চর্চা, যার দ্বিতীয় নজির মানুষের চিন্তার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমরা সমতুল্যতার নীতি জানলাম। আইনস্টাইনের যুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এবার আরেকটি থট এক্সপেরিমেন্ট[৬] করতে হবে। এটা আমাদেরকে দেখাবে মহাকর্ষ সময়কে কীভাবে প্রভাবিত করে। মহাশূন্যে অবস্থিত একটি রকেটের কথা চিন্তা করুন। চিন্তার সুবিধার জন্য মনে করুন রকেটটি এত বড় যে এর শীর্ষ থেকে তলায় আলো পৌঁছতে এক সেকেন্ড লাগে[৭]। আরও মনে করুন, রকেটের সিলিং ও মেঝেতে একজন করে দর্শক আছেন। দুজনের কাছেই অবিকল একই রকম একটি করে ঘড়ি আছে, যা প্রতি সেকন্ডে একটি করে টিক দেয়।

www.pathagar.com

মনে করুন, সিলিংয়ের দর্শক ঘড়ির টিকের অপেক্ষায় আছেন। টিক পেয়েই তিনি মেঝের দর্শকের দিকে একটি আলোক সঙ্কেত পাঠালেন। পরে ঘড়িটি আবারও টিক (সেকেন্ডের কাঁটায়) দিলে তিনি আরেকটি সঙ্কেত পাঠালেন। এ অবস্থায় প্রতিটি সঙ্কেত এক সেকেন্ড পর মেঝের দর্শকের কাছে পৌঁছায়। সিলিং-এর দর্শক এক সেকেন্ডের ব্যবধানে দুটি সঙ্কেত পাঠালে মেঝের দর্শকও এক সেকন্ডের ব্যবধানে সঙ্কেত দুটি পাবেন।

মহাশূন্যে মুক্তভাবে ভেসে না চলে রকেটখানা যদি পৃথিবীর মহাকর্ষীয় টানের মধ্যে থাকত তাহলে কী ঘটত? নিউটনীয় তত্ত্ব অনুসারে এই ঘটনায় মহাকর্ষের কোনো হাত নেই। সিলিংয়ের দর্শক এক সেকেন্ডের ব্যবধানে সঙ্কেত পাঠালে মেঝের দর্শকও এক সেকেন্ডের মধ্যেই তা পাবেন। কিন্তু সমতুল্যতার নীতি ভিন্ন কথা বলে। চলুন দেখা যাক, নীতিটি কাজে লাগিয়ে আমরা মহাকর্ষের বদলে সুষম ত্বরণ নিয়ে চিন্তা করি। নিজের মহাকর্ষ তত্ত্ব তৈরি করতে আইনস্টাইন সমতুল্যতা নীতিকে যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন এটা হল তার একটি উদাহরণ।

তো এখন তাহলে মনে করুন রকেটটি ত্বরণ নিয়ে চলছে (অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে এর বেগ বেড়ে যাচ্ছে। আমরা আপাতত ধরে নিচ্ছি এর ত্বরণের মান ক্ষুদ্র, না হলে আবার এটি আলোর বেগের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে!)। রকেটটি ওপরের দিকে গতিশীল বলে প্রথম সঙ্কেতটিকে আগের চেয়ে (যখন রকেট স্থির ছিল) কম দূরত্ব পাড়ি দিতে হবে। কাজেই সঙ্কেতটি এখন এক সেকেন্ড পার হবার আগেই পৌঁছে যাবে তলায়। রকেটটি যদি নির্দিষ্ট বেগে (ত্বরণহীন) চলত, তাহলে আগে-পরের সব সঙ্কেত এক সেকেন্ড পরপরই পৌঁছত। কিন্তু এখানে ত্বরণ আছে বলে প্রথমে যখন সঙ্কেত পাঠানো হয়েছিল রকেট এখন তার চেয়ে দ্রুত চলছে। কাজেই দ্বিতীয় সঙ্কেতকে আরও কম দূরত্ব পার হতে হবে। ফলে এটি পৌঁছতেও আরও কম সময় লাগবে। কাজেই মেঝের দর্শক দুই সঙ্কেতের মাঝে সময় ব্যবধান পাবেন এক সেকেন্ডের চেয়ে কম। অথচ সিলিংয়ের দর্শক তা পাঠিয়েছেন ঠিক এক সেকেন্ড পরে। হয়ে গেল সময়ের গরমিল।

ব্যাখ্যা পাবার পর ত্বরণপ্রাপ্ত রকেটের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটা এখন নিশ্চয়ই অদ্ভুত লাগছে না। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, সমতুল্যতার নীতি বলছে, রকেটটি যদি কোনো মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রেও স্থির থাকে তবু একই ঘটনা ঘটবে। অর্থাৎ, রকেটটি যদি ত্বরণপ্রাপ্ত নাও হয় (যেমন ধরুন এটি পৃথিবীর

www.pathagar.com

পৃষ্ঠে উৎক্ষেপণের জন্য বসিয়ে রাখা আছে) তাহলেও সিলিংয়ের দর্শক এক সেকেন্ড পর দুটো সঙ্কেত পাঠালে মেঝের দর্শক তা পাবেন এক সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যেই। এবার অদ্ভুদ লাগছে, তাই না!

হয়তো প্রশ্ন করবেন, এর অর্থ তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে–মহাকর্ষ সময়কে বিকৃত করছে, নাকি ঘড়িকে অচল করে দিচ্ছে? ধরুন, মেঝের দর্শক ওপরে উঠে সিলিংয়ের দর্শকের সাথে ঘড়ি মিলিয়ে নিলেন। দেখা গেল, দুটো ঘড়ি অবিকল একই রকম। তাঁরা এও নিশ্চিত যে দুজনে এক সেকেন্ড বলতে সমান পরিমাণ সময়কেই বোঝেন। মেঝের দর্শকের ঘড়িতে কোনো ঝামেলা নেই। এটি যেখানেই থাকুক, তা তার স্থানীয় সময়ের প্রবাহই মাপবে। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব আমাদের বলছে, ভিন্ন বেগে চলা দর্শকের জন্য সময় ভিন্ন গতিতে চলে। আর সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব বলছে, একই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন উচ্চতায় সময়ের গতি আলাদা। সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে, মেঝের দর্শক এক সেকেন্ডের চেয়ে কম সময় পেয়েছেন, কারণ পৃথিবীর পৃষ্ঠের কাছে সময় অপেক্ষাকৃত ধীরে চলে। মহাকর্ষ ক্ষেত্র শক্তিশালী হলে এই প্রভাবও হবে বেশি। নিউটনের গতি সূত্রের মাধ্যমে বিদায় নিয়েছিল পরম স্থানের ধারণা। এবার আপেক্ষিক তত্ত্ব পরম সময়কেও বিদায় জানিয়ে দিল।

১৯৬২ সালে এই অনুমান পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। একটি ওয়াটার টাওয়ারের ওপরে ও নিচে দুটি অতি সূক্ষ্ম ঘড়ি বসানো হয়। দেখা গেল নিচের ঘড়িটিতে (যেটি পৃথিবীর পৃষ্ঠের বেশি কাছে আছে) সময় ধীরে চলছে, ঠিক সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব যেমনটি অনুমান করেছিল তেমনই। এই প্রভাব খুব ক্ষুদ্র। সূর্যের পৃষ্ঠে রাখা কোনো ঘড়িও পৃথিবীর পৃষ্ঠের তুলনায় মাত্র এক মিনিট পার্থক্য দেখাবে। কিন্তু পৃথিবীর ওপরের বিভিন্ন উচ্চতায় সময়ের এই ক্ষুদ্র পার্থক্যই বর্তমানে বাস্তব ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্যাটেলাইট থেকে আসা সঙ্কেতের মাধ্যমে আমাদের নেভিগেশন সিস্টেমকে ঠিক রাখার জন্য এর প্রয়োজন হয়। এই প্রভাব উপেক্ষা করে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অবস্থান বের করলে ভুল হয়ে যাবে কয়েক মাইল!

সময়ের প্রবাহের পার্থক্য ধরা পড়ে আমাদের শরীরেও। এমন এক জোড়া যমজের কথা চিন্তা করুন, যাদের একজন বাস করছে পাহাড়ের চূড়ায় এবং আরেকজন সমুদ্র সমতলে। প্রথমজনের বয়স অপরজনের চেয়ে

www.pathagar.com

দ্রুত বাড়বে। দুজনে আবার দেখা করলে দেখবে একজনের বয়স আরেকজনের চেয়ে বেশি। এই ক্ষেত্রে বয়সের পার্থক্য খুব ক্ষুদ্র হবে হবে। তবে এদের একজন যদি আলোর কাছাকাছি গতিতে মহাকাশযানে করে দীর্ঘ ভ্রমণ করে ফিরে আসে তাহলে দেখা যাবে যমজের চেয়ে তার বয়স অনেক বেশি পরিমাণে কম হচ্ছে।[৮] একে বলা হয় টুইন প্যারাডক্স। তবে মাথার মধ্যে পরম সময়ের ধারণাকে স্থান দিলে তবেই একে প্যারাডক্স (পরস্পরবিরোধী বা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব ঘটনা) মনে হবে। আপেক্ষিক তত্ত্বে একক পরম সময় বলতে কিছু নেই। বরং প্রত্যেক দর্শক তাঁর নিজের মতো করে সময় মাপেন। তাঁর মাপা এই সময় কেমন হবে তা নির্ভর করে তাঁর অবস্থান ও গতির ওপর।

১৯১৫ সালের আগে স্থান ও কালকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল ধরা হতো, যেখানে কোনো ঘটনা ঘটে, কিন্তু যা ঘটবে তা এদেরকে (স্থান-কাল) প্রভাবিত করবে না। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের ক্ষেত্রেও এটা সত্য ছিল। বস্তুরা চলছে, বল আকর্ষণ-বিকর্ষণ করছে, কিন্তু স্থান ও কাল চলছে নির্বিঘ্নেই। সময় ও স্থান অবিরত চলছে এমন ভাবাটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বে অবস্থা একেবারে ভিন্ন। এখানে স্থান ও কাল হলো গতিশীল রাশি। একটি বস্তু চললে বা কোনো বল ক্রিয়াশীল হলে প্রভাবিত হয় স্থান ও কালের বক্রতা। ফলশ্রুতিতে বস্তু কীভাবে চলবে এবং বল কীভাবে কাজ করবে তা নির্ভর করে স্থান-কালের গঠনের ওপর। মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটছে তাকে স্থান-কাল শুধু প্রভাবিতই করে না, তা দ্বারা নিজেরাও প্রভাবিত হয়। স্থান-কালের ধারণা ছাড়া যেমন আমরা মহাবিশ্বের কোনো ঘটনা বোঝাতে পারি না, তেমনি সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে, মহাবিশ্বের সীমানার বাইরের স্থান-কাল নিয়েও আমাদের নাক গলানো অর্থহীন। ১৯১৫ সালের পরবর্তী দশকগুলোতে স্থান-কালের এই নতুন জ্ঞান মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ভাবনায় বিপ্লব সূচিত করে। আমরা পরে আরও বিস্তারিত দেখব যে আগে মনে করা হতো মহাবিশ্বে কোনো পরিবর্তন নেই। এটা যুগ যুগ ধরে বিরাজমান ছিল এবং চিরকাল টিকে থাকবে। এই ভাবনা বদলে গেল। এর স্থানে এল গতিশীল ও সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ধারণা। এখন মনে হচ্ছে এটি একটি নির্দিষ্ট সময় আগে শুরু হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে এর ইতি ঘটবে।

www.pathagar.com

অনুবাদকের নোট

১. পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ দুই মেরুর মাঝ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে কল্পিত রেখাকে ঝিব রেখা বলে। সাধারণ হিসাবে প্রভাব দুটো যে উল্টোভাবে কাজ করে সেটা বলাই উদ্দেশ্য।

২. সমতল মানচিত্রে যে আসলে বক্র পৃথিবীকে সঠিকভাবে দেখানো সম্ভব নয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ যথাসম্ভব অস্ট্রেলিয়া ও গ্রিনল্যান্ডের মানচিত্র দেখা বোঝা যায়। সমতল মানচিত্রে অস্ট্রেলিয়াকে গ্রিনল্যান্ডের চেয়ে অনেক ছোট দেখায়, যদিও আসলে গ্রিনল্যান্ডই অনেক ছোট। এর কারণ হলো, বক্র পৃথিবীতে গ্রিনল্যান্ড পৃথিবীর উত্তর মেরুর খুব কাছে হওয়ায় এর অঞ্চল অনেক কুঁচকে আছে, যেটা সমতল দ্বিমাত্রিক মানচিত্রে দেখানো অসম্ভব।

৩. বুঝতে অসুবিধা হলে পরের ছবিতে দেখানো উদাহরণের সাথে মিলিয়ে পড়ুন।

৪. পৃথিবী প্রায় এক বছরে সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসে। পৃথিবী কক্ষপথের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকার সময় আমরা রাতের আকাশে ভিন্ন ভিন্ন তারার সমাবেশ দেখি। এক বছর পর আবার আগের তারাগুলো দেখি। প্রত্যেক মাসেই কিছু তারা সূর্যের সাথে সাথে বা একটু আগে বা পরে অস্ত যায়। এরাই পৃথিবীর আকাশে সূর্যের কাছাকাছি থাকে। সূর্যের ভরের কারণে এদের আলো আমাদের চোখে বক্র পথে এসে দেখা যাওয়ার কথা। যায়ও বটে, তবে এরা যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ সময় সূর্যের আশপাশে থাকে তাই এই সময় সূর্যের আলোর তেজে এদের নিজস্ব আলো আর দেখা যায় না। তাহলে দেখার উপায় কী? উত্তর হলো, সূর্যগ্রহণের সময়।

৫. যেহেতু মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মতোই সুষম ত্বরণে চলমান কোনো সিস্টেম (যেমন ওপরের উদাহরণে লিফটের মধ্যে থাকা সকল বস্তু) একই হারে পতনশীল হচ্ছে, তাদের ভর যাই হোক না কেন, তাই মহাকর্ষ ও সুষম ত্বরণের পার্থক্য বলার কোনো উপায় নেই। এটাই সমতুল্যতার নীতি।

৬. যে পরীক্ষা বাস্তবে করা যায় না, চিন্তা করে করে বুঝতে হয়, তাকে থট এক্সপেরিমেন্ট বলে।

৭. অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য ১,৮৬,০০০ মাইল।

www.pathagar.com

৮. বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে পৃথিবী থেকে দূরে গিয়ে অনেক বেশি বেগে ভ্রমণ করে এলে আপনার বয়স অপেক্ষাকৃত কম হবে। আর সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে, আপনি পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে দূরে অবস্থান করলে বয়স দ্রুত বাড়বে। একটি প্রভাব আপাতদৃষ্টিতে আরেকটি থেকে উল্টোভাবে কাজ করে। অবশ্য বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব কার্যকর হবার জন্য আপনাকে রকেটে চড়ে মহাশূন্যেই যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আপনি যদি পৃথিবীতেই একটি অসম্ভব দ্রুতগামী ট্রেনে চড়েও ভ্রমণ করেন তবু ট্রেনের বাইরে থাকা আপনার বন্ধুর চেয়ে আপনার বয়স কম হবে।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়
সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব

চাঁদহীন পরিষ্কার রাতের আকাশের দিকে তাকালে সবার আগে আপনার চোখে পড়তে পারে শুক্র (শুকতারা), মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহ[১]। এ ছাড়া থাকবে অনেক অনেক নক্ষত্র। এ নক্ষত্ররা বাস্তবে আমাদের সূর্যের মতো হলেও আমাদের থেকে বহু দূরে অবস্থিত। আমরা এদেরকে স্থির ধরে নিলেও পৃথিবী সূর্যের চারদিকে কক্ষপথের বিভিন্ন অবস্থানে থাকার সময় এদের অবস্থানে কিছুটা পরিবর্তন হতে দেখা যায়। বাস্তবে কিন্তু এরা মোটেই স্থির নয়। আসলে এদের মধ্যে যারা তুলনামূলকভাবে আমাদের কাছে, তাদের নড়াচড়াই শুধু আমরা টের পাই। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে বলে আমাদের নিকটবর্তী তারকারা আরও দূরের তারকাদের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করে২। একটি উন্মুক্ত রাস্তা দিয়ে চলার সময় দূরের দৃশ্যপটের তুলনায় কাছাকাছি থাকা গাছগুলোর আপাত অবস্থান পরিবর্তনের সাথে একে তুলনা করা যায়। যে গাছগুলো যত কাছে, তারা অবস্থান তত বেশি বদলে যাচ্ছে বলে মনে হয়। অবস্থানের এই আপাত পরিবর্তনকে বলা হয় প্যারালাক্স (নিচের চিত্র ১৪ দেখুন)। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এর মাধ্যমে (প্যারালাক্স) এই নক্ষত্রদের দূরত্ব সরাসরি বের করতে পারি।

প্রথম অধ্যায়েই আমরা বলেছি, (সূর্যের পরে) আমাদের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টোরি প্রায় চার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এই দূরত্বটি ২৩ লক্ষ কোটি মাইলের সমান। আমরা খালি চোখে যেসব তারা দেখি তাদের অধিকাংশই আমাদের কয়েক শ আলোকবর্ষের মধ্যে অবস্থিত। সে তুলনায় আমাদের সূর্য মাত্র ৮ আলোক মিনিট দূরে (আলো আট মিনিটে যত দূর যায়) আছে। দৃশ্যমান তারকাদেরকে পুরো আকাশে ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেলেও একটি পট্টির মতো অংশে এদের সংখ্যা খুব বেশি। এর নাম

www.pathagar.com

মিল্কিওয়ে। ১৭৫০ সালের দিক থেকেই কিছু জ্যোতির্বিদ বলছিলেন যে মিল্কিওয়েকে এ রকম দেখা যাওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, দৃশ্যমান তারাদের অধিকাংশ একটি চাকতির মতো বিন্যাসের মধ্যে অবস্থান করছে। এটি হচ্ছে বর্তমান সর্পিল ছায়াপথের (spiral galaxy) একটি উদাহরণ।

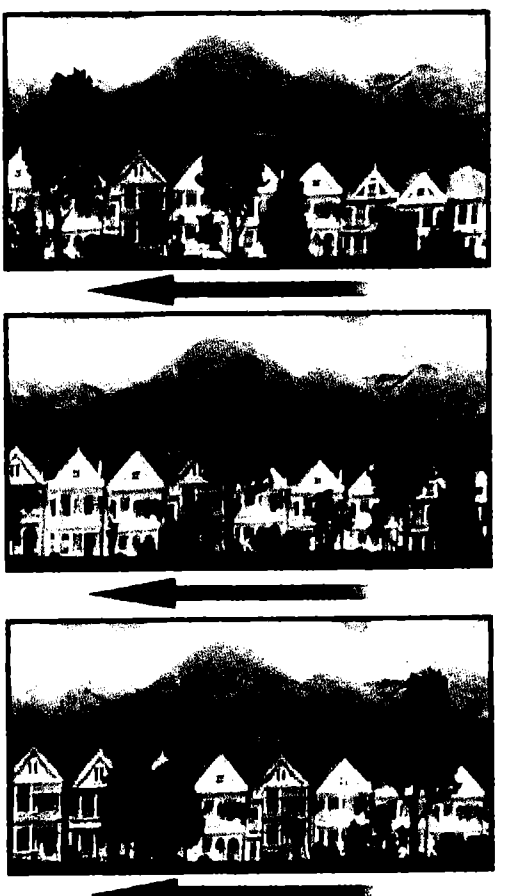

চিত্র : প্যারালাক্স বা লম্বন

[রাস্তা দিয়ে চলুন, অথবা মহাশূন্যে–আপনার চলার সাথে সাথে কাছের এবং দূরের বস্তুর আপেক্ষিক অবস্থান বদলে যায়। এই পরিবর্তন কাজে লাগিয়ে বস্তুর আপেক্ষিক দূরত্ব বের করা যায়।]

www.pathagar.com

কয়েক দশক পরে জ্যোতির্বিদ স্যার উইলিয়াম হার্শেল এই ধারণা নিশ্চিত করেন। এ কাজ করতে তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করে বহু নক্ষত্রের অবস্থান ও দূরত্বের তালিকা তৈরি করতে হয়েছিল। তবু এই ধারণা পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি পেল মাত্র বিংশ শতকের শুরুর দিকে। বর্তমানে আমরা জানি, আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ের ব্যাস প্রায় ১ লাখ আলোকবর্ষ। এটি ধীরে ধীরে আবর্তনও করছে। এর সর্পিল বাহুতে থাকা নক্ষত্রগুলো কয়েক শ মিলিয়ন বছরে একবার এর কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরে আসে। আমাদের সূর্য একেবারেই সাধারণ মানের একটি নক্ষত্র। মাঝারি আকারের হলুদ এই নক্ষত্রটি ছায়াপথের একটি সর্পিল বাহুর ভেতরের দিকের প্রান্তে অবস্থিত। এটা নিশ্চিত যে অ্যারিস্টটল ও টলেমির সময় থেকে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। আমরা তো তখন পৃথিবীকেই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে বসিয়ে রেখেছিলাম!

মহাবিশ্বের আধুনিক ধারণার সূচনা ঘটে মাত্র ১৯২৪ সালে, আমেরিকান জ্যোতির্বিদ এডুইন হাবলের হাত ধরে। তিনি দেখালেন যে মিল্কিওয়েই একমাত্র ছায়াপথ (গ্যালাক্সি) নয়। তিনি (টেলিস্কোপের মাধ্যমে) আরও অনেকগুলো ছায়াপথ খুঁজে পেলেন, যাদের মাঝে আছে বিশাল ফাঁকা স্থান। এসব ছায়াপথের উপস্থিতি প্রমাণ করার জন্যে পৃথিবী থেকে এদের দূরত্ব বের করা প্রয়োজন। সমস্যা হলো এরা এত দূরে দূরে অবস্থিত যে আমাদের নিকটস্থ তারকাদের মতো এদের কোনো নড়াচড়া চোখে পড়ে না, দেখতে একেবারেই স্থির মনে হয়। তাই এদের দূরত্ব মাপতে প্যারালাক্স কোনো কাজে আসল না। ফলে আশ্রয় নিতে হলো পরোক্ষ উপায়ের ওপর। নক্ষত্রের দূরত্ব সম্পর্কে একটি স্পষ্ট তথ্য হলো এর উজ্জ্বলতা। কিন্তু নক্ষত্রের আপাত উজ্জ্বলতা (আমরা একে যত উজ্জ্বল দেখি) শুধু এর দূরত্বের ওপরই নির্ভর করে না, এটি কতটুকু আলো বিকিরণ করছে (দীপ্তি) তার ওপরও নির্ভর করে। নিকটে অবস্থিত একটি অনুজ্জ্বল তারাও দূরের যেকোনো ছায়াপথের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের চেয়ে উজ্জ্বল দেখাবে। তাই আপাত উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করতে হলে নক্ষত্রের দীপ্তিও জানা চাই।

নিকটস্থ তারকাদের ক্ষেত্রে প্যারালাক্স কাজে লাগিয়ে দূরত্ব বের করে ফেলা যায় বলে আপাত উজ্জ্বলতা থেকেই এদের দীপ্তি বের করা যায়।

www.pathagar.com

হাবল দেখলেন, নিঃসৃত আলোর ধরনের ওপর ভিত্তি করে নিকটস্থ নক্ষত্রদেরকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। একই প্রকারের নক্ষত্রগুলোর দীপ্তি সব সময় একই রকম থাকে। এরপর তিনি যুক্তি দেখালেন যে যদি আমরা দূরের গ্যালাক্সিতেও নিকটস্থ নক্ষত্রদের মতো একই ধরনের নক্ষত্র খুঁজে পাই তবে আমরা ধরে নিতে পারি তাদের দীপ্তিও একই হবে। এই তথ্য কাজে লাগিয়ে আমরা সেই গ্যালাক্সির দূরত্বও বের করতে পারি। এভাবে একই গ্যালাক্সির অনেকগুলো নক্ষত্রের দূরত্ব বের করে যদি আমরা সব সময় একই দূরত্ব পাই, তবে ভরসা রাখতে পারি যে হিসাব ঠিক আছে। এই উপায় অবলম্বন করে হাবল নয়টি আলাদা গ্যালাক্সির দূরত্ব বের করতে সক্ষম হন।

এখন আমরা জানি খালি চোখে আমরা যে নক্ষত্রগুলো দেখি তা সব নক্ষত্রের একটি সামান্য অংশ। আমরা প্রায় পাঁচ হাজার নক্ষত্র খালি চোখে দেখি। এটা আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিরই প্রায় ০.০০০১ শতাংশ মাত্র। আধুনিক টেলিস্কোপ দিয়ে আমরা দশ হাজার কোটির বেশি গ্যালাক্সি দেখতে পাই। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে আবার গড়ে প্রায় দশ হাজার কোটি তারকা আছে। একটি তারকাকে যদি একটি লবণের কণা মনে করা যায় তাহলে খালি চোখে দৃশ্যমান সব তারকাকে একটি চায়ের কাপে রেখে দেওয়া যাবে, যেখানে মহাবিশ্বের সব তারকাকে রাখতে হলে ১০ মাইলের চেয়ে বড় ব্যাসের একটি গোলক লাগবে।

তারকারা বহু দূরে থাকার কারণে এদেরকে আলোক বিন্দুর মতো দেখায়। আমরা খালি চোখে এদের আকার-আকৃতি বুঝতে পারি না। কিন্তু হাবল দেখলেন, তারকাদের মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন টাইপ। আলো দেখেই আমরা এদের পার্থক্য ধরতে পারি। নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন যে সূর্যের আলো ত্রিভুজাকৃতির একখণ্ড প্রিজমের মধ্যে দিয়ে পার হলে রঙের বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। রংধনুতে যেমন দেখা যায় সেভাবে। একটি নির্দিষ্ট আলোক উৎস থেকে আসা বিভিন্ন রঙের আপেক্ষিক তীব্রতাকে বলে বর্ণালি (Spectrum)। একটি নির্দিষ্ট তারকা বা গ্যালাক্সির দিকে টেলিস্কোপ তাক করে রেখে সেই তারকা বা গ্যালাক্সির আলোর বর্ণালি দেখা সম্ভব।

www.pathagar.com

এই আলো দেখে আমরা এর তাপমাত্রাও জানতে পারি। ১৮৬০ সালে জার্মান পদার্থবিদ গুস্তাভ কার্শফ উপলব্ধি করেন, যেমনিভাবে উত্তপ্ত হলে কয়লা জ্বলে ওঠে তেমনি যেকোনো বস্তু, এমনকি তারকারাও উত্তপ্ত অবস্থায় আলো বা অন্যান্য বিকিরণ নির্গত করবে। বস্তুর এই জ্বলে ওঠার কারণ হচ্ছে এর অভ্যন্তরে থাকা পরমাণুর তাপীয় গতি। এই ঘটনার নাম ব্ল্যাকবডি রেডিয়েশন বা কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ (যদিও আলো বিকিরণকারী বস্তুরা দেখতে কালো নয়)। কৃষ্ণবস্তু বিকিরণের বর্ণালি থেকে পাওয়া তথ্যে ভুল হওয়া প্রায় অসম্ভব। তাপমাত্রা বদলাবার সাথে সাথে এর ধরন বদলাতে থাকে। ফলে উজ্জ্বল বস্তু থেকে আসা আলো থার্মোমিটারের মতো কাজ করে। আমরা বিভিন্ন তারকার যে বর্ণালি দেখি তার ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। এই বর্ণালি তারকাটির তাপীয় অবস্থার সব নাড়ি-নক্ষত্র উন্মুক্ত করে দেয়।

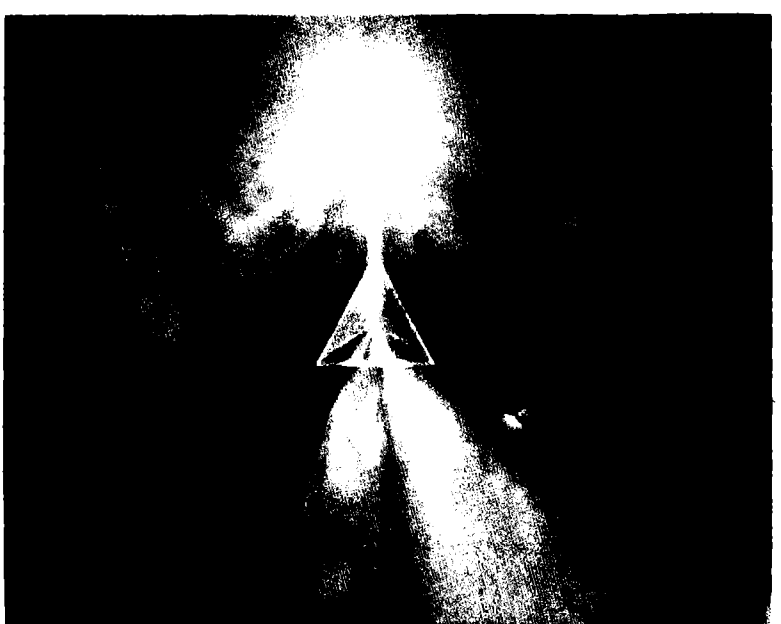

চিত্র : তারকার বর্ণালি

[একটি নক্ষত্রের আলোর বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে এর তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলের উপাদান বের করা যায়।]

www.pathagar.com

ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে, নক্ষত্রের আলো আমাদেরকে আসলে আরও তথ্য দেয়। আমরা দেখি যে নির্দিষ্ট কিছু রং এখানে অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিত রংগুলো কী হবে সেটা আবার বিভিন্ন নক্ষত্রের ক্ষেত্রে ভিন্ন। যেহেতু আমরা জানি যে প্রতিটি রাসায়নিক মৌল স্বতন্ত্র ধরনের একগুচ্ছ রং শোষণ করে, তাই তারকার বর্ণালিতে অনুপস্থিত রঙের সাথে তুলনা করে আমরা বলে দিতে পারি ঐ তারকার বায়ুমণ্ডলে কী কী উপাদান আছে।

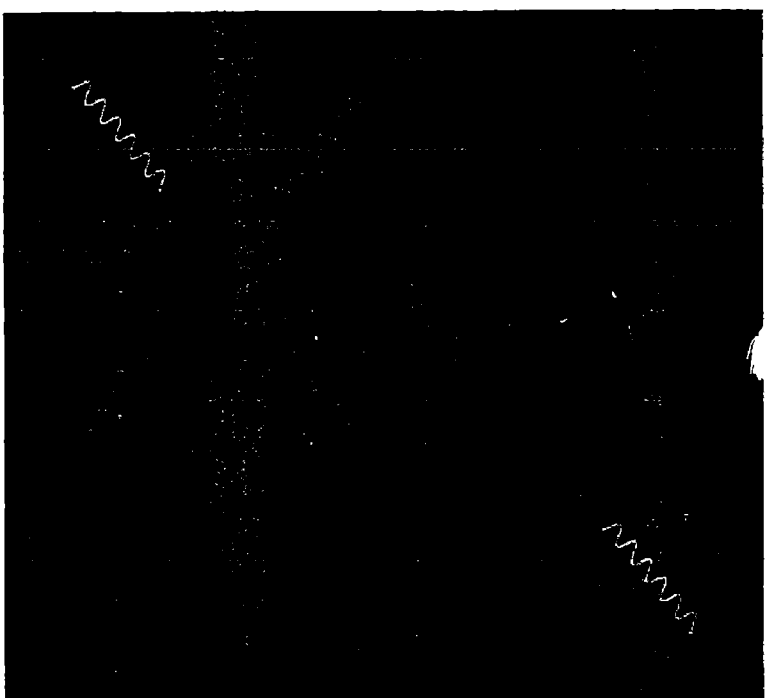

কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ

[শুধু তারকারাই নয়, সকল বস্তুই এর আণুবীক্ষণিক উপাদানগুলোর তাপীয় গতির কারণে বিকিরণ নিঃসরণ করে। বিকিরণের কম্পাঙ্কের বিন্যাস থেকে বস্তুর তাপমাত্র বলা সম্ভব।]

১৯২০-এর দশকে জ্যোতির্বিদরা অন্যান্য গ্যালাক্সির নক্ষত্রদের বর্ণালি দেখা শুরু করে অবাক হয়ে গেলেন। আমাদের গ্যালাক্সির মতোই এখানেও অনুপস্থিত রঙের প্যাটার্ন একই রকম, তবে এরা একই আপেক্ষিক হারে বর্ণালির লাল প্রান্তের দিকে সরে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

পদার্থবিদরা রং বা কম্পাঙ্কের এই সরে যাওয়াকে ডপলার ইফেক্ট বলেন। শব্দের ক্ষেত্রে এর সাথে আমরা সবাই পরিচিত। আপনি যদি রাস্তায় চলা একটি গাড়ির দিকে লক্ষ করেন, তাহলে দেখবেন যে এটি যখন কাছে আসে তখন এর ইঞ্জিন বা হর্নের শব্দ তীক্ষ্ণ হয়ে যাচ্ছে, আবার এটি যখন আপনাকে ক্রস করে দূরে সরে যায় তখন এর শব্দের তীক্ষ্ণতা কমে যায়। ইঞ্জিন বা হর্নের শব্দ একটি তরঙ্গ, যেখানে ক্রমান্বয়ে তরঙ্গের চূড়া ও খাঁজ সৃষ্টি হয়। একটি গাড়ি যখন আমাদের কাছে আসে, এর প্রত্যেকটি পরবর্তী চূড়া নির্গত করার সময় এটি আগের চেয়ে আমাদের বেশি কাছে থাকে। পর পর দুটি তরঙ্গচূড়ার মধ্যবর্তী দূরত্বকে বলা হয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য। তাহলে গাড়ি স্থির থাকলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য যেমন হতো, গাড়ি কাছে আসার সময় তা তার চেয়ে ছোট হবে। আর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত ছোট হবে, চূড়া ও খাঁজ তত বেশি সৃষ্টি হবে, যার ফলে আমাদের কানে শব্দের তীক্ষ্ণতা বা কম্পাঙ্ক জোরালো হবে। উল্টো দিকে গাড়ি আমাদের থেকে দূরে সরে গেলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় হয়ে যাবে বিধায় আমাদের কানে এর কম্পাঙ্ক ছোট হবে। গাড়ি যত দ্রুত চলবে, এই প্রভাবও তত বাড়বে। কাজেই, ডপলার ইফেক্টের সাহায্যে আমরা গতি মাপতে পারি। আলো বা বেতার তরঙ্গও একই আচরণ করে। সত্যি বলতে, পুলিশও ডপলার ইফেক্টের সাহায্যে গাড়ির গতিবেগ মাপে। এ ক্ষেত্রে তারা কাজে লাগায় প্রতিফলিত বেতার তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

চতুর্থ অধ্যায়েই আমরা বলেছি, দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুবই ক্ষুদ্র। এর পাল্লা হলো এক সেন্টিমিটারের চল্লিশ ভাগ থেকে শুরু করে থেকে আট কোটি ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত। আলোর বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যই আমাদের চোখে আলাদা আলাদা রং হিসেবে ধরা পড়ে। সবচেয়ে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলো থাকে লাল প্রান্তের দিকে এবং ছোটগুলো নীল প্রান্তের দিকে। এবার আমাদের থেকে নির্দিষ্ট দূরের একটি আলোক উৎস, যেমন একটি নক্ষত্রের কথা চিন্তা করুন, যা থেকে শুধু একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যেরই আলো আসছে। এটি নিজে যে তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্গত করবে আমরাও ঠিক সেটাই দেখতে পাব। এবার মনে করুন আলোর উৎসটি দূরে সরতে লাগল। শব্দের মতোই এ ক্ষেত্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় হয়ে যাবে এবং এর বর্ণালি লাল দিকে সরে যাবে।

মিল্কিওয়ের বাইরে আরও গ্যালাক্সির উপস্থিতি প্রমাণ করার পরের বছরগুলোতে হাবল এদের বর্ণালি দেখে দেখে দূরত্ব বের করার কাজে

www.pathagar.com

লেগে গেলেন। সেই সময় বেশির ভাগ মানুষ মনে করত গ্যালাক্সিরা এলোমেলোভাবে এদিক-সেদিক নড়াচড়া করবে। সে জন্য হাবলও আশা করেছিলেন, তিনি গ্যালাক্সিদের লাল সরণ (তরঙ্গদৈর্ঘ্য লাল দিকে সরে যাওয়া) যত দেখবেন নীল সরণও সেই পরিমাণ দেখবেন। কাজেই বেশির ভাগ গ্যালাক্সির বর্ণালির সরণ লালের দিকে দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। এদের প্রায় সবাই আমাদের থেকে দূরে সরছে! ১৯২৯ সালে হাবল এর চেয়েও অবাক করা তথ্য প্রকাশ করেন। গ্যালাক্সিদের লাল সরণও এলোমেলোভাবে হচ্ছে না, বরং এটা আমাদের থেকে তাদের দূরত্বের সরাসরি সমানুপাতিক। এর অর্থ হচ্ছে, একটি গ্যালাক্সি যত দূরে অবস্থিত, সেটি তত দ্রুত গতিতে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ আগের ধারণা ভুল, মহাবিশ্বের আকার স্থির বা অপরিবর্তনশীল নয়। এটি আসলে সম্প্রসারিত হচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন গ্যালাক্সির মধ্যবর্তী দূরত্ব বাড়ছে।

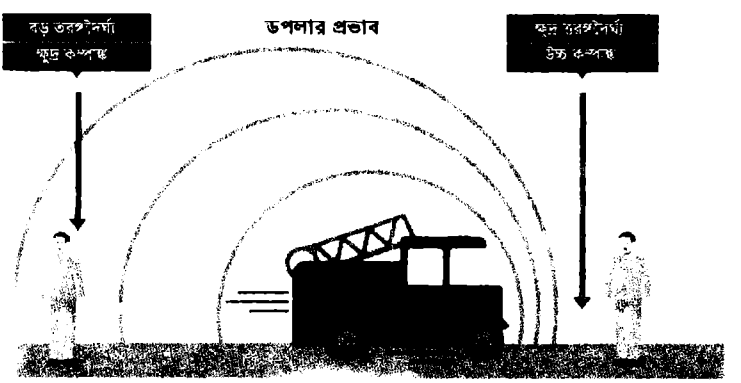

চিত্র : ডপলার প্রভাব

[একটি তরঙ্গ উৎস দর্শকের দিকে এগিয়ে গেলে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট হয়ে যায়, আর দর্শক থেকে দূরে সরলে হয়ে যায় বড়। এটিই ডপলার প্রভাব।]

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ আবিষ্কার বিংশ শতকের বিরাট এক বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব। অতীতে ফিরে তাকালে একটু অবাকই হতে হয়। আগে কেউ কেন এভাবে চিন্তা করেনি। নিউটনসহ অন্যদের বোঝা উচিত ছিল একটি স্থির মহাবিশ্ব হবে অস্থিতিশীল। কারণ সবগুলো নক্ষত্র ও ছায়াপথ মিলিতভাবে একে অপরের ওপর যে মহাকর্ষীয় টান প্রয়োগ করবে তাকে ঠেকানোর তো কেউ নেই। কাজেই কোনো একসময় যদি মহাবিশ্ব স্থির থেকেও থাকে, তবু

www.pathagar.com

এর পক্ষে স্থির হয়ে বসে থাকা অসম্ভব ছিল। কারণ সবগুলো নক্ষত্র ও গ্যালাক্সির পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে মহাবিশ্ব পরক্ষণেই সঙ্কুচিত হতে শুরু করত।

এমনকি মহাবিশ্ব যদি মোটামুটি ধীরগতিতেও প্রসারিত হতো, তবু মহাকর্ষের প্রভাবে একসময় এর প্রসারণ থেমে যেত এবং অবশেষে শুরু হতো সঙ্কোচন। কিন্তু যদি মহাবিশ্ব একটি নির্দিষ্ট হারের চেয়ে দ্রুত প্রসারিত হয়, তাহলে মহাকর্ষ কখনোই এই প্রসারণ থামানোর মতো শক্তিশালী হতে পারবে না। এর ফলে এটি চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে রকেট নিক্ষেপ করলে যা ঘটে তার সাথে এর কিছুটা মিল আছে। রকেটের গতি যদি একটু কম হয় অভিকর্ষ একে থামিয়ে দেবে এবং এটি নিচে পড়ে যাবে। কিন্তু রকেটের গতি যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি হয় (সেকেন্ডে প্রায় সাত মাইল), তাহলে একে থামানোর শক্তি অভিকর্ষের হবে না। এর ফলে এটি পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে।

উনিশ, আঠারো বা এমনকি সতেরো শতকের শেষের দিকেই নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব থেকে মহাবিশ্বের এই আচরণ অনুমান করা যেত। কিন্তু স্থির মহাবিশ্বের ধারণা সবার মনে এতটা বদ্ধমূল হয়ে আসন গেঁড়েছিল যে এই ধারণা টিকে থাকল বিংশ শতকের শুরু পর্যন্ত। এমনকি আইনস্টাইনেরও স্থির মহাবিশ্বের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। ১৯১৫ সালে সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশ করার সময় নিজের তত্ত্বকে সেই বিশ্বাসের সাথে মিলানোর জন্য তিনি কিছুটা গোঁজামিলের আশ্রয় নেন। তিনি তাঁর সমীকরণে মহাজাগতিক ধ্রুবক (Cosmological constant) নামে একটি রাশি আমদানি করেন। নতুন এই মহাজাগতিক ধ্রুবকের প্রতিক্রিয়া ছিল মহাকর্ষের বিপরীত। অন্যান্য বলের মতো এই বলের জন্য কোনো উৎসের প্রয়োজন নেই, বরং এটি স্থান-কালেরই পরতে পরতে মিশে আছে। নতুন এই বলের প্রভাবে স্থান- কাল নিজে থেকেই প্রসারিত হবার প্রবণতা লাভ করে। মহাজাগতিক ধ্রুবক যোগ করে আইনস্টাইন এই প্রবণতার শক্তিকে ভারসাম্যে নিয়ে আসেন। তিনি দেখলেন যে তাঁর পক্ষে মহাবিশ্বের সকল পদার্থের পারস্পরিক আকর্ষণকে ব্যালেন্স করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে পাওয়া গেল স্থির মহাবিশ্ব। কিন্তু পরে তিনি মহাজাগতিক ধ্রুবকটি প্রত্যাহার করেন এবং একে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হিসেবে অভিহিত করেন। একটু পরই

www.pathagar.com

আমরা দেখব, আসলে এটি যোগ করে তিনি সম্ভবত ঠিক কাজটিই করেছেন। কিন্তু আইনস্টাইন হতাশ হয়েছিলেন এ জন্য যে তিনি তাঁর বিশ্বাস ধরে রাখতে গিয়ে তাঁর তত্ত্বের (যা বলছিল মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে) ইঙ্গিতটিও এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু একজন মানুষ সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের ইঙ্গিতকে ঠিকই গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন। যখন আইনস্টাইন ও অন্যরা সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের গতিশীল মহাবিশ্বের ইঙ্গিত এড়ানোর উপায় খুঁজছিলেন, সেই সময়েই রুশ গণিত ও পদার্থবিদ অ্যালেক্সান্ডার ফ্রিডম্যান সেই গতিশীলতার ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে নেমে পড়লেন।

মহাবিশ্ব সম্পর্কে ফ্রিডম্যান খুব সরল দুটো অনুমান প্রস্তাব করলেন। এক, আমরা যে দিকেই তাকাব, মহাবিশ্বকে একই রকম দেখব এবং দুই, যদি আমরা মহাবিশ্বকে অন্য কোথাও থেকেও দেখি তবুও এই কথা সত্য হবে। এই দুটি ভাবনা মাথায় রেখে ফ্রিডম্যান সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের সমাধান বের করলেন এবং দেখালেন, মহাবিশ্বকে স্থির মনে করা অনুচিত। প্রকৃতপক্ষে, হাবলের আবিষ্কারের কয়েক বছর আগেই ১৯২২ সালে ফ্রিডম্যান তাই অনুমান করলেন, যা পরে হাবল পর্যবেক্ষণ করলেন।

মহাবিশ্ব সব দিকে একই রকম দেখায়–এই অনুমান বাস্তবে পুরোপুরি সঠিক নয়। যেমন আমরা বলেছি, রাতের আকাশে কিছু তারা একটি স্বতন্ত্র পট্টি গঠন করে, যাকে আমরা মিল্কিওয়ে বলি। কিন্তু যদি আমরা দূরের গ্যালাক্সির দিকে তাকাই তবে আমরা দেখব যে সব দিকেই তারার সংখ্যা প্রায় সমান। মহাবিশ্বে আসলেই সব দিকে প্রায় একই রকম দেখায়। শর্ত হলো চিন্তা করতে হবে গ্যালাক্সিদের মতো বড় দূরত্বের মাপকাঠিতে এবং ছোট দূরত্বের পার্থক্যে ছাড় দিতে হবে। মনে করুন, আপনি একটি জঙ্গলের মধ্যে আছেন, যেখানে বিভিন্ন গাছপালা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এক দিকে তাকিয়ে আপনি হয়তো দেখবেন, সবচেয়ে কাছের গাছটি আছে এক মিটার দূরে। আরেক দিকে তাকালে সবচেয়ে কাছের গাছটিকে হয়তো তিন মিটার দূরে পাওয়া যাবে। অন্য আরেক দিকে হয়তো দুই মিটারের মধ্যে অনেকগুলো গাছ পাওয়া যাবে। জঙ্গলটিকে সব দিকে একই রকম মনে হচ্ছে না। কিন্তু আপনি যদি এক মাইলের মধ্যের সব গাছ নিয়ে চিন্তা করেন তাহলে এই পার্থক্যগুলো আর থাকবে না। দেখা যাবে যে আপনি যেদিকেই তাকান, জঙ্গলের চেহারা একই রকম।

www.pathagar.com

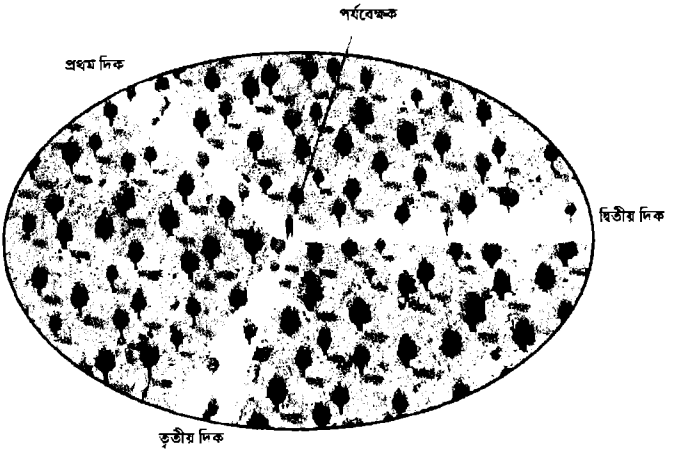

চিত্র : আইসোট্রপিক বন

[বনের গাছগুলো সুষম হারে বিন্যস্ত থাকলেও নিকটস্থ গাছগুলোকে দেখে তা বোঝা যায় না। একইভাবে আমাদের আশপাশে তাকালে মহাবিশ্বকে সুষম (সব দিকে একই রকম) মনে হয় না। কিন্তু বড় দৈর্ঘ্যের স্কেলে চিন্তা করলে আমরা যেদিকেই তাকাই একই রকম দেখি।]

সত্যিকারের মহাবিশ্ব সম্পর্কে ফ্রিডম্যানের অনুমানটি একটি মোটামুটি ধারণা প্রদান করে। এর প্রমাণ হিসেবে তারকাদের সুষম বিন্যাসের ব্যাপারটি অনেক দিন ধরে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আরো পরে ঘটা একটি ইতিবাচক দুর্ঘটনা ফ্রিডম্যানের অনুমানের নতুন একটি দিক উন্মোচিত করে। এতে দেখা যাচ্ছে, ফ্রিডম্যানের অনুমান মহাবিশ্ব সম্পর্কে খুব নিখুঁত চিত্র তুলে ধরছে। ১৯৬৫ সালে দুজন আমেরিকান পদার্থবিদ আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন নিউ জার্সির বেল টেলিফোন ল্যাবে কাজ করছিলেন। টেস্ট করছিলেন খুবই সংবেদী একটি মাইক্রোওয়েভ ডিটেকটর। মাইক্রোওয়েভ হলো আলোর মতোই এক ধরনের তরঙ্গ, তবে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় এক সেন্টিমিটার। ডিটেকটরে স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি নয়েজ পাওয়া যাচ্ছে দেখে পেনজিয়াস ও উইলসন চিন্তিত হলেন। ডিটেকটরে পাখির মল খুঁজে পাওয়া গেল। ঝামেলা হওয়ার মতো অন্য কারণগুলোও খতিয়ে দেখা হলো। কিন্তু এগুলোর কোনোটা করেই উল্লেখযোগ্য কোনো ফল আসল না। অদ্ভুত এই নয়েজটি দিনে-রাতে সমানে পাওয়া যাচ্ছে। আবার এটি বছরের যেকোনো সময়ই পাওয়া যাচ্ছে,

www.pathagar.com

অথচ পৃথিবীর আবর্তন ও সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণনের কারণে একেক সময় ডিটেকটরের মুখ একেক দিকে তাক করা ছিল। কাজেই তাঁরা বুঝলেন, এই নয়েজ সৌরজগৎ শুধু নয়, গ্যালাক্সিরও বাইরে থেকে আসছে। এটি মহাকাশের সব দিক থেকে সমানভাবে আসছে বলে মনে হলো। এখন আমরা জানি, আমরা যেদিকেই তাকাই না কেন, এই নয়েজের খুব বেশি তারতম্য কখনোই হয় না। ফলে নিজেদের অজান্তেই পেনজিয়াস ও উইলসন ফ্রিডম্যানের প্রথম অনুমানের একটি দারুণ উদাহরণ হাতে পেয়ে গেলেন। অর্থাৎ, মহাবিশ্ব সব দিকে একই রকম।

এই মহাজাগতিক নয়েজের উৎস কী তাহলে? পেনজিয়াস ও উইলসন যখন তাদের ডিটেকটরের নয়েজ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন তার প্রায় একই সময়ে কাছাকাছি এলাকায় আরও দুজন আমেরিকান পদার্থবিদ মাইক্রোওয়েভ নিয়ে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা হলেন প্রিনস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বব ডিক ও জিম পিবলস। তাঁরা জর্জ গ্যামোর (যিনি একসময় অ্যালেক্সান্ডার ফ্রিডম্যানের ছাত্র ছিলেন) একটি প্রস্তাবনা নিয়ে কাজ করছিলেন। প্রস্তাবনাটি ছিল যে আদি মহাবিশ্ব নিশ্চয় খুব বেশি উত্তপ্ত ও ঘন ছিল, যা উত্তপ্ত অবস্থায় সাদা আলোতে জ্বলজ্বল করছিল। ডিক ও পিবলস বললেন, আদি মহাবিশ্বের এই বিকিরণ আমাদের আজও দেখার কথা। কারণ এর খুব দূরের অংশ থেকে আসা আলো আমাদের কাছে এইমাত্র এসে পৌঁছাবে। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে এতে মারাত্মকভাবে লাল সরণ ঘটবে। এর ফলে এটি আমাদের কাছে দৃশ্যমান আলোর বদলে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ হিসেবে আসবে। ডিক ও পিবলস এই বিকিরণ খোঁজ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এটা জানতে পেরে পেনজিয়াস ও উইলসন বুঝলেন, তাঁরা এটাই পেয়ে গেছেন। এই অবদানের জন্য ১৯৭৮ সালে পেনজিয়াস ও উইলসন নোবেল পুরস্কার পান (বিষয়টি ডিক ও পিবলসের জন্য অবশ্যই একটু কষ্টকর, গ্যামোর কথা আর নাইবা বললাম।

আমরা যেদিকেই দেখি তার সব দিকে মহাবিশ্বকে একই রকম দেখা যায়–এই কথা থেকে প্রথমে মনে হতে পারে আমরা মহাবিশ্বের বিশেষ কোনো জায়গায় আছি। বিশেষ করে মনে হতে পারে যে আমরা যদি সব গ্যালাক্সিকে আমাদের থেকে দূরে সরতে দেখি তার অর্থ হচ্ছে আমরা নিশ্চয়ই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আছি। কিন্তু ব্যাখ্যা আছে আরেকটিও। অন্য

www.pathagar.com

যেকোনো গ্যালাক্সি থেকে দেখলেও সব দিকে মহাবিশ্বকে একই রকম দেখাবে। আমরা আগেই বলেছি, এটাই ছিল ফ্রিডম্যানের দ্বিতীয় অনুমান।

দ্বিতীয় অনুমানের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। কয়েক শ বছর আগে হলে এ ধরনের অনুমান গির্জা মেনে নিত না। গির্জার নীতিমালা ছিল যে আমরা মহাবিশ্বের কেন্দ্রের একটি বিশেষ জায়গায় আছি। কিন্তু বর্তমানে প্রায় উল্টো কারণে আমরা ফ্রিডম্যানের অনুমানে বিশ্বাসী। একটু উদার মনোভাব দেখানো–এই আর কি! অর্থাৎ, যদি মহাবিশ্বকে আমাদের চারদিকে একই রকম মনে হতো, কিন্তু অন্য কোনো স্থান থেকে একেক দিকে একেক রকম লাগত, তবে তা বড় একটি ব্যাপার হতো।

ফ্রিডম্যানের মডেল অনুসারে গ্যালাক্সিরা সরাসরি একে অপরের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। একটি বেলুনে কিছু দাগ দিয়ে ধীরে ধীরে ফোলানোর সাথে একে তুলনা করা যায়। বেলুন বড় হতে থাকলে যেকোনো দুটি দাগের দূরত্ব বেড়ে যায়। কিন্তু প্রসারণের কেন্দ্র বলা যাবে এমন কোনো বিন্দু নেই। উপরন্তু বেলুনের ব্যাসার্ধ বাড়ছে বলে বেলুনের যে দাগগুলো যত দূরে আছে সেগুলো তত দ্রুত সরতে থাকবে। যেমন ধরুন প্রতি সেকেন্ডে বেলুনের ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ হচ্ছে। আগে যে দুটি দাগ এক সেন্টিমিটার দূরে ছিল এখন তারা থাকবে দুই সেন্টিমিটার দূরে (বেলুনের পৃষ্ঠের ওপর দূরত্ব মাপলে)। তাহলে এদের আপেক্ষিক বেগ হবে সেকেন্ডে এক সেন্টিমিটার। কিন্তু ধরুন, অপর দুটি দাগ আছে দশ সেন্টিমিটার দূরে। তাহলে এখন তারা থাকবে বিশ সেন্টিমিটার দূরে। সুতরাং, তাদের আপেক্ষিক বেগ হবে সেকেন্ডে দশ সেন্টিমিটার। একইভাবে ফ্রিডম্যানের মডেল অনুসারে, যেকোনো দুটি গ্যালাক্সির দূরে সরার গতি তাদের দূরত্বের সমানুপাতিক। তাই তিনি অনুমান করলেন, কোনো গ্যালাক্সির লাল সরণ আমাদের থেকে এর দূরত্বের সরাসরি সমানুপাতিক হবে। হাবলও তাই পেলেন। এই মডেলের সাফল্য এবং হাবলের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর পরেও পাশ্চাত্য বিশ্বে এই মডেল দীর্ঘদিন ধরে অজানা থেকে যায়। শেষে ১৯৩৫ সালে আমেরিকান পদার্থবিদ হাওয়ার্ড রবার্টসন ও ব্রিটিশ গণিতবিদ আর্থার ওয়াকার একই রকম মডেল আবিষ্কার করেন। মহাবিশ্বের সুষম প্রসারণ সম্পর্কে হাবলের আবিষ্কারই ছিল তাঁদের আবিষ্কারের ভিত্তি।

www.pathagar.com

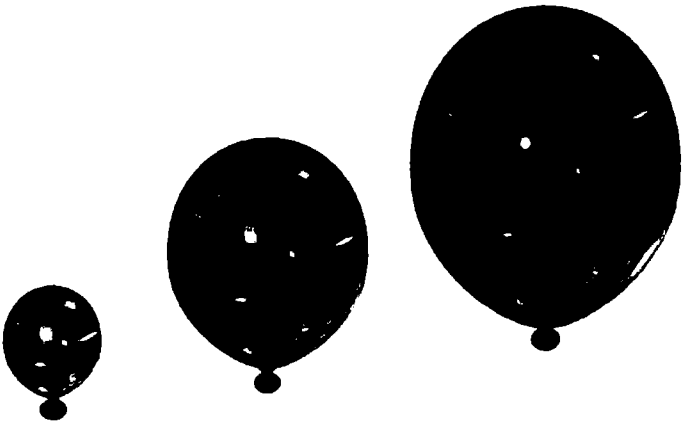

চিত্র : সম্প্রসারণশীল বেলুন মহাবিশ্ব

[মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে সবগুলো গ্যালাক্সি একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সময় যেতে যেতে ফুলে ও ঝলভলভলঠা বেলুনের মতো বেশি দূরত্বে থাকা গ্যালাক্সিরা কাছের গ্যালাক্সির চেয়ে দ্রুত সরে যায়। কাজেই যেকোনো গ্যালাক্সির একজন দর্শক দেখবেন, একটি গ্যালাক্সি যত দূরে আছে তা তত দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে।]

ফ্রিডম্যান মহাবিশ্ব সম্পর্কে কেবল একটিমাত্র মডেল তৈরি করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর অনুমান সঠিক হলে আইনস্টাইনের সমীকরণ অনুসারে সম্ভাব্য সমাধান পাওয়া যায় তিনটি। অর্থাৎ, ফ্রিডম্যানের মডেলেরই তিনটি আলাদা দিক আছে। মহাবিশ্বের থাকতে পারে তিনটি আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য।

প্রথম সমাধানে (যা ফ্রিডম্যান নিজে বের করেন) মহাবিশ্ব যথেষ্ট ধীরে প্রসারিত হচ্ছে, যার ফলে বিভিন্ন গ্যালাক্সির মহাকর্ষীয় টানের প্রভাবে প্রসারণের গতি একসময় কমে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত থেমে যাবে। এরপর গ্যালাক্সিরা একে অপরের দিকে এগিয়ে আসবে, সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে মহাবিশ্ব। দ্বিতীয় সমাধানে মহাবিশ্ব এত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে যে মহাকর্ষীয় টান কখনোই একে থামাতে পারবে না, গতি একটু কমবে যদিও। আরেকটি সমাধান বলছে মহাবিশ্ব এমন একটি যথেষ্ট দ্রুত গতিতে প্রসারিত

www.pathagar.com

হচ্ছে যাতে সঙ্কোচন শুরুই না হতে পারে। গ্যালাক্সিরা যে গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে তা কমে যাচ্ছে, কিন্তু কখনোই তা শূন্য হবে না।

প্রথম ধরনের ফ্রিডম্যান মডেলের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এটি অনুসারে মহাবিশ্ব অসীম নয়। কিন্তু আবার এর কোনো সীমানাও নেই। মহাকর্ষ এত শক্তিশালী যে স্থান গোলাকার হয়ে নিজের ওপরই বেঁকে আছে। একে পৃথিবীর পৃষ্ঠের সাথে তুলনা করা যায়। এটি অসীম নয় ঠিকই, কিন্তু এর কোনো সীমানাও নেই। আপনি যদি নির্দিষ্ট কোনো দিকে যেতে থাকেন, আপনি কখনোই অভেদ্য কোনো বাধার মুখে পড়বেন না, বা প্রান্তে পৌঁছে গিয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকবে না। শেষমেশ পৌঁছে যাবেন সেখানেই, যেখান থেকে শুরু করেছিলেন।

প্রথম মডেল অনুসারে স্থানের চরিত্র এমনই। অবশ্য পৃথিবীর পৃষ্ঠের দুই মাত্রার বিপরীতে এখানে মাত্রা আছে তিনটি। মহাবিশ্বকে পুরো একবার ঘুরে এসে আগের জায়গায় পৌঁছার বিষয়টি সায়েন্স ফিকশনে ভালো মানায়, বাস্তবে এর তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ, দেখানো যায় যে আপনি পুরোটা ঘুরে ফিরে আসার আগেই মহাবিশ্ব গুটিয়ে গিয়ে জিরো সাইজ হয়ে যাবে। এর সাইজ এত বড় যে পুরোটা ঘুরে আসতে হলে আপনাকে আলোর চেয়ে বেশি গতিতে চলতে হবে। কিন্তু তা অসম্ভব, যার ফলে আপনি ফিরে আসার আগেই মহাবিশ্ব শেষ হয়ে যাবে। ফ্রিডম্যান মডেলের দ্বিতীয় অংশেও বক্র স্থানের কথা আছে। এর চিত্র অবশ্য ভিন্ন। ফ্রিডম্যান মডেলের তৃতীয় অংশটিতেই কেবল বড়মাপের দৈর্ঘ্যে মহাবিশ্বের জ্যামিতি সমতল (যদিও বড় ভরের বস্তুদের আশপাশে স্থান বক্রই থাকবে)।

ফ্রিডম্যানের কোন মডেলটি সঠিক? একসময় কি মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ হবে, নাকি চিরকাল এর প্রসারণ চলতেই থাকবে?

প্রশ্নটার উত্তর যে এতটা জটিল তা বিজ্ঞানীরা আগে বুঝতে পারেননি। এই প্রশ্নের মৌলিক উত্তর নির্ভর করে দুটি জিনিসের ওপর--মহাবিশ্বের প্রসারণের বর্তমান হার এবং বর্তমান গড় ঘনত্ব (একটি নির্দিষ্ট আয়তনে যে পরিমাণ পদার্থ উপস্থিত)। বর্তমানে প্রসারণের হার যত বেশি হবে, তাকে থামাতে তত শক্তিশালী মহাকর্ষের প্রয়োজন হবে। এর জন্য গড় ঘনত্বের মানও হতে হবে বেশি। যদি ঘড় ঘনত্ব একটি নির্দিষ্ট সঙ্কট মানের (যা নির্ভর করে প্রসারণের হারের ওপর) বেশি হয়, তাহলে মহাকর্ষীয় টানের প্রভাবে প্রসারণ থেমে গিয়ে পতন শুরু হবে। এটাই হলো ফ্রিডম্যানের

www.pathagar.com

প্রথম মডেল। যদি গড় ঘনত্ব সঙ্কট মানের চেয়ে কম হয়, তাহলে প্রসারণ থামানোর মতো যথেষ্ট মহাকর্ষীয় টান থাকবে না। কাজেই মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে। এটা হলো ফ্রিডম্যানের দ্বিতীয় মডেল। আর গড় ঘনত্ব যদি সঙ্কট মানের ঠিক সমান হয় তবে মহাবিশ্বের প্রসারণ হার চিরকাল কমতে থাকবে। এটি দ্রুত একটি নির্দিষ্ট সাইজের কাছাকাছি হতে থাকবে, কিন্তু কোনো দিনই সেই সাইজ পর্যন্ত পৌঁছবে না। এটা হলো ফ্রিডম্যানের তৃতীয় মডেল।

এর মধ্যে কোনটি ঘটবে? ডপলার প্রভাবের সাহায্যে আমরা অন্য গ্যালাক্সিদের আমাদের থেকে দূরে সরার বেগ মাপতে পারি। এর মাধ্যমে প্রসারণের বর্তমান হার জানা যাবে। খুব নির্ভুলভাবে এর মান বের করা সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হলো, গ্যালাক্সিদের দূরত্বের খুব বেশি সঠিক হিসাব জানা নেই। এদের দূরত্ব আমরা সরাসরি মাপতে পারি না। আমরা শুধু জানি যে প্রতি বিলিয়ন বছরে মহাবিশ্ব ৫ থেকে ১০ শতাংশ প্রসারিত হয়। অন্যদিকে মহাবিশ্বের বর্তমান গড় ঘনত্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরও অস্পষ্ট। কিন্তু আমরা জানি আমাদের ও অন্যান্য গ্যালাক্সিতে যে পরিমাণ তারকা দেখি তাদের মোট ভর মহাবিশ্বের প্রসারণ থামানোর জন্যে যথেষ্ট নয়, প্রসারণের হারকে যতটা সম্ভব ছোট ধরে নিলেও। ভর উপস্থিত আছে প্রয়োজনীয় ভরের একশ ভাগের মাত্র এক ভাগ।

কিন্তু এখানেই সব শেষ নয়। আমাদের গ্যালাক্সিসহ অন্যান্য গ্যালাক্সিতে বিপুল পরিমাণ ডার্ক ম্যাটারও আছে। এদেরকে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রদের কক্ষপথের ওপর এর মহাকর্ষীয় প্রভাবের কারণে এর উপস্থিতি আঁচ করা যায়। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ সম্ভবত আমাদের মিল্কিওয়ের মতো সর্পিল গ্যালাক্সিগুলোর বাইরের দিকে অবস্থিত নক্ষত্রগুলোর বেগ। এ নক্ষত্রগুলো যে তীব্র গতিতে গ্যালাক্সিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তাতে গ্যালাক্সির নক্ষত্রদের মোট মহাকর্ষীয় টান এদেরকে কক্ষপথে ধরে রাখতে পারার কথা নয়[৩]।

উপরন্তু বেশির ভাগ গ্যালাক্সিকে গুচ্ছ গুচ্ছ (Cluster) আকারে অবস্থান করতে দেখা যায়। তাই একইভাবে গ্যালাক্সিদের গতির প্রকৃতি দেখে আমরা এদের মাঝখানে আরও বেশি ডার্ক ম্যাটার আছে ধরে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বে ডার্ক ম্যাটারের পরিমাণ সাধারণ বস্তুর তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু এই সব ডার্ক ম্যাটার যোগ করেও আমরা প্রসারণ থামানোর

www.pathagar.com

মতো প্রয়োজনীয় ভরের মাত্র দশ ভাগের প্রায় এক ভাগ ভর পাই। কিন্তু মহাবিশ্বে আরেক ধরনের ডার্ক ম্যাটারও থাকতে পারে, যা সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে আছে। আমরা এখনও এটি শনাক্ত করতে পারিনি। তবে এটি পাওয়া গেলে মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব আরও অনেক বেশি হতে পারে। নিউট্রিনো নামে এক ধরনের মৌলিক কণিকা আছে। এরা সাধারণ পদার্থের সাথে কোনো ক্রিয়া করে না বলে এদেরকে শনাক্ত করা খুব কঠিন (সম্প্রতি নিউট্রিনো নিয়ে পরিচালিত একটি পরীক্ষায় পানির নিচে ব্যবহৃত একটি ডিটেকটরের পঞ্চাশ হাজার টন পানির প্রয়োজন পড়ে)। আগে মনে করা হতো এদের ভর নেই বলে এরা মহাকর্ষীয় আকর্ষণও অনুভব করে না। কিন্তু কয়েক বছর আগে পরিচালিত অনেকগুলো পরীক্ষায় দেখা গেছে এদের সামান্য ভর আছে, যা আগে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। যদি ভর থেকে থাকে, তবে তা ডার্ক ম্যাটারের একটি রূপ হতে পারে। নিউট্রিনোর এই ভরের কথা হিসেবে ধরলেও মহাবিশ্বের প্রসারণ থামানোর মতো প্রয়োজনীয় ভরের চেয়ে অনেক কম ভর পাওয়া যায়। এ কারণে সম্প্রতি পদার্থবিদরা আপাতত ফ্রিডম্যানের দ্বিতীয় মডেলটির ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

এরপর পাওয়া গেল নতুন কিছু পর্যবেক্ষণ। গত কয়েক বছরে গবেষকদের কয়েকটি দল পেনজিয়াস ও উইলসনের আবিষ্কৃত মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের তরঙ্গ নিয়ে কাজ করেছেন। এই তরঙ্গের যে সাইজ, তাতে এ থেকে মহাবিশ্বের বড়মাপের কাঠামো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। ফ্রিডম্যানের তৃতীয় মডেলের মতোই এর ইঙ্গিত সমতল মহাবিশ্বের পক্ষে। একে ব্যাখ্যা করার মতো সাধারণ বস্তু ও ডার্ক ম্যাটারের পরিমাণ যথেষ্ট না হওয়াতে পদার্থবিদরা আরেক ধরনের বস্তুর কথা ভাবছেন। এর নাম ডার্ক এনার্জি।

সম্প্রতি আরও কিছু পর্যবেক্ষণ জটিলতা আরেকটু বাড়িয়ে দিয়েছে। দেখা গেছে যে মহাবিশ্বের প্রসারণ হার না কমে বরং দিন দিন বাড়ছে। ফ্রিডম্যানের একটি মডেলেও এই কথা নেই। এটি খুবই অবাক করা ব্যাপার, কারণ মহাবিশ্বের ঘনত্ব কম হোক বা বেশি–বস্তুর উপস্থিতিতি তো প্রসারণ কিছুটা কমাবেই। আর তা ছাড়া মহাকর্ষ তো কেবল আকর্ষণই করে (বিকর্ষণ নয়)। প্রসারণ হার বেড়ে যাওয়াকে বোমার বিস্ফোরণের সাথে তুলনা করা যায়। কিন্তু এখানে বিস্ফোরণের পর দুর্বল হবার বদলে বোমার

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়া আরও শক্তিশালী হচ্ছে। কোন সেই শক্তি, যা ক্রমেই দ্রুততর গতিতে মহাবিশ্বকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এর উত্তর নিশ্চিত করে কেউ জানে না। কিন্তু আইনস্টাইন যে মহাজাগতিক ধ্রুবক (ও তার অ্যান্টিগ্র্যাভিটি ইফেক্ট বা বিপরীত মহাকর্ষ প্রভাব) নিয়ে এসে ঠিকই করেছিলেন এটা তার পক্ষে প্রমাণ হতে পারে।

প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি ও নতুন ধরনের উপগ্রহ টেলিস্কোপের কল্যাণে আমরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে ক্রমশ নতুন নতুন বিস্ময়কর তথ্য জানতে পারছি। ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের কী হবে তা সম্পর্কে এখন আমাদের জ্ঞান বেশ ভালো; মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হবে এবং প্রসারণের হার ক্রমাগত বাড়বে। সময়ও চলবে চিরকাল পর্যন্ত, তবে যারা ব্ল্যাকহোলে পড়ে যাবার মতো বোকামি করবে তাদের কথা আলাদা। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থার কী খবর? এর শুরু কীভাবে হলো, প্রসারণইবা শুরু হয়েছিল কী করে?

www.pathagar.com

অনুবাদকের নোট

১. এদের সবাই অবশ্য একসাথে একই রাতে নাও থাকতে পারে।

২. একই কারণে গ্রহরা যেহেতু আরও অনেক বেশি কাছে, তাই দূরের তারকাদের তুলনায় এদের নড়চড়া খুব বেশি চোখে পড়ে।

৩. কোনো বস্তু অন্য বস্তুর চারপাশে কক্ষপথে টিকে থাকে দুটো বলের প্রভাবে। একটি হলো, কেন্দ্রীয় বস্তুটির মহাকর্ষীয় টান। অপরটি হলো বস্তুটির কক্ষপথের বেগ, যা কেন্দ্রবিমুখী বলের জোগান দেয়। মহাকর্ষ বল একমুহূর্তের জন্য অনুপস্থিত হলে অপর বলটির প্রভাবে কক্ষপথ থেকে বস্তুটি নাক (স্পর্শক) বরাবর বাইরে ছিটকে যাবে। এখন এ ক্ষেত্রে গ্যালাক্সিদের বাইরের দিকের নক্ষত্ররা যে গতিতে ঘুরছে তাতে কেন্দ্রীয় মহাকর্ষ এদেরকে কক্ষপথে ধরে রাখতে পারার কথা নয়।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

বিগ ব্যাং, ব্ল্যাকহোল এবং মহাবিশ্বের বিবর্তন

ফ্রিডম্যানের প্রথম মডেলে (যেখানে বলা ছিল মহাবিশ্ব আবার গুটিয়ে যাবে) স্থানের মতোই চতুর্থ মাত্রা সময়ও সসীম। এটা এমন একটি রেখার মতো, যার দুদিকে দুটি প্রান্ত বা সীমানা আছে। অতএব, সময়ের একটি সমাপ্তি আছে, আবার শুরুও আছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা মহাবিশ্বে যে পরিমাণ বস্তু দেখি তা সম্পর্কে আইনস্টাইনের সমীকরণের যে সমাধানগুলো আছে, তার সব কয়টির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। তা হলো, অতীতের কোনো এক সময়ে (১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে) পার্শ্ববর্তী গ্যালাক্সিদের মাঝে কোনো দূরত্ব ছিল না। অন্য কথায়, শূন্য ব্যাসার্ধের একটি গোলকের মতো পুরো মহাবিশ্ব জিরো সাইজের একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত ছিল। সেই সময় মহাবিশ্বের ঘনত্ব এবং স্থান-কালের বক্রতা ছিল অসীম। এই সময়কেই আমরা বলি বিগ ব্যাং বা মহা বিস্ফোরণ।

কসমোলজি (মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও বিবর্তনবিষয়ক বিদ্যা) নিয়ে আমাদের যতগুলো তত্ত্ব আছে তাদের প্রত্যেকটিতেই স্থান-কালকে মসৃণ ও প্রায় সমতল ধরে নেওয়া হয়। এর ফলে আমাদের সবগুলো তত্ত্ব বিগ ব্যাং পর্যন্ত গিয়ে অকেজো হয়ে পড়ে। অসীম বক্রতার কোনো স্থান- কালকে কী করে 'প্রায় সমতল' বলা যেতে পারে! এর ফলে বিগ ব্যাং-এর আগে যদি কোনো কিছু থেকেও থাকে, আমরা সেটা কাজে লাগিয়ে বলতে পারব না যে তারপর কী ঘটবে? কেননা অনুমান করার ক্ষমতা বিগ ব্যাং পর্যন্ত এসেই শেষ।

একইভাবে যদি (এবং বাস্তবে তাই) আমরা শুধু বিগ ব্যাং-এর পরের ঘটনা জানি, তবে তা কাজে লাগিয়ে এর আগের কিছু আমরা জানত পারব না। বিগ ব্যাং এর আগের কোনো ঘটনা মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার মতো কোনো বৈজ্ঞানিক মডেলের অংশ হতে বা এ রকম কোনো মডেলের ওপর

www.pathagar.com

কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই এই ধরনের তথ্যকে মডেল থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলতে হবে সময়ের শুরুই হয়েছে বিগ ব্যাং থেকে। তাই বিগ ব্যাং ঘটার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ কে তৈরি করেছে তা বিজ্ঞানের দেখার বিষয় নয়।

মহাবিশ্বের আকার শূন্য হলে সেই সময় এর তাপমাত্রাও অসীম হবার কথা। তাই মনে করা হয় বিগ ব্যাং-এর সময় মহাবিশ্ব ছিল অসীম পরিমাণ উত্তপ্ত। প্রসারণের সাথে সাথে বিকিরণের তাপমাত্রা কমে আসে। সহজ কথায় বললে, তাপমাত্রা হলো কণার গড় শক্তি বা গতি। তাই তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় বস্তুর ওপর তার শক্ত প্রভাব পড়ে। উচ্চ তাপমাত্রায় কণাগুলো এত জোরে ছোটাছুটি করতে থাকে যে এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল নিউক্লিয়ার বা তড়িচ্চুম্বকীয় বলকেও এরা পাত্তা দেয় না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তাপমাত্রা কমে গেলে এরা একে অপরের দিকে আকর্ষণ অনুভব করে জড় হতে শুরু করবে। মহাবিশ্বে কী কী ধরনের কণিকা থাকবে তাও নির্ভর করে তাপমাত্রা ওপর এবং একই কারণে মহাবিশ্বের বয়সেরও ওপর।

অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন না যে, বস্তু বিভিন্ন কণিকা দিয়ে গঠিত। তিনি মনে করতেন, বস্তুকে যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায়। কখনও পদার্থের এমন কোনো কণা পাওয়া যাবে না যাকে আর কোনোভাবে ভাগ করা যাবে না। ডেমোক্রিটাসসহ কয়েকজন গ্রিকের বিশ্বাস ছিল উল্টো। তাঁদের মতে, এক একটি বস্তু অনেকগুলো বিভিন্ন প্রকারের পরমাণু (atom) দ্বারা গঠিত (গ্রিক ভাষায় atom শব্দের অর্থ indivisible বা অবিভাজ্য)। এখন আমরা জানি যে এটাই সঠিক, অন্তত আমাদের পরিবেশে এবং মহাবিশ্বের বর্তমানে পরিস্থিতিতে)। কিন্তু আমাদের মহাবিশ্বের পরমাণুরা সব সময় ছিল না। এরা অবিভাজ্য নয়। মহাবিশ্বের সব রকম কণিকার মধ্যে এদের পরিমাণ একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ।

পরমাণুরা আরও ছোট কণিকা দ্বারা গঠিত। এরা হলো ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। প্রোটন ও নিউট্রন নিজেরা আবার আরও ছোট কণিকা দ্বারা গঠিত। এদের নাম কোয়ার্ক। এদিকে আবার প্রতিটি কণিকার বিপরীতে আছে প্রতিকণিকা (antiparticle)। এই প্রতিকণিকাদের ভর এদের যমজ কণিকাদের সমান। কিন্তু এদের আধান (চার্জ) ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিপরীত। যেমন, ইলেকট্রনের প্রতিকণিকা হলো পজিট্রন। এর চার্জ হলো ইলেকট্রনের বিপরীত, মানে পজিটিভ। প্রতিকণিকায় তৈরি একটু

www.pathagar.com

পুরো প্রতিজগৎ (antiworld) এবং প্রতিমানব (antipeople) উপস্থিত থাকতে পারে। তবে একটি কণিকা ও প্রতিকণিকার সাক্ষাৎ হলে এরা একে অপরকে ধ্বংস করে দেয়। অতএব, আপনার সাথে প্রতিমানবের দেখা হয়ে গেলে হাত মেলাতে যাবেন না যেন! এক ঝলক আলো উদ্গীরণ করে দুজনেই হাওয়া হয়ে যাবেন!

আলোক শক্তিও আসলে আরেকটি কণিকারই একটি রূপ। এটি হলো ভরহীন কণিকা ফোটন। পৃথিবীতে প্রাপ্ত ফোটনের সবচেয়ে বড় উৎস হলো আমাদের পাশে অবস্থিত সূর্য, যা একটি বিশাল নিউক্লিয়ার চুল্লি। সূর্য আরেক ধরনের কণিকারও একটি বড় উৎস। এটা হলো আগে উল্লিখিত নিউট্রিনো (এবং অ্যান্টিনিউট্রিনো)। কিন্তু খুব হালকা এই কণিকারা বস্তুর সাথে ক্রিয়া করে না বললেই চলে। এর ফলে এরা নির্বিঘ্নে আমাদেরকে ভেদ করে চলে যায়, তাও প্রতি সেকেন্ডে বিলিয়ন বিলিয়ন হারে। পদার্থবিদরা এই ধরনের ডজন ডজন মৌলিক কণিকা আবিষ্কার করেছেন। সময়ের সাথে সাথে মহাবিশ্ব জটিল বিবর্তন প্রক্রিয়া অতিক্রম করার সময় এই কণিকার ভাণ্ডারও বিবর্তিত হয়েছে। কণিকাদের এই বিবর্তনের ফলেই পৃথিবীর মতো গ্রহ এবং আমাদের জীবদের অস্তিত্ব তৈরি হতে পেরেছে।

বিগ ব্যাং-এর এক সেকেন্ড পর মহাবিশ্বের প্রসারণ এতটা বেশি হয়েছিল যে এর তাপমাত্রা কমে প্রায় দশ বিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে। এই তাপমাত্রা সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রার দশ গুণ। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে এত বেশি পরিমাণ তাপমাত্রাও উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। এই সময় মহাবিশ্বে প্রধানত ফোটন (প্রোটনের কথা বলছি না), ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনো ও তাদের প্রতিকণিকারা ছিল। এর সাথে ছিল কিছু প্রোটন ও নিউট্রন। এ সময় এই কণিকাদের এত বেশি শক্তি ছিল যে এরা মিলিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের বহু কণিকা ও প্রতিকণিকা তৈরি করে। যেমন, ফোটনদের সংঘর্ষে ইলেকট্রন ও এর প্রতিকণিকা পজিট্রন তৈরি হতে পারে। নতুন সৃষ্ট এই কণিকাদের কেউ কেউ এদের প্রতিকণিকার সাথে মিলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। একটি ইলেকট্রনের সাথে পজিট্রনের দেখা হলে দুজনেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু উল্টোটা ঘটা এত সহজ কথা নয়। ফোটনদের মতো দুটো ভরহীন কণিকা থেকে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের মতো একটি কণিকা ও প্রতিকণিকার জোড় সৃষ্টি হতে হলে মিলিত হওয়া ভরহীন কণিকাদের একটি ন্যূনতম শক্তি থাকা প্রয়োজন। এর কারণ হচ্ছে

www.pathagar.com

ইলেকট্রন ও পজিট্রনের ভর আছে। আর এই নতুন ভর আসতে হবে সংঘর্ষে লিপ্ত কণিকাদের শক্তি থেকেই। মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হলে এবং এর তাপমাত্রা কমে গেলে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণিকাদের সংঘর্ষে যে হারে ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়া তৈরি হচ্ছিল, তার চেয়ে বেশি হারে এরা ধ্বংস হতে লাগল। ফলে শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগ ইলেকট্রন ও পজিট্রনই একে অপরকে ধ্বংস করে আরও বেশি ফোটন তৈরি করে। এর ফলে সামান্য কিছু ইলেকট্রন বাকি থাকে। অন্যদিকে নিউট্রিনো এবং অ্যান্টিনিউট্রিনোরা নিজেদের সাথে এবং অন্য কণিকাদের সাথেও খুব দুর্বলভাবে ক্রিয়া করে। ফলে এরা এতটা দ্রুত একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে না। আজও এদের উপস্থিতি থাকতে পারে। আমরা যদি এদের দেখতে পাই তবে মহাবিশ্বের প্রাথমিক উত্তপ্ত অবস্থার ভালো একটি চিত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পর আজ তাদের শক্তি এত কমে গেছে যে আমরা তাদেরকে সরাসরি দেখতে পাব না (পরোক্ষভাবে খুঁজে পারার সম্ভাবনা আছে যদিও)।

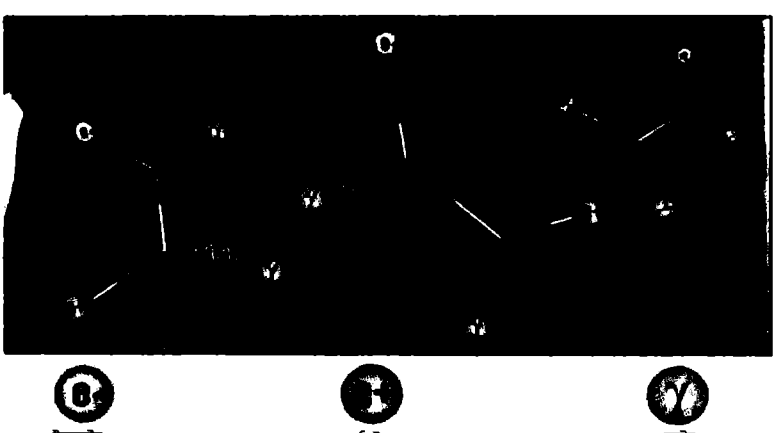

চিত্র : ফোটন-ইলেকট্রন-পজিট্রন সাম্য

[আদি মহাবিশ্বে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের মিলনে ফোটন তৈরি ও উল্টো প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি ভারসাম্য ছিল। তাপমাত্রা কমে গেলে এই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে বেশি বেশি ফোটন তৈরি হওয়া শুরু হয়। শেষে মহাবিশ্বের বেশির ভাগ ইলেকট্রন ও পজিট্রন একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আজকে উপস্থিত সামান্য কিছু ইলেকট্রনই বাকি থাকে।]

www.pathagar.com

বিগ ব্যাং-এর প্রায় একশ সেকেন্ড পরে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা কমে এক বিলিয়ন ডিগ্রিতে নেমে আসে। সবচেয়ে উত্তপ্ত নক্ষত্রদের অভ্যন্তরেও এই তাপমাত্রা থাকে। এ তাপমাত্রায় সবল বল (strong force) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সবল বল নিয়ে একাদশ অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। এটি স্বল্পপাল্লার একটি আকর্ষণী বল। এর প্রভাবে প্রোটন ও নিউট্রন একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে নিউক্লিয়াস (পরমাণুর কেন্দ্র) গঠন করে। যথেষ্ট উচ্চ তাপমাত্রায় প্রোটন ও নিউট্রনের গতি শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে পৌঁছায় (দেখুন পঞ্চম অধ্যায়)। এর ফলে এরা এদের সংঘর্ষ থেকে মুক্ত ও স্বতন্ত্রভাবে বের হয়ে আসতে পারে। কিন্তু এক বিলিয়ন ডিগ্রি তাপমাত্রায় এরা সবল বলের আকর্ষণকে ফাঁকি দিতে পারে না। এর ফলে এরা যুক্ত হয়ে ডিউটেরিয়াম পরমাণুর (ভারী হাইড্রোজেন) নিউক্লিয়াস তৈরি করে। এতে একটি করে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে। পরে ডিউটেরিয়ামের নিউক্লিয়াস আরও প্রোটন ও নিউট্রনের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। এতে থাকে দুটি করে প্রোটন ও নিউট্রন। এর সাথে লিথিয়াম ও বেরিলিয়ামের মতো অল্প কিছু অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলও তৈরি হয়। হিসাব করলে দেখা যাবে, উত্তপ্ত বিগ ব্যাং মডেলে প্রোটন ও নিউট্রনের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। অল্প কিছু পরিণত হয় ভারী হাইড্রোজেন ও অন্যান্য মৌলে। বাকি নিউট্রন ক্ষয় হয়ে প্রোটনে পরিণত হয় আর প্রোটনই হলো সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস।

মহাবিশ্বের আদি উত্তপ্ত অবস্থার এই চিত্র প্রথম তুলে ধরেন বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো। ১৯৪৮ সালে তিনি তাঁর এক ছাত্র র‍্যালফ আলফারের সাথে যৌথভাবে একটি গবেষণাপত্রে এটি প্রকাশ করেন। গ্যামোর মধ্যে রসবোধের কোনো কমতি ছিল না। তিনি তাঁর বন্ধু ও নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী হ্যান্স বেথেকে রাজি করিয়ে গবেষণাপত্রের লেখকের তালিকায় তাঁর নামও যুক্ত করে দেন। এতে করে আলফার, বেথে, গ্যামো–এই তিনটি নাম দেখতে গ্রিক বর্ণমালার প্রথম তিনটি অক্ষর আলফা, বিটা ও গামা এর মতো হলো। এদিকে আবার মহাবিশ্বের শুরু সম্পর্কিত একটি গবেষণাপত্রে এমন নাম থাকাটাও একেবারেই সার্থক। এই গবেষণাপত্রে তাঁরা একটি উল্লেখযোগ্য পূর্বাভাস প্রদান করেন। মহাবিশ্বের আদি উত্তপ্ত দশাসমূহের বিকিরণ (ফোটন-এর আকৃতিতে) আজও উপস্থিত থাকা উচিত। তবে তার তাপমাত্রা হবে পরম শূন্য তাপমাত্রার মাত্র কয়েক ডিগ্রি ওপরে (পরম শূন্য

www.pathagar.com

বা মাইনাস ২৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলো সম্ভাব্য সবচেয়ে নিম্ন তাপমাত্রা। এ তাপমাত্রায় বস্তুতে কোনো তাপ শক্তি থাকে না)।

১৯৬৫ সালে পেনজিয়াস ও উইলসন এই মাইক্রোওয়েভ বিকিরণই খুঁজে পেয়েছিলেন। আলফার, বেথে ও গ্যামো যখন তাঁদের গবেষণাপত্র লেখেন, সেই সময় প্রোটন ও নিউট্রনের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া সম্পর্কে খুব বেশি জানা ছিল না। ফলে আদি মহাবিশ্বের বিভিন্ন মৌলের অনুপাত সম্পর্কে করা অনুমানে কিছুটা ভুল ছিল। কিন্তু আধুনিক জ্ঞানের আলোকে এই হিসাবগুলো বারবার করার পর বর্তমানে তার সাথে পর্যবেক্ষণ মিলে গেছে। তবুও মহাবিশ্বের চার ভাগের এক ভাগ ভর কেন হিলিয়াম হয়ে আছে তা ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন।

কিন্তু এই চিত্রেও কিছু সমস্যা আছে। বিগ ব্যাং মডেল অনুসারে আদি মহাবিশ্বের এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে তাপ প্রবাহিত হবার মতো যথেষ্ট সময় ছিল না। এর অর্থ হলো, মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থায় সব দিকে ঠিক একই পরিমাণ তাপমাত্রা থাকবে। তা না হলে আমরা যেকোনো দিকে তাকিয়ে মাইক্রোয়েভ পটভূমি বিকিরণকে একই তাপমাত্রায় দেখতে পেতাম না। উপরন্তু প্রাথমিক অবস্থায় প্রসারণের হারকেও হতে হয়েছিল খুব নিখুঁত। না হলে আবার শুরু হয়ে যেত সঙ্কোচন। মহাবিশ্ব ঠিক এভাবেই কেন শুরু হলো তার ব্যাখা পাওয়া কঠিন। হতে পারে ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করার জন্য এ কাজ করেছেন। বর্তমান মহাবিশ্বের মতো কিছু তৈরি হবার মতো অনেকগুলো আলাদা প্রাথমিক অবস্থা নিয়ে একজন বিজ্ঞানী একটি মডেল তৈরির চেষ্টা করেছেন। ইনি হলেন এমআইটির (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি) বিজ্ঞানী অ্যালান গুথ। তিনি প্রস্তাব করলেন, প্রাথমিক অবস্থায় মহাবিশ্ব সম্ভবত কিছু সময় ধরে খুব দ্রুত গতিতে প্রসারিত হয়েছিল। এই ধরনের প্রসারণকে বলা হয় স্ফীতি। অর্থাৎ এ সময় প্রসারণের হার ক্রমশ বাড়ছিল। গুথের মতে, সেই সময় এক সেকন্ডের ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ একশ কোটি কোটি কোটি কোটি (এক এর পরে ৩০টি শূন্য) গুণ বেড়ে যায়। এই তীব্র প্রসারণের ফলে যেকোনো বিষমতা (একেক দিকে একেক রকম থাকা) উধাও হয়ে যাবার কথা। যেমন আপনি যদি একটি বেলুনকে ফুলিয়ে বড় করেন, তাহলে এর ভাঁজগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। এ কারণে আদি মহাবিশ্বের অনেকগুলো আলাদা বিষম অবস্থা থেকে কীভাবে বর্তমান মসৃণ

www.pathagar.com

ও সুষম (সব দিকে একই রকম) মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে, স্ফীতির মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এ কারণে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে আমরা বিগ ব্যাং ঘটার এক সেকেন্ডের এক বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন (এক এর পরে ৩৩টি শূন্য) ভাগের এক ভাগ পরের সময়ের সঠিক চিত্রও বুঝতে পেরেছি।

প্রাথমিক সময়ের এত সব অস্থির কাণ্ডের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হিলিয়াম এবং লিথিয়ামের মতো অন্য কিছু মৌলের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এরপর প্রায় কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে মহাবিশ্বের প্রসারণ অব্যাহত থাকে, এ সময়ের মধ্যে বড় তেমন কিছু ঘটেনি। এরপর তাপমাত্রা নেমে হয় কয়েক হাজার ডিগ্রি। এবারে ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াস (যেখানে প্রোটন ও ইলেকট্রন থাকে) একে অপরের প্রতি ক্রিয়াশীল তড়িচ্চুম্বকীয় আকর্ষণকে আর এড়িয়ে যেতে পারে না। এরা মিলিত হয়ে গঠন করে পরমাণু। সামগ্রিকভাগে মহাবিশ্ব প্রসারিত হওয়া অব্যাহতই রেখেছিল, ক্রমশ ঠাণ্ডাও হচ্ছিল। কিন্তু যে অঞ্চলের ঘনত্ব গড় ঘনত্বের চেয়ে কিছুটা বেশি তাতে মহাকর্ষের ফলে প্রসারণে কিছুটা ভাটা পড়ে।

কিছু অঞ্চলে শেষ পর্যন্ত প্রসারণ থেমেই গেল। এটি এরপর গুটিয়ে যেতে থাকবে। গুটিয়ে যাবার সময় বাইরের অঞ্চলের মহাকর্ষীয় টানের প্রভাবে এটি কিছুটা আবর্তিত হতে শুরু করে। এই গুটিয়ে যাওয়া অঞ্চল আরও ছোট হয়ে গেলে এর ঘূর্ণন প্রবণতা বেড়ে যায়। যেমন, বরফের ওপর স্কেটিং করার সময় হাতের বাহুকে ভেতরের দিকে গুটিয়ে নিলে বেশি জোরে ঘোরা যায়। শেষে এই অঞ্চল যথেষ্ট ছোট্ট হয়ে গেলে এটি এত জোরে ঘুরতে থাকে যে তা মহাকর্ষীয় টানের সাথে ভারসাম্য করতে সক্ষম হয়। এভাবেই চাকতির মতো ঘূর্ণনশীল গ্যালাক্সিদের জন্ম হয়। যে অঞ্চলে ঘূর্ণন ছিল না, তা রূপ নেয় উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিতে। এ অঞ্চলে সঙ্কোচন থেমে যাওয়ার কারণ হচ্ছে গ্যালাক্সির স্বতন্ত্র অংশগুলো এর কেন্দ্রের চারদিকে ভারসাম্য বজায় রেখে ঘুরেই যাচ্ছিল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে গ্যালাক্সির নিজের ঘূর্ণন থেমে গিয়েছিল।

সময় পার হবার সাথে সাথে গ্যালাক্সিতে উপস্থিত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস মহাকর্ষের টানে গুটিয়ে গিয়ে ছোট ছোট আলাদা মেঘ গঠন করে। এই মেঘ সঙ্কুচিত হলে এর মধ্যে থাকা পরমাণু একে অপরের সাথে সংঘর্ষ করে করে গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। একসময় এর তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে এতে নিউক্লিয়ার ফিউশন (সংযোজন) বিক্রিয়া শুরু হয়। এই

www.pathagar.com

ফিউশনের ফলে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয়। নিয়ন্ত্রিত উপায়ে বিস্ফোরিত একটি হাইড্রোজেন বোমার মতো এই বিক্রিয়ায় নিঃসৃত তাপের কারণেই একটি নক্ষত্র উজ্জ্বল হয়। এই বাড়তি তাপ গ্যাসের চাপও (বাইরের দিকে) বাড়িয়ে তোলে। একসময় এই চাপ মহাকর্ষীয় টানের (যা কাজ করে ভেতরের দিকে, ঘটাতে চায় সঙ্কোচন) সাথে সেয়ানে সেয়ানে লড়তে পারে। এর ফলে গ্যাসের সঙ্কোচন বন্ধ হয়। এভাবেই এই মেঘ আমাদের সূর্যের মতো নক্ষত্রে পরিণত হয়। এরা হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বালিয়ে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করে, বিকিরণ করে তাপ ও আলো। এর উদাহরণ অনেকটা বেলুনের মতো–ভেতরে থাকা বাতাসের বাইরের দিকের প্রসারণ চাপ এবং বেলুনের রাবারের নিজস্ব টান (যা বেলুনকে ছোট করে ফেলতে চায়) একে অপরকে স্থির রাখে।

উত্তপ্ত গ্যাসের মেঘ একবার নক্ষত্র হয়ে গেলে তা বহু দিন ধরে স্থিতিশীল থাকে। এ অবস্থায় নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার তাপ ও মহাকর্ষীয় টান একে অপরকে ধরে রাখে। কিন্তু একসময় নক্ষত্রের হাইড্রোজেন ও অন্যান্য নিউক্লিয়ার জ্বালানি ফুরিয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, শুরুতে একটি নক্ষত্রের যত বেশি পরিমাণ ভর থাকে, এটি তত তাড়াতাড়ি জ্বালানি ফুরিয়ে ফেলে। এর কারণ হচ্ছে, একটি নক্ষত্রের যত বেশি ভর থাকে এর মহাকর্ষীয় টানের সাথে ভারসাম্যে থাকতে একে তত বেশি উত্তপ্ত হতে হয়। আর নক্ষত্রটি যত বেশি উত্তপ্ত হবে তত দ্রুত গতিতে এর মধ্যে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া হবে এবং তত দ্রুত এর জ্বালানি শেষ হবে। আমাদের সূর্যের কাছে যে জ্বালানি আছে তা দিয়ে এটি সম্ভবত আরও প্রায় পাঁচ বিলিয়ন (পাঁচশ কোটি) বছর চলতে পারবে। কিন্তু আরও বেশি ভরের নক্ষত্ররা একশ মিলিয়ন (দশ কোটি) বছরের মধ্যেও জ্বালানি ফুরিয়ে ফেলতে পারে। এই সময়টি আমাদের মহাবিশ্বের বয়সের তুলনায় অনেক ছোট্ট।

জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে নক্ষত্রটি আবার ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। মহাকর্ষ আবার বিজয়ী হয়। শুরু হয় সঙ্কোচন। এর ফলে পরমাণুরা একে অপরের সাথে জড়িয়ে যায়। এর ফলে নক্ষত্রটি আবার উত্তপ্ত হতে থাকে। উত্তাপ আরও বাড়লে এবার এতে হিলিয়াম থেকে আরও ভারী[১] মৌল যেমন কার্বন বা অক্সিজেন উৎপন্ন হবে। এরপর কী হবে তা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। কিন্তু খুব সম্ভব, এর কেন্দ্রীয় অঞ্চল গুটিয়ে গিয়ে অতি ঘন অবস্থা যেমন ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণ গহ্বর তৈরি করবে। ব্ল্যাকহোল শব্দটা নতুন।

www.pathagar.com

আমেরিকান বিজ্ঞানী জন হুইলার ১৯৬৯ সালে শব্দটি তৈরি করেন। এর মাধ্যমে তিনি অন্তত দুই শ বছর আগের একটি ধারণার চিত্র তুলে ধরেন। এটা সেই সময়ের কথা যখন আলো সম্পর্কে দুটো তত্ত্ব ছিল। একটি মত ছিল নিউটনের পছন্দনীয়। এই মত অনুসারে, আলো কণা দিয়ে তৈরি। আরেকটি মতের বক্তব্য ছিল, আলো তৈরি তরঙ্গ দিয়ে। এখন আমরা জানি, দুটো তত্ত্বই সঠিক। নবম অধ্যায়ে আমরা দেখব, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কণা-তরঙ্গের দ্বৈততায় (দ্বিমুখী আচরণ) আলোকে কণা ও তরঙ্গ দুই-ই মনে করা যায়। কণা ও তরঙ্গের ধারণাগুলো আমরাই বানিয়েছি, এমন না যে প্রকৃতির সব ঘটনা এর কোনো একটির মতো হতেই হবে।

আলোকে তরঙ্গ ধরে নিলে এটি মহাকর্ষের প্রভাবে কীভাবে কাজ করবে তা বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু আলোকে যদি আমরা কণায় তৈরি মনে করি, তাহলে এই কণারা কামানের গোলা, রকেট বা গ্রহদের মতোই মহাকর্ষ দ্বারা আকৃষ্ট হবে বলে আশা করা যায়। যেমন একটি কামানের গোলাকে পৃথিবীর বা কোনো নক্ষত্রের পৃষ্ঠ থেকে ওপরে ছুড়লে (নিচের ছবিতে দেখুন) একসময় এটি থেমে যাবে। এরপর এটি আবার নিচে নামতে থাকবে। তবে একে একটি নির্দিষ্ট বেগের চেয়ে জোরে ছুড়ে মারলে ভিন্ন কিছু ঘটবে (এটি আর ফিরে আসবে না)। এই ন্যূনতম বেগকে বলে মুক্তি বেগ। কোনো নক্ষত্রের মুক্তি বেগ নির্ভর করে এর মহাকর্ষী টানের ওপর। ভর বেশি হলে মুক্তি বেগের মানও হয় বেশি। একসময় মানুষ ভাবত আলোর গতি হলো অসীম। এর ফলে মহাকর্ষ একে কিছুতেই থামাতে পারবে না। কিন্তু রোমা সাহেব আলোর নির্দিষ্ট গতির কথা আবিষ্কার করলে বোঝা গেল, এর ওপর মহাকর্ষের প্রভাব থাকতেও পারে। নক্ষত্রের ভর যথেষ্ট বেশি হলে আলোর বেগও হবে এর মুক্তি বেগের চেয়ে কম। ফলে নক্ষত্র থেকে বের হওয়া যেকোনো আলো আবার এতেই ফিরে আসবে।

এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ক্যামব্রিজের শিক্ষক জন মিচেল ১৭৮৩ সালে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এটি লন্ডনের ফিলোসফিক্যাল ট্রানজেকশন অব দি রয়েল সোসাইটি জার্নালে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বলেন যে একটি নক্ষত্র যথেষ্ট আঁটসাঁট (আকারে ছোট) ও বেশি ভরবিশিষ্ট হলে এর শক্তিশালী মহাকর্ষের কারণে এর ভেতর থেকে আলো বের হয়ে আসতে পারবে না। এর পৃষ্ঠ থেকে বের হওয়া যেকোনো আলো বেশি দূর যাবার আগেই এটার মহাকর্ষ তাকে টেনে ভেতরে নিয়ে

www.pathagar.com

আসবে। এ ধরনের বস্তুদেরকে এখন আমরা ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর বলি, কারণ এরা আসলেই তাই: মহাশূন্যের কালো শূন্যতা।

কয়েক বছর পরে ফরাসি বিজ্ঞানী মারকুই দে ল্যাপ্লাসও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে একই রকম একটি মত প্রকাশ করেন। তিনি এই কথাটি প্রকাশ করেন তাঁর 'দি সিস্টেম অব দি ওয়ার্ল্ড' বইয়ে।

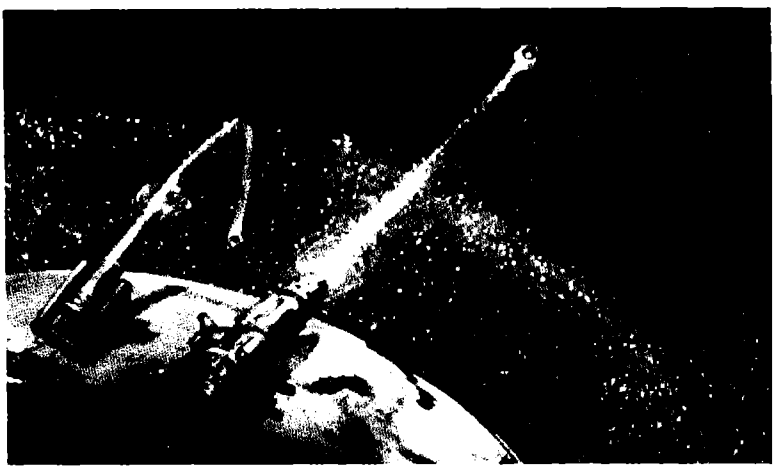

চিত্র : মুক্তি বেগের ওপরে ও নিচের বেগে নিক্ষিপ্ত কামানের গোলা
[মুক্তি বেগের চেয়ে জোরে ছুড়লে what goes up must come down (ওপরে উঠলে নিচেও নামতে হবে) কথাটি আর খাটে না।]

মজার ব্যাপার হলো, তিনি কথাটি বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে উল্লেখ করলেও পরে তা মুছে ফেলেন। হয়তো ভেবেছিলেন চিন্তাটা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। উনিশ শতক যেতে যেতে আলোর কণা তত্ত্ব পরাজিত হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল, তরঙ্গ তত্ত্ব দ্বারাই তো সব কিছু ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। সত্যি বলতে, নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব অনুসারে আলোকেও কামানের গোলার মতো ধরে নেওয়া যুক্তিসংগত নয়। আলোর বেগ তো নির্দিষ্ট। পৃথিবী থেকে ওপরে নিক্ষিপ্ত কামানের গোলা অভিকর্ষের ফলে গতি হারিয়ে ফেলবে এবং শেষমেশ থেমে গিয়ে নিচে নেমে আসবে। কিন্তু আলো তো একটি নির্দিষ্ট বেগে ওপরের দিকে যেতেই থাকবে। ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশ করলে বোঝা গেল, আলো কীভাবে মহাকর্ষ দ্বারা ক্রিয়াশীল হলো। বেশি ভরের নক্ষত্রের কী পরিণতি

www.pathagar.com

ঘটবে তা প্রথম সমাধান করেন তরুণ আমেরিকান বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার। তিনি ১৯৩৯ সালে সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে কাজটি করেন।

ওপেনহাইমারের গবেষণা থেকে বর্তমানে যে ধারণা আমরা পাচ্ছি তা হলো : নক্ষত্রের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে স্থান-কাল ভেদ করে আসা আলোর গতিপথ মূল পথ থেকে সরে যায়। সূর্যগ্রহণের সময় দূরের নক্ষত্রের আলোকে এ কারণেই বেঁকে যেতে দেখা যায়। নক্ষত্রটি সঙ্কুচিত হলে এর ঘনত্ব আরও বেড়ে যায়। এর ফলে এর পৃষ্ঠের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র আরও শক্তিশালী হয় (মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে নক্ষত্রটির কেন্দ্র থেকে বাইরে ছড়িয়ে থাকে। নক্ষত্রটি ছোট হয়ে গেলে এর পৃষ্ঠ কেন্দ্রের আরও কাছে চলে আসে। ফলে আকর্ষণ হয় আরও তীব্র)। ক্ষেত্র শক্তিশালী হলে পৃষ্ঠের কাছাকাছি অঞ্চলে আলো ভেতরের দিকে আরও বেশি করে বেঁকে যায়। শেষে নক্ষত্রটি একটি নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ পর্যন্ত ছোট হয়ে গেলে পৃষ্ঠের মহাকর্ষীয় এত বেশি শক্তিশালী হয় যে আলোর পথ ভেতরের দিকে এমনভাবে বেঁকে যায়, যা আর বের হয়ে আসতে পারে না।

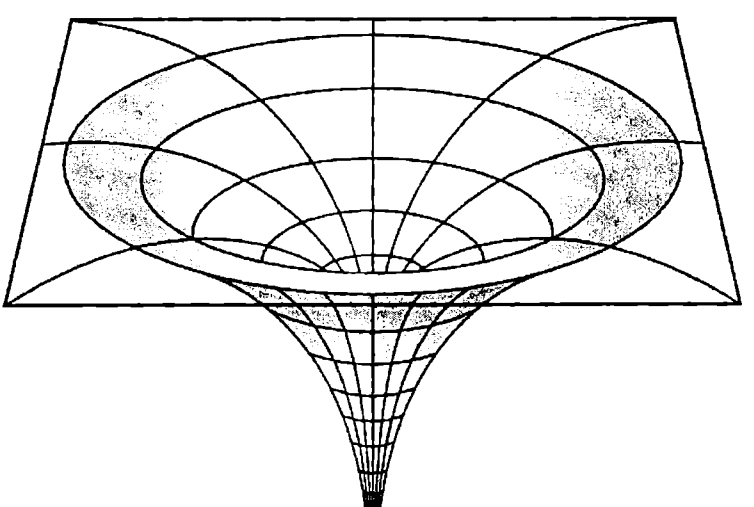

চিত্র : ব্ল্যাকহোলের আশপাশে স্থান-কাল এভাবেই বেঁকে গিয়ে আলোকে ভেতরে টেনে নেয়।
ছবি : অনুবাদক (ইন্টারনেট অবলম্বনে)

www.pathagar.com

আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে কোনো কিছুই আলোর চেয়ে দ্রুত গতিতে চলতে পারে না। অতএব আলো বের হতে না পারার অর্থ হচ্ছে ওখান থেকে আসলে কোনো কিছুই বের হতে পারবে না। সব কিছুই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কবলে পড়ে ভেতরের পড়ে থাকবে। সঙ্কুচিত নক্ষত্রটি এর চারপাশে স্থান-কালের এমন একটি অঞ্চল তৈরি করবে, যা থেকে আলো বের হয়ে দূরের কোনো দর্শকের চোখ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। এই অঞ্চলের নাম ব্ল্যাকহোল। ব্ল্যাকহোলের বাইরের সীমানার নাম ঘটনা দিগন্ত (event horizon)। বর্তমানে হাবল স্পেইস টেলিস্কোপসহ আরও কিছু টেলিস্কোপের কল্যাণে আমরা অহরই আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি ব্ল্যাকহোল খুঁজে পাচ্ছি। এই টেলিস্কোপগুলো দিয়ে দৃশ্যমান আলোর বদলে এক্স-রে ও গামা রশ্মিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়। একটি স্যাটেলাইট আকাশের একটিমাত্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে পনের শ ব্ল্যাকহোল খুঁজে পেয়েছে। আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রেও একখানা ব্ল্যাকহোল পাওয়া গেছে। এর ভর সূর্যের ১০ লাখ গুণের চেয়ে বেশি। এই সুপারম্যাসিভ[২] ব্ল্যাকহোলটিকে কেন্দ্র করে একটি নক্ষত্র আলোর ২ শতাংশ গতি নিয়ে ঘুরছে। একটি নিউক্লিয়াসকে (পরমাণুর কেন্দ্র) কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকা একটি ইলেক্ট্রনের গড় গতিও এর চেয়ে কম।

একটি বিশাল ভরের নক্ষত্র গুটিয়ে ব্ল্যাক হোল তৈরি হবার সময় কী দেখা যাবে? এটা জানতে হলে মাথায় রাখতে হবে যে আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে পরম সময় বলতে কিছু নেই। অন্য কথায়, প্রত্যেক দর্শক তার নিজের মতো করে সময় মাপবেন। নক্ষত্রের পৃষ্ঠে অবস্থান করলে যে সময় পাওয়া যাবে, দূরে অবস্থান করা কেউ তার চেয়ে ভিন্ন সময় পাবেন। এর কারণ হলো, নক্ষত্রের পৃষ্ঠে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র বেশি শক্তিশালী।

এখন ধরুন, একটি নক্ষত্র ভেতরের দিকে গুটিয়ে যাওয়ার সময় এক অকুতোভয় নভোচারী এর পৃষ্ঠে বসে আছেন। কোনো একসময় হয়তো তাঁর ঘড়িতে দেখা গেল ১১:০০টা বাজে। ঠিক এই সময় নক্ষত্রটি সঙ্কট ব্যাসার্ধ[৩] পার হয়ে আরও ছোট হয়ে গেল। এখন এর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এতটা শক্তিশালী হল যে কিছুই আর বের হতে পারবে না। এখন ধরুন, তাকে বলা হয়েছিল যে ঘড়ি দেখে প্রতি সেকেন্ডে একটি করে সঙ্কেত পাঠাতে হবে। সঙ্কেত গ্রহণ করার জন্য একটু দূরে একটি মহাকাশযান নক্ষত্রটিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তিনি যখন সঙ্কেত পাঠানো শুরু করেন তখন

www.pathagar.com

সময় ১০:৫৯:৫৮। অর্থাৎ, ১১:০০টা বাজতে আর দুই সেকেন্ড বাকি। এখন মহাকাশযানে বসে তাঁর সাথীরা কী দেখতে পাবেন?

এর আগে আমরা থট এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে দেখেছিলাম মহাকর্ষের কারণে রকেটের ভেতরে সময় ধীরে চলে। মহাকর্ষ শক্তিশালী হলে এই প্রভাবও হয় বেশি। নক্ষত্রের পৃষ্ঠে থাকা নভোচারীর কাছে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মান তাঁর সাথীদের চেয়ে শক্তিশালী। এর ফলে তাঁর কাছে যেটা এক সেকেন্ড, সেটাই তাঁর সাথীদের কাছে আরও বেশি সময় মনে হবে। নক্ষত্র গুটিয়ে যাবার সময় তিনিও যখন ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছেন, মহাকর্ষ ক্রমেই তত শক্তিশালী হচ্ছে। এর ফলে মহাকাশযানের যাত্রীদের কাছে তাঁর পাঠানো বিভিন্ন সঙ্কেতের মধ্যবর্তী সময় ক্রমেই লম্বা মনে হতে থাকবে। সময়ের এই প্রসারণ ১০:৫৯:৫৯ এর আগে খুব ক্ষুদ্র হবে। তাই মহাকাশযানের যাত্রীদেরকে ১০:৫৯:৫৮ এবং ১০:৫৯:৫৯ সময়ে পাঠানো সঙ্কেত দুটি পেতে এক সেকেন্ডের চেয়ে সামান্য বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু ১১:০০টার সময় পাঠানো সঙ্কেত পেতে তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে চিরকাল[৪]।

১০:৫৯:৫৯ ও ১১:০০টার মধ্যবর্তী সময়ে নক্ষত্রের পৃষ্ঠে যা কিছু ঘটবে তা মহাকাশযান থেকে দেখতে অসীম সময়ের প্রয়োজন হবে। ১১:০০টা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে নভোচারীর পাঠানোর সঙ্কেতের মতোই আলোর তরঙ্গের পর্যায়ক্রমিক খাঁজ ও চূড়ার পার্থক্য লম্বা হতে থাকবে। আমরা জানি, প্রতি সেকেন্ডে সৃষ্ট চূড়া ও খাঁজের সংখ্যাকেই আলোর কম্পাঙ্ক বলে। অতএব, মহাকাশযানের দর্শকদের কাছে নক্ষত্রের আলোর কম্পাঙ্ক কমে যেতে থাকবে। এই আলো তাই ধীরে ধীরে লাল (এবং ঝাপসা) হতে থাকবে। একসময় নক্ষত্রটি এত অনুজ্জ্বল হয়ে যাবে যে একে আর যান থেকে দেখা যাবে না। সামনে শুধুই পড়ে থাকবে মহাশূন্যের এক কালো গহ্বর। তবে যানের ওপর এর মহাকর্ষীয় টান চলতেই থাকবে এবং যানটিও একে ঘিরে চলতে থাকবে।

এই দৃশ্য অবশ্য পুরোপুরি বাস্তবসম্মত নয়। এতে একটু সমস্যা আছে। নক্ষত্র থেকে দূরের দিকে মহাকর্ষ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে আমাদের নির্ভীক নভোচারীর পায়ের কাছে মহাকর্ষ সব সময় তার মাথার চেয়ে বেশি হবে। মহাকর্ষের এই পার্থক্য তাকে সেমাইয়ের মতো টেনে লম্বা করে দেবে। এর ফলে নক্ষত্রটি সঙ্কট ব্যাসার্ধে পৌঁছে ঘটনা দিগন্ত তৈরি করার

www.pathagar.com

আগেই তিনি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। অবশ্য আমাদের বিশ্বাস, মহাবিশ্বে আরও বড় বড় বস্তুও আছে। যেমন গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় অঞ্চলেও মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনের ফলে ব্ল্যাকহোল তৈরি হতে পারে। আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রেই এ রকম একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল আছে। এ ধরনের কোনো ব্ল্যাকহোল অভিযানে গেলে নভোচারীকে আগের মতো বিপদে পড়তে হবে না। সঙ্কট ব্যাসার্ধে পৌঁছেও তাঁর বিশেষ কোনো অনুভূতি হবে না। তিনি নিজের অজান্তেই পয়েন্ট অব নো রিটার্ন (point of no return, অর্থাৎ যা থেকে আর ফিরে আসা যাবে না) পার হয়ে যাবেন। অবশ্য বাইরে থেকে দেখতে আগের মতোই তাঁর পাঠানো সঙ্কেত দীর্ঘস্থায়ী হতে হতে একসময় হারিয়ে যাবে। আর নভোচারীর ঘড়ি অনুসারে আরও কয়েক ঘণ্টা পরে ঠিকই বিপদ দেখা দেবে। মহাকর্ষের ফলে সঙ্কোচন অব্যাহত থাকায় একসময় তাঁর মাথা ও পায়ের কাছে মহাকর্ষীয় বলের পার্থক্য এত বেশি হবে যে তিনি আগের মতোই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন।

চিত্র : মহাকর্ষীয় টান

[দূরত্বের সাথে সাথে মহাকর্ষ দুর্বল হতে থাকে বলে পৃথিবীর আকর্ষণ আপনার পায়ের চেয়ে মাথায় মহাকর্ষীয় টান কম। এখানে পার্থক্য এক মিটার বা তার কাছাকাছি, তাই এখানে মহাকর্ষের পার্থক্য খুব সামান্য বলে তা আমরা টের পাই না। কিন্তু ব্ল্যাক হোলের কাছে থাকা একজন নভোচারী ঠিকই ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বেন।]

www.pathagar.com

অনেক সময় একটি বড় ভরের নক্ষত্র গুটিয়ে যাওয়ার সময় এর বহিঃস্থ অঞ্চল তীব্র বিস্ফোরণের মাধ্যমে বাইরে ছিটকে পড়তে পারে। একে বলা হয় সুপারনোভা। এই বিস্ফোরণের এত শক্তিশালী যে এটি একাই পুরো গ্যালাক্সির বাকি সব নক্ষত্রের চেয়ে উজ্জ্বল হতে পারে। এ রকম একটি সুপারনোভার অবশিষ্টাংশকেই আমরা এখন কাঁকড়া নীহারিকা (Crab nebula) নামে চিনি। চীন দেশে ১০৫৪ সালে একে দেখার কথা লেখা আছে। এ ক্ষেত্রে বিস্ফোরিত নক্ষত্রটির দূরত্ব ছিল পাঁচ হাজার আলোকবর্ষ। এর পরেও বহু মাস ধরে একে খালি চোখে দেখা গিয়েছিল। এটি এত বেশি উজ্জ্বল ছিল যে একে দিনেরবেলায়ও দেখা যেত। রাতেরবেলায় এর আলোতে বই পড়া যেত। এটি যদি এর দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ, পাঁচশ আলোকবর্ষ দূরে থাকত তবে এটি একশ গুণ উজ্জ্বল হতো। সে ক্ষেত্রে রাত আর দিনের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকত না। এই বিস্ফোরণের তীব্রতা পৃথিবীতে আলো প্রদানের ক্ষেত্রে সূর্যের সাথে পাল্লা দিতে পারত, যদিও সূর্য এর চেয়ে কোটি কোটি গুণ কাছে। মনে আছে নিশ্চয়ই, আমাদের সূর্যের দূরত্ব কিন্তু মাত্র ৮ আলোক মিনিট। এত কাছে যদি কোনো সুপারনোভা থাকত, পৃথিবী নিজে ঠিকই থাকত, কিন্তু বিকিরণের কারণে সব প্রাণী ধ্বংস হয়ে যেত।

সম্প্রতি কেউ কেউ বলেছেনও যে প্রায় ২০ লাখ বছর আগে প্লাইস্টোসিন ও প্লায়োসিন যুগের মাঝখানে যে সামুদ্রিক প্রাণীরা মারা পড়েছিল তাতেও একটি সুপারনোভা থেকে আসা মহাজাগতিক বিকিরণের ভূমিকা ছিল। এই সুপারনোভাটি ছিল আমাদের খুব কাছেই বৃশ্চিক-সেন্টোরাস নক্ষত্রপুঞ্জে (star cluster)। কিছু বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, উন্নত প্রাণের উদ্ভব ঘটে গ্যালাক্সির সেই অঞ্চলের দিকে, যেখানে তারকার সংখ্যা খুব বেশি থাকে না। একে বলা হয় জোন অব লাইফ। কারণ বেশি তারকাময় অঞ্চলে নিয়মিত সুপারনোভাদের হানায় প্রাণের বিকাশে বাধা পড়ে। মহাবিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে প্রতিদিন লাখ লাখ সুপারনোভা বিস্ফোরিত হয়। একটি গ্যালাক্সিতে প্রায় প্রতি শতাব্দীতে একটি করে সুপারনোভার বিস্ফোরণ ঘটে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দুর্ভাগ্য যে জানা তথ্য মতে, মিল্কিওয়েতে সর্বশেষ সুপারনোভার বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৬০৪ সালে, যখনও টেলিস্কোপ আবিষ্কৃতই হয়নি।

www.pathagar.com

আমাদের গ্যালাক্সিতে পরবর্তী সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে রো ক্যাসিওপিই নামক নক্ষত্র। ভাগ্য ভালো যে এটি আমাদের থেকে দশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে আছে, যা আমাদের জন্য নিরাপদ দূরত্ব। এটি একটি হলুদ হাইপারজায়ান্ট (yellow hyper giant) শ্রেণির তারকা। মিল্কিওয়েতে আবিষ্কৃত মাত্র সাতটি হলুদ হাইপারজায়ান্টের মধ্যে এটি একটি। ১৯৯৩ সালে একদল আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ এটি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরের কয়েক বছরে তাঁরা দেখলেন, এর তাপমাত্রা পর্যায়ক্রমে কয়েক শ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠা-নামা করছে। এরপর ২০০০ সালের গ্রীষ্মে এর তাপমাত্রা হঠাৎ করে সাত হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে চার হাজারে নেমে আসে। একই সময় তাঁরা এর বায়ুমণ্ডলে টাইটেনিয়াম অক্সাইড খুঁজে পান। তাঁদের মতে, একটি প্রচণ্ড শক ওয়েভের মাধ্যমে নক্ষত্রটি থেকে এই পদার্থ বাইরের দিকে চলে এসেছে।

নক্ষত্রের জীবনের শেষের দিকে তৈরি কিছু ভারী পদার্থ সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে গ্যালাক্সিতে ছড়িয়ে পড়ে। নতুন নক্ষত্র তৈরিতে এই পদার্থগুলো ভূমিকা রাখে। আমাদের সূর্যেই এ রকম দুই শতাংশ ভারী মৌল রয়েছে। আমাদের সূর্য হলো দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের নক্ষত্র। প্রায় পাঁচ বিলিয়ন বছর আগে এর জন্ম। এর আগে বিস্ফোরিত সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষের ঘূর্ণনশীল গ্যাসীয় মেঘ থেকে এর সৃষ্টি। সেই মেঘের বেশির ভাগ অংশই হয় সূর্য তৈরিতে কাজে লেগেছে অথবা আরও দূরে ছিটকে গেছে। অল্প কিছু পরিমাণ ভারী মৌল জড় হয়ে আমাদের পৃথিবীর মতো গ্রহদের জন্ম হয়েছে, যারা সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। আমাদের অলঙ্কার তৈরির স্বর্ণ এবং নিউক্লিয়ার চুল্লির ইউরেনিয়াম–দুটোই সৌরজগতের জন্মের আগে কোনো সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফসল!

নতুন অবস্থায় যখন পৃথিবী ঘনীভূত হয়েছিল, তখন এর উত্তাপ ছিল খুব বেশি, ছিল না কোনো বায়ুমণ্ডল। আস্তে আস্তে এটি ঠাণ্ডা হলো। বিভিন্ন পাথর থেকে নির্গত গ্যাস গড়ে তুলল বায়ুমণ্ডল। প্রাথমিক এই বায়ুমণ্ডল নিয়ে আমরা কিন্তু বাঁচতে পারতাম না। এতে কোনো অক্সিজেন ছিল না। তবে এতে অন্য গ্যাস ঠিকই ছিল, কিন্তু তা ছিল বিষাক্ত। যেমন, এতে ছিল হাইড্রোজেন সালফাইড (পচা ডিমে এই গ্যাস থাকার কারণেই তা গন্ধ ছড়ায়)। তবে প্রাণের কিছু আদি রূপ এই পরিবেশেও টিকতে পারত।

www.pathagar.com

ধারণা করা হয় এদের উৎপত্তি সাগরে। দৈব প্রক্রিয়ায় পরমাণু থেকে এদের বড় কাঠামো বা বড় অণু (macromolecule) তৈরি হয়। এটিও আবার অন্য পরমাণুকে যুক্ত করে একই ধরনের কাঠামো গঠন করে। এতে পুনরুৎপাদিত হতে হতে সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে পুনরুৎপাদনের সময় থেকে যায় ত্রুটি। এই ত্রুটিগুলো এমন যে নতুন বড় অণু নিজে নিজে তৈরি হতে না পেরে নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু কিছু ত্রুটি থেকে এমন কিছু বড় অণু তৈরি হতো, যা আগের চেয়ে ভালোভাবে পুনরুৎপাদিত হতে পারে। এরা একটু সুবিধাজনক জায়গায় থাকায় আগের বড় অণুদের জায়গা দখলে নিত। এইভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে জটিল থেকে জটিলতর স্ব-উৎপাদনশীল প্রাণীর সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক যুগের প্রাণীরা হাইড্রোজেন সালফাইডসহ বিভিন্ন পদার্থ গ্রহণ করত এবং অক্সিজেন ছেড়ে দিত। ধীরে ধীরে বায়ুমণ্ডলের উপাদান পাল্টাল। উন্নত ধরনের প্রাণী যেমন মাছ, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের আবির্ভাব ঘটল।

বিংশ শতকে এসে মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টে যায়। আমরা বুঝতে পারি, বিশাল মহাবিশ্বে আমাদের স্থান অতি নগণ্য; বুঝতে পারি সময় ও স্থান বক্র ও অবিচ্ছেদ্য; মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে এবং এর একটা শুরু আছে।

মহাবিশ্ব শুরুতে উত্তপ্ত ছিল এবং পরে প্রসারিত হয়ে ধীরে ধীরে শীতল হয়–এই তথ্য আমরা পাই আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব-সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে। আজ পর্যন্ত এর সব অনুমান পর্যবেক্ষণের সাথে মিলে গেছে, যা এই তত্ত্বের এক বড় বিজয়। কিন্তু গণিত অসীম সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে ব্যর্থ। অথচ বিগ ব্যাং থিওরি অনুসারে একসময় মহাবিশ্বের ঘনত্ব ও স্থান-কালের বক্রতা ছিল অসীম। ফলে মহাবিশ্বের একটি বিন্দুতে গিয়ে সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব নিজেই নিজের অকার্যকরতা ও ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করছে। গণিতে এ ধরনের বিন্দুকে বলা হয় সিঙ্গুলারিটি। কোনো তত্ত্ব যখন অসীম ঘনত্ব, বক্রতা ইত্যাদির মতো সিঙ্গুলারিটির কথা বলে, বুঝতে হবে তত্ত্বে কিছু ভুল আছে। সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব একটি আংশিক তত্ত্ব, কারণ মহাবিশ্বের শুরু কীভাবে হয়েছিল এটি আমাদেরকে তা বলতে অক্ষম।

সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব ছাড়াও বিংশ শতকে আমরা প্রকৃতি সম্পর্কে আরেকটি আংশিক তত্ত্ব পেয়েছি। এটি হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্স। খুবই ক্ষুদ্র মাপের জগতের ঘটনাবলি নিয়ে এর কাজ। বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে

www.pathagar.com

আমরা জানি যে মহাবিশ্ব একসময় এত ক্ষুদ্র ছিল যে সেই অবস্থায় এর বড় মাপের গঠন নিয়ে চিন্তা করতে গেলেও কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্ষুদ্র প্রতিক্রিয়াও মাথায় রাখতে হবে। আমরা পরের অধ্যায়ে দেখব যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বকে পুরোপুরি বুঝতে আমরা এই দুটি তত্ত্বের ওপরই নির্ভর করছি। এই দুটো আংশিক তত্ত্বকে জোড়া লাগিয়ে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি নামে একটিমাত্র তত্ত্ব তৈরি করতে হবে। এতে বিজ্ঞানের সাধারণ সব সূত্র সর্বত্র কাজ করবে, এমনকি সময়ের শুরুতেও। কোনো সিঙ্গুলারিটির প্রয়োজন হবে না।

www.pathagar.com

অনুবাদকের নোট

১. ভারী বলার অর্থ হচ্ছে এতে প্রোটন, ইলেক্ট্রন ও নিউট্রনের সংখ্যা বেড়ে যায়। প্রথমে এক প্রোটনের হাইড্রোজেন থেকে দুই প্রোটনের হিলিয়াম হতে থাকে। পরে আরও বেশি প্রোটনবিশিষ্ট পরমাণুরা গঠিত হয়।

২. সূর্যের কয়েক লাখ থেকে শুরু করে কয়েক বিলিয়ন বা তারও বেশি ভরের ব্ল্যাকহোলদের সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল বলে। এরা সাধারণত বিভিন্ন গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকে।

৩. সঙ্কট ব্যাসার্ধ হলো নক্ষত্রের সেই ব্যাসার্ধ, যাতে পৌঁছলে এর ঘটনা দিগন্ত নামক অঞ্চল তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ, এটি ব্ল্যাকহোল হবার জন্য তৈরি হয়।

৪. অর্থাৎ, সেই সঙ্কেত আর কোনো দিনই পাওয়া যাবে না, কারণ ততক্ষণে নক্ষত্রটি ব্ল্যাক হয়ে গেছে এবং কিছুই আর এখান থেকে বের হবে না।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়
কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি

নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের মতো বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাফল্যে অভিভূত হয়ে ঊনবিংশ শতকের শুরুতে মারকুই দ্য ল্যাপ্লাস বলেছিলেন মহাবিশ্বের সব কিছুই পূর্বনির্ধারিত (deterministic)। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এমন কিছু বৈজ্ঞানিক সূত্র থাকবে, যার মাধ্যমে আমরা মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটবে তার সব কিছু অনুমান করতে পারব, অন্তত মূলনীতিগুলো তো জানবই। কোনো একসময় মহাবিশ্ব কী অবস্থায় আছে তা জানাই এর জন্য যথেষ্ট হবে। একে বলা হয় প্রারম্ভিক (initial) বা প্রান্তীয় (boundary) শর্ত। (এই সীমানা স্থানেরও হতে পারে, আবার সময়েরও হতে পারে। স্থানের ক্ষেত্রে প্রান্তীয় শর্তের অর্থ হচ্ছে মহাবিশ্বের যদি কোনো বহিঃস্থ সীমান্ত বা প্রান্ত থেকে থাকে তবে সেই প্রান্তে এর অবস্থা।) ল্যাপ্লাসের বিশ্বাস ছিল, একগুচ্ছ পূর্ণাঙ্গ সূত্র এবং উপযুক্ত প্রারম্ভিক ও প্রান্তীয় শর্তের মাধ্যমে আমরা মহাবিশ্বের অন্য যেকোনো সময়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র হাতে পাব।

প্রারম্ভিক শর্ত কেন প্রয়োজন তা খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে : বর্তমানের আলাদা আলাদা চিত্র ভবিষ্যৎকেও আলাদা আলাদা রূপ দেবে। তবে স্থানের ক্ষেত্রে প্রান্তীয় শর্তের গুরুত্ব বুঝতে পারা একটু কঠিন। মূলনীতি অবশ্য একই। যে সমীকরণের ওপর ভিত্তি করে তত্ত্ব তৈরি হবে, তার সমাধান অনেক রকম হতে পারে। অতএব আপনাকে প্রারম্ভিক বা প্রান্তীয় শর্তের সাহায্য নিয়ে ঠিক করতে হবে কোন সমাধানটি সঠিক হবে। এটা অনেকটা এ রকম যে আপনি বললেন, আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অনেক টাকা আসছে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি শেষ পর্যন্ত দেউলিয়া হয়ে যাবেন নাকি সচ্ছল থাকবেন, তা শুধু কত টাকা আসছে-যাচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে না। আপনি কত টাকা নিয়ে অ্যাকাউন্ট শুরু করেছেন তার প্রারম্ভিক ও প্রান্তীয় শর্তের ওপরও এটি নির্ভর করে।

www.pathagar.com

ল্যাপ্লাসের কথা যদি সঠিক হয় তাহলে মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থা জানার পর এই সূত্রগুলোর সাহায্যে এর অতীত ও ভবিষ্যৎ দুটো সম্পর্কেই অনুমান করা যেত। যেমন, সূর্য এবং গ্রহদের অবস্থান জানার মাধ্যমে আমরা নিউটনের সূত্র দিয়েই আগের বা পরের কোনো সময়ে সৌরজগতের অবস্থা বলতে পারি। গ্রহদের ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে নিশ্চয়তাবাদ (Determinism) আসলেই সঠিক। জ্যোতির্বিদরা সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের মতো ঘটনার অনুমান করতে বেশ সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ল্যাপ্লাস আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে অনুমান করলেন যে, অন্য সব কিছু, এমনকি মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্যও একই রকম সূত্র আছে।

আমরা ভবিষ্যতে কী করব তা কি বিজ্ঞানীরা সত্যিই বলতে পারবেন? এক গ্লাস পানিতে $১০^{২৪}$ (১ এর পরে ২৪টি শূন্য, বা এক হাজার কোটি কোটি কোটি)টির বেশি অণু থাকে। বাস্তবে আমরা কোনো দিনই এই প্রত্যেকটি অণুর অবস্থা জানার আশাই করতে পারি না, মহাবিশ্ব বা এমনকি আমাদের দেহের পূর্ণাঙ্গ অবস্থার কথা না হয় বাদই দিলাম। এর পরেও মহাবিশ্বকে পূর্বনির্ধারিত বলার অর্থ হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কের হিসাব করার ক্ষমতা থাক বা না থাক, ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিতই বটে।

বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তাবাদের এই ধারণা বহু মানুষের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়েছিল। বিরোধীরা ভেবেছিল, মহাবিশ্বকে ঈশ্বরের নিজের ইচ্ছা মতো নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবু এই মতবাদ বিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত বিজ্ঞানের মৌলিক নীতি ছিল। আস্তে আস্তে এই বিশ্বাসের বিপরীত লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। এর প্রথম দিককার কিছু প্রমাণ আসে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে ও স্যার জেমস জিন্স এর হিসাব থেকে। তাঁরা নক্ষত্রের মতো উত্তপ্ত বস্তুরা যে পরিমাণ কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ অবশ্যই নির্গত করবে তার হিসাব বের করেন। (সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, যেকোনো বস্তু উত্তপ্ত হলে তা থেকে কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ নির্গত হবে)

সেই সময়ে আমরা যে সূত্র জানতাম তা অনুসারে, একটি উত্তপ্ত বস্তু যেকোনো কম্পাঙ্কে[১] সমান হারে তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ নির্গত করবে। সেক্ষেত্রে দৃশ্যমান আলোর বর্ণালির প্রত্যেক রং-এর জন্য সমান পরিমাণ শক্তি নির্গত হবে। শুধু তাই নয়, মাইক্রোওয়েভ, বেতার, এক্স-রে ইত্যাদি সব কম্পাঙ্কের জন্যই সমান শক্তি নির্গত হবে। নিশ্চয়ই মনে আছে, প্রতি

www.pathagar.com

সেকেন্ডে একটি তরঙ্গ কতবার ওপরে-নিচে উঠানামা করে তাই হচ্ছে তরঙ্গের কম্পাঙ্ক। গণিতের ভাষায় বললে, একটি উত্তপ্ত বস্তুর সব কম্পাঙ্কের তরঙ্গ সমান হারে নির্গত করার অর্থ হচ্ছে, বস্তুটি প্রতি সেকেন্ডে শূন্য এবং দশ লাখের মধ্যবর্তী কম্পাঙ্কের তরঙ্গ তৈরি করতে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত করবে, এটি প্রতি সেকেন্ডে দশ থেকে বিশ লাখের মধ্যবর্তী কম্পাঙ্কের তরঙ্গ তৈরি করতেও সেই একই পরিমাণ শক্তি নির্গত করবে। একইভাবে প্রতি সেকেন্ডে আরও বেশি তরঙ্গ তৈরির ক্ষেত্রেও সমান শক্তি নির্গত হবে। মনে করুন, প্রতি সেকেন্ডে শূন্য থেকে দশ লাখ বা দশ থেকে বিশ লাখ ইত্যাদি পরিমাণ তরঙ্গ সৃষ্টি হতে এক একক পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। তাহলে সব কম্পাঙ্কের মোট নির্গত শক্তির পরিমাণ হবে ১+ ১+ ১+ ... অসীম পর্যন্ত। যেহেতু কোনো তরঙ্গে প্রতি সেকেন্ডে সৃষ্ট তরঙ্গের সংখ্যা অসীম, তাই শক্তির পরিমাণ যোগ করে কখনো শেষ করা যাবে না। অতএব, মোট নির্গত শক্তির পরিমাণও হবে অসীম।

১৯০০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এই হাস্যকর ফলাফল এড়ানোর একটি উপায় বের করেন। তিনি বললেন যে এক্স-রেসহ অন্যান্য তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ শুধু নির্দিষ্ট বিচ্ছিন্ন গুচ্ছ আকারেই নির্গত হয়[২]। তিনি একে নাম দিলেন কোয়ান্টা (কোয়ান্টা হলো কোয়ান্টাম শব্দটির বহুবচন)। অষ্টম অধ্যায়ে আমরা বলেছি, আজকে আমরা আলোর কোয়ান্টামকে বলি ফোটন। আলোর কম্পাঙ্ক যত বেশি হবে এর শক্তির পরিমাণও হবে তত বেশি। অতএব, যেকোনো নির্দিষ্ট রং বা কম্পাঙ্কের সব ফোটন অবিকল একই রকম হলেও প্ল্যাঙ্কের তত্ত্ব অনুসারে ভিন্ন কম্পাঙ্কের ফোটনরা এই অর্থে আলাদা যে তাদের বহন করা শক্তির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। এর অর্থ হলো কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে, কোনো নির্দিষ্ট রঙের সবচেয়ে দুর্বল আলোর (একটি মাত্র ফোটন যে আলো বহন করে) শক্তির পরিমাণ তার রং-এর ওপর নির্ভর করে। যেমন, বেগুনি আলোর কম্পাঙ্ক লাল আলোর দ্বিগুণ হওয়ার কারণে এক কোয়ান্টাম বেগুনি আলোর শক্তি এক কোয়ান্টাম লাল আলোর শক্তির দ্বিগুণ। তাই, বেগুনি আলোর ক্ষুদ্রতম যে শক্তি থাকা সম্ভব তা লাল আলোর ক্ষুদ্রতম সম্ভাব্য শক্তির দ্বিগুণ।

এতে করে কৃষ্ণবস্তু সমস্যার সমাধান হয় কীভাবে? কোনো নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে একটি কৃষ্ণবস্তু যে ক্ষুদ্রতম পরিমাণ তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তি নির্গত করতে পারে তা হলো সেই কম্পাঙ্কের একটি ফোটনের বহন করা শক্তির

www.pathagar.com

সমান। বেশি কম্পাঙ্কের ফোটনের শক্তি বেশি। তাই বেশি কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রে কৃষ্ণবস্তু কর্তৃক নির্গত ক্ষুদ্রতম শক্তির পরিমাণ বড় হয় (অর্থাৎ, যার কম্পাঙ্ক যত কম তার ক্ষুদ্রতম শক্তি তত কমে যায়)। যথেষ্ট বড় কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রে একটি মাত্র কোয়ান্টামের শক্তিই একটি বস্তুতে মোট যে শক্তি আছে চেয়েও বেশি হয়। অতএব এই ক্ষেত্রে কোনো আলোই নির্গত হবে না। এর ফলে উপর্যুক্ত যোগের সেই অসীম ধারার অবসান ঘটে। প্ল্যাঙ্কের তত্ত্ব অনুসারে তাই উচ্চ কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রে বিকিরণের পরিমাণ কমে যাবে। ফলে বস্তুটি সসীম হারে শক্তি হারাবে। এভাবেই কৃষ্ণবস্তু সমস্যার সমাধান হয়।

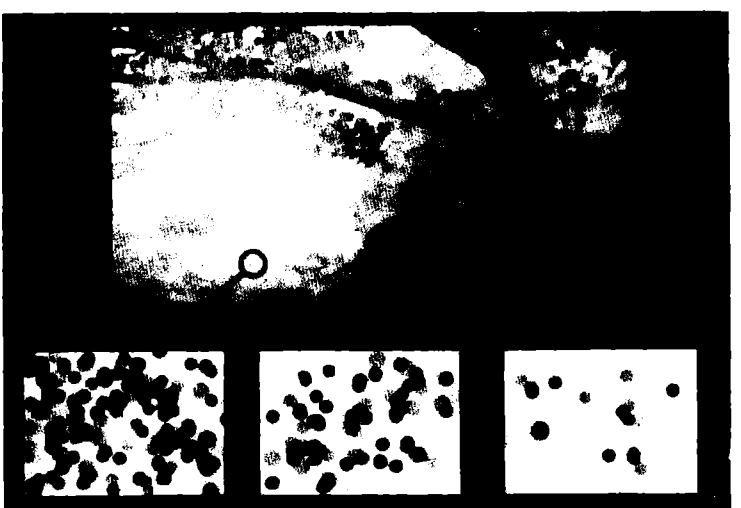

চিত্র : সম্ভাব্য সবচেয়ে দুর্বল আলো

[আলো দুর্বল হবার অর্থ হল ফোটনের সংখ্যা কম। যেকোনো রং-এর সবচেয়ে দুর্বল আলো হচ্ছে একটিমাত্র ফোটন কর্তৃক বহন করা আলো।]

উত্তপ্ত বস্তু থেকে নির্গত বিকিরণের হারের ব্যাখ্যা দিতে কোয়ান্টাম তত্ত্ব খুব ভালো কাজ করে। কিন্তু ১৯২৬ সালের আগে বোঝা যায়নি নিশ্চয়তাবাদ (determinism) সম্পর্ক এর মতামতা কী হবে। এর ব্যাখ্যা দিলেন আরেক জার্মান বিজ্ঞানী ওয়েরনার হাইজেনবার্গ, তাঁর বিখ্যাত অনিশ্চয়তা নীতির মাধ্যমে।

অনিশ্চয়তা নীতি বলছে, ল্যাপ্লাসের বিশ্বাস সঠিক নয়। বৈজ্ঞানিক সূত্র ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ অনুমান করার পুরো স্বাধীনতা প্রকৃতি আমাদেরকে

www.pathagar.com

দেয় না। এর কারণ হলো, ভবিষ্যতে কোনো কণার অবস্থান ও গতিবেগ কী হবে তা জানতে হলে এর প্রাথমিক অবস্থা জানতে হবে। অর্থাৎ, এর বর্তমান অবস্থান ও বেগ সঠিকভাবে জানতে হবে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এটা করতে হলে কণার ওপর আলো ফেলতে হবে। এখন কণাটিতে ধাক্কা লেগে কিছু আলো এদিক-সেদিক সরে যাবেঁ। আলোর এই ছড়িয়ে পড়া দেখে দর্শক কণার অবস্থান বের করতে পারবেন। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর সংবেদনশীলতা সীমিত। অন্যদিকে ঐ কণার অবস্থান নিক্ষিপ্ত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (তরঙ্গের পর পর দুটি চূড়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব) চেয়ে বেশি সূক্ষ্ম করে বের করা যাবে না। অতএব ঐ কণার অবস্থান সঠিকভাবে বের করতে হলে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করতে হবে (যাতে বেশি সূক্ষ্ম হিসাব পাওয়া যায়)। তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট হওয়ার অর্থ কম্পাঙ্ক বেশি। প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে, আপনি চাইলেই ইচ্ছেমতো অল্প পরিমাণ আলো ব্যবহার করতে পারেন না। আপনাকে অন্তত এক কোয়ান্টা ব্যবহার করতেই হবে। এর শক্তি আবার কম্পাঙ্ক বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকবে। অতএব আপনি যত বেশি নির্ভুলভাবে একটি কণার অবস্থান বের করতে চাইবেন, তত বেশি শক্তির আলোর কোয়ান্টা নিক্ষেপ করতে হবে।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে, আলোর মাত্র একটি কোয়ান্টামও কণাটিকে উত্তেজিত করবে। এর ফলে এর বেগ এমনভাবে বদলে যাবে, যা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আর আপনি যত বেশি শক্তিশালী আলো ব্যবহার করবেন, এই উত্তেজনা তত বেড়ে যাবে। এর অর্থ হচ্ছে, অবস্থান ভালোভাবে বের করতে গিয়ে আপনি যখন বেশি শক্তির কোয়ান্টাম ব্যবহার করছেন, আপনি তখনই কণাটিকে খুব বেশি উত্তেজিত করছেন। ফলে আপনি যত বেশি নির্ভুলভাবে কণাটির অবস্থান বের করবেন, এর বেগ সম্পর্কে ততই অনিশ্চিত তথ্য হাতে পাবেন। একইভাবে সত্য উল্টো প্রক্রিয়াও। হাইজেনবার্গ দেখান, অবস্থান ও বেগের অনিশ্চয়তার গুণফল কখনো একটি নির্দিষ্ট ধ্রুব সংখ্যার চেয়ে ছোট হয় না। এর অর্থ হলো, আপনি যদি অবস্থানের অনিশ্চয়তা কমিয়ে অর্ধেক করেন, আপনাকে বেগের অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করতে হবে। একইভাবে বেগের অনিশ্চয়তা কমাতে গেলেও বেড়ে যাবে অবস্থানের অনিশ্চয়তা। এই দেওয়া-নেওয়ার ঘটনায় প্রকৃতি কাজ করে আমাদের বিপক্ষে।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন হলো, আমাদেরকে কতটুকু অনিশ্চয়তা মেনে নিতেই হবে? এটা নির্ভর করে আগে উল্লিখিত সেই নির্দিষ্ট ধ্রুব সংখ্যাটির মানের ওপর। এই সংখ্যাটিকে বলা হয় প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। সংখ্যাটি খুবই ক্ষুদ্র। এই সংখ্যাটি ক্ষুদ্র হওয়ার কারণেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের এই অনিশ্চয়তা আপেক্ষিক তত্ত্বের মতোই খুব সহজে আমাদের চোখে পড়ে না। (অবশ্য আমাদের জীবনযাত্রার ওপর কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রভাব আছে। যেমন আধুনিক ইলেকট্রনিক্সের কথাই চিন্তা করুন।) যেমন ধরুন, আমরা যদি এক গ্রাম ভরের একটি পিং-পং বলের অবস্থান কোনো একদিকে এক সেন্টিমিটারের মধ্যে নির্ণয় করি, তাহলে আমরা এর বেগও অনেক বেশি নির্ভুলভাবে (কোয়ান্টাম কণিকার তুলনায়) মাপতে পারব। কিন্তু আমরা যদি একটি ইলেকট্রনের অবস্থান একটি পরমাণুর ব্যাসের সমান সূক্ষ্ম করেও মাপতে চাই, তাহলে আমরা এর বেগ মাপতে গেলে তা প্রতি সেকেন্ডে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার কমবেশি হয়ে যাবে। একে কোনোভাবেই নিখুঁত মান বলা যায় না।

আপনি কী প্রক্রিয়ায় বা কোন ধরনের কণার বেগ বা অবস্থান বের করতে যাচ্ছেন, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা নীতি নাক গলায় না। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি প্রকৃতির একটি মৌলিক ও অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। আমরা বিশ্বকে যেভাবে দেখি তার ওপর এর বিশাল প্রভাব আছে। সত্তর বছরের বেশি সময় পার হলেও এই প্রভাবগুলো এখনও এখনো বহু দার্শনিকের মাথায় ঢোকেনি, যার ফলে এটা এখনো বিতর্কের ভালো একটি বিষয়। অনিশ্চয়তা নীতির মাধ্যমে ল্যাপ্লাসের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। শেষ হয়ে যায় বিজ্ঞানের সেই সূত্রের স্বপ্ন, যা মহাবিশ্বের সব কিছুই আগে থেকে বলে দিতে পারবে। আমরা যদি বর্তমানকেই ঠিকমতো পরিমাপ করতে না পারি, তবে ভবিষ্যতের ঘটনা অনুমান করার তো প্রশ্নই আসে না!

এর পরেও আমরা এমন কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তার কথা কল্পনা করতে পারি, যার হাত-পা আমাদের মতো বাঁধা নয়, যিনি মহাবিশ্বকে উত্তেজিত না করেই এর বর্তমান অবস্থা জেনে নিতে পারেন। তার জন্য এমন এক গুচ্ছ সূত্র থাকবে, যা ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা সঠিকভাবে বলে দিতে পারে। কিন্তু আমাদের মতো মরণশীল প্রাণীর কাছে মহাবিশ্বের সেই মডেলের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য মিতব্যয়ীতার নীতি অবলম্বন করাই সুবিধাজনক ঃ অর্থাৎ, তত্ত্বের যে অংশটুকু পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়,

www.pathagar.com

তা বাদ দিতে হবে। দর্শনের জগতে এই নীতির নাম অকাম'স রেজর (Occam's Razor)। এর ওপর ভিত্তি করে ১৯২০-এর দশকে হাইজেনবার্গ, এরভিন স্রডিঞ্জার ও পল ডিরাক মিলে নিউটনীয় বলবিদ্যাকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে নতুন তত্ত্ব কোয়ান্টাম মেকানিক্স[৪] প্রস্তুত করেন। এর অন্যতম প্রধান ভিত্তিই হলো অনিশ্চয়তা নীতি। এই তত্ত্ব অনুসারে, পারমাণবিক কণিকাদের কোনো বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট অবস্থান ও বেগ নেই। এরা বরং অনিশ্চয়তা নীতি দ্বারা বেঁধে দেওয়া বেগ ও অবস্থানের সমন্বয়ে একটি কোয়ান্টাম অবস্থার অধিকারী হয়।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটি বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি কোনো পর্যবেক্ষণের জন্য একটিমাত্র ফলাফল অনুমান করে না, বরং অনেকগুলো আলাদা আলাদা সম্ভাব্য ফলাফল ঘোষণা করে। এর সাথে বলে দেয় প্রত্যেকটির সম্ভাবনা। অর্থাৎ, আপনি যদি একই ধরনের এবং একই প্রক্রিয়ায় শুরু হওয়া অনেকগুলো সিস্টেম[৫] থেকে অনেক বেশি বার পরিমাপ নেন তাহলে দেখা যাবে কিছু ক্ষেত্রে পরিমাপের ফলাফল পাওয়া যাবে 'ক', অন্য কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে 'খ' এবং এভাবেই চলতে থাকবে। 'ক' অথবা 'খ' কতবার ঘটবে আপনি তার একটি অনুমান বলতে করতে পারবেন, কিন্তু কোনো পরিমাপেরই নির্দিষ্ট ফলাফল বলতে পারবেন না।

চিত্র : অনিশ্চিত কোয়ান্টাম অবস্থান

[কোয়ান্টাম থিওরি অনুসারে, একটি বস্তুর অবস্থান ও বেগের পরিমাপের নির্ভুলতা অসীম হওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে বস্তুটির কী ঘটবে তাও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।]

www.pathagar.com

যেমন আপনি যদি বাণ-ফলককে (dartboard) উদ্দেশ্য করে বাণ নিক্ষেপ করেন তাহলে চিরায়ত তত্ত্ব অর্থাৎ, ননকোয়ান্টাম থিওরি অনুসারে এটি লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতেও পারে, আবার মিসও করতে পারে। নিক্ষেপের মুহূর্তে এর বেগ, অভিকর্ষের টান ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি আপনি জানেন, তবে এটি লক্ষ্যবস্তুতে লাগবে কি না, আপনি তা বলতে পারবেন। কিন্তু কোয়ান্টাম থিওরি বলছে, না, আপনি তা নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না। এটি বলছে যে আপনার নিক্ষিপ্ত বাণ ফলকের কেন্দ্রে লাগার যেমন সম্ভাবনা আছে, তেমনি এটি মাটিতে পড়ে যাওয়ারও অশূন্য একটি সম্ভাবনা আছে, সম্ভাবনা আছে বোর্ডের অন্য যেকোনো জায়গায় লাগারও। ফলকের মতো বড় বস্তুর ক্ষেত্রে চিরায়ত তত্ত্ব (এ ক্ষেত্রে নিউটনের সূত্র) যদি বলে বাণটি ফলকের কেন্দ্রে লাগবে তাহলে আপনি নিশ্চিন্তে ধরে নিতে পারেন, এটি আসলেই লাগবে। কোয়ান্টাম থিওরি অনুসারে এর না লাগার সম্ভাবনা এত ক্ষুদ্র যে আপনি যদি ঠিক একইভাবে কেয়ামত পর্যন্তও বাণ ছুড়তে থাকেন, তবু একটিকেও মিস করে যেতে দেখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু পারমাণবিক জগতের হিসাব ভিন্ন। একটি পরমাণু দ্বারা তৈরি একটি বাণ ফলকের কেন্দ্রে লাগার সম্ভাবনা হয়তো ৯০ শতাংশ, ফলকের অন্য কোথাও লাগার সম্ভাবনা ৫ শতাংশ, আর একেবারে বাইরে দিয়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বাকি ৫ শতাংশ। আপনি আগে থেকে বলতে পারবেন না এর মধ্যে কোনটি ঘটবে। আপনি শুধু বলতে পারেন যে আপনি যদি অনেকবার পরীক্ষা চালান, তাহলে প্রতি একশ বারের মধ্যে গড়ে নব্বই বার বাণ ফলকের কেন্দ্রে লাগবে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিজ্ঞানের জগতে অনুমান করার অক্ষমতার বিষয়টি (unpredictability) প্রবেশ করিয়েছে, যাকে এড়াবার কোনো উপায় নেই । আইনস্টাইন এর বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তোলেন, যদিও তিনি নিজেও এসব ধারণার ভিত্তি তৈরিতে অবদান রাখেন। সত্যি কথা হলো, তাঁর নোবেলও পাওয়া হয়েছে সেই কোয়ান্টাম থিওরির কল্যাণেই। কিন্তু তবু তিনি কখনো মেনে নেননি যে মহাবিশ্ব সম্ভাবনা দিয়ে (অর্থাৎ অনির্ধারিত উপায়ে) চলতে পারে। তাঁর বিখ্যাত বক্তব্য, 'ঈশ্বর পাশা খেলেন না' তাঁর এই মতেরই প্রতিফলন।

www.pathagar.com

কোয়ান্টাম থিওরি আমাদের সামর্থ্যের লাগাম টেনে ধরে। এর অর্থ কি এই যে কোয়ান্টাম থিওরি বিজ্ঞানেরও লাগাম টেনে ধরে? বিজ্ঞানের অর্থ যদি হয় উন্নতি, তাহলে এই উন্নতি কীভাবে হবে তা ঠিক করবে প্রকৃতি। এ ক্ষেত্রে আমরা অনুমান বলতে কী বুঝব তার সংজ্ঞা নতুন করে ঠিক করতে হবে। আমরা হয়ত কোনো পরীক্ষার ফলাফল সঠিকভাবে অনুমান করতে পারব না, কিন্তু পরীক্ষাটি বারবার করে আমরা বলতে পারব যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে এই এই ঘটনার সম্ভাবনা এই এই। তাই অনিশ্চয়তা নীতি থাকলেও প্রকৃতির পরিচালনায় কাজ করা সূত্রগুলোর ওপর আস্থা হারানোর প্রয়োজন নেই। সত্যি বলতে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ বিজ্ঞানী কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে মেনে নিয়েছেন এ জন্যই যে পরীক্ষায় পাওয়া ফলাফল এর অনুমানের সাথে দারুণভাবে মিলে গেছে।

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে কণারা কিছু ক্ষেত্রে তরঙ্গের মতো আচরণ করে। আমরা আগেও দেখেছি, এদের নির্দিষ্ট কোনো অবস্থানে থাকে না, এরা বরং কিছু সম্ভাব্য অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। ওদিকে আলো কিন্তু তরঙ্গ দিয়ে তৈরি। কিন্তু প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলছে, কিছু ক্ষেত্রে আলোও কণার মতো আচরণ করবে। এটি শুধু গুচ্ছ বা কোয়ান্টা আকারে নির্গত বা শোষিত হতে পারে। সত্যি কথা হলো, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পুরোটাই নতুন ধরনের গণিতের ওপর নির্ভরশীল। এটি বাস্তব জগতকে কণা বা তরঙ্গ হিসেবে দেখে না। কিছু সময় কণাদেরকে তরঙ্গ হিসেবে মনে করতে হয়, আবার অন্য কাজের জন্য তরঙ্গকে কণা ধরে নিলে সুবিধা হয়। কিন্তু এভাবে চিন্তা করা হয় শুধু কাজের সুবিধার জন্যই। পদার্থবিদরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কণা ও তরঙ্গের দ্বৈততা (wave- particle duality) বলতেই একেই বোঝেন।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সে তরঙ্গের মতো আচরণের ফলে আমরা দুই ধারার কণার মধ্যে ব্যতিচার[৬] দেখতে পাই। সাধারণত ব্যতিচার হলো তরঙ্গের একটি বৈশিষ্ট্য। তরঙ্গরা একে অপরের সাথে মিলিত হলে এক ধারার চূড়ার সাথে আরেক ধারার খাঁজের দেখা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে এরা থাকে বিপরীত দশায় এবং একে অপরকে বাতিল করে দেয়। কেউ কেউ ভাবতে পারেন দুটো তরঙ্গ মিলিত হলেই এদের শক্তি বেড়ে যাবে। বাস্তবে কিন্তু সব সময় তা হয় না, যেমন এই ক্ষেত্রে হয়নি। আলোর ক্ষেত্রে ব্যতিচারের একটি পরিচিত উদাহরণ হলো সাবানের বুদবুদে দেখা রং।

www.pathagar.com

পানির যে হালকা আবরণ দিয়ে বুদবুদ তৈরি হয়, তার দুই পাশের আলোর প্রতিফলনের ফলে এর সৃষ্টি। সাদা আলোতে প্রতিটি আলাদা তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা রঙের আলোক তরঙ্গ থাকে। কিছু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে সাবানের এক পাশের আবরণ থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ চূড়া আরেক পাশ থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গের খাঁজের সাথে মিলিত হয়। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রংগুলো প্রতিফলিত আলোতে থাকে না, যার কারণে একে দেখতে রঙিন লাগে[৭]।

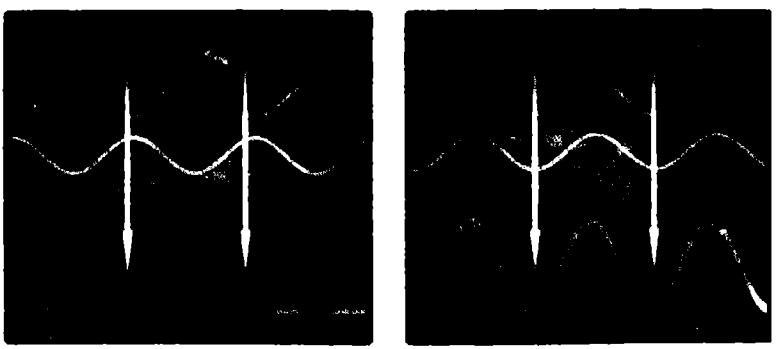

চিত্র : সম ও বিপরীত দশা

[দুটো তরঙ্গের খাঁজ ও চূড়াগুলো যদি একই সাথে চলে তাহলে দুটোর মিলনে আরও শক্তিশালী তরঙ্গ উৎপন্ন হয় (চিত্রের দ্বিতীয় অংশ)। কিন্তু যদি একটার খাঁজ মিশ্রিত হয় অন্যেকটার চূড়ার সাথে, তাহলে তরঙ্গদুটো একে অপরকে নাকচ করে দেয়[৮]।]

কিন্তু কোয়ান্টাম থিওরি বলছে, ব্যতিচার ঘটতে পারে কণার ক্ষেত্রেও। এর জন্য দায়ী কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ডুয়ালিটি বা কণা ও তরঙ্গের দ্বৈত আচরণ। এর একটি বিখ্যাত উদাহরণ হলো দ্বি-চির (চির অর্থ হলো, লম্বা ও খুব সরু ছিদ্র) পরীক্ষা। একটা সরু দেয়ালের কথা কল্পনা করুন, যাতে দুটি সমান্তরাল ও সরু ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রদের ভেতর দিয়ে কণা নিক্ষেপ করলে কী হবে তা দেখার আগে চলুন দেখি আলো ফেললে কী হয়। দেয়ালের এক পাশে একটি নির্দিষ্ট রং এর আলো ফেলুন। আলোর রং নির্দিষ্ট হওয়ায় এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যও নির্দিষ্ট। এখন বেশির ভাগ আলোই দেয়ালে বাধা পাবে। কিন্তু কিছু আলো ছিদ্র ভেদ করে ওপারে চলে যাবে। ধরুন, দেয়ালের ওপারে, আলো থেকে উল্টো দিকে একটি পর্দা রেখে দেওয়া হল। এই পর্দার যেকোনো বিন্দুতে দুই ছিদ্রের আলোই পৌঁছাবে। কিন্তু সে বিন্দুগুলোতে আলো পৌঁছানোর ক্ষেত্রে দুটি আলাদা ছিদ্র দিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়া আলোকে ভিন্ন পরিমাণ দূরত্ব পাড়ি দিতে হবে। অতিক্রান্ত দূরত্ব ভিন্ন হওয়াতে দুই ছিদ্র দিয়ে যাওয়া তরঙ্গ দুটি পর্দায় পৌঁছেও ভিন্ন দশায় থাকবে। কিছু জায়গায় এক তরঙ্গের খাঁজ অপর তরঙ্গের চূড়ার সাথে মিলে যাবে। এ ক্ষেত্রে দুটি তরঙ্গ একে অপরকে বিলীন করে করে দেবে। অন্য জায়গায় দুটি তরঙ্গের চূড়া ও খাঁজরা সমান তালে চলবে (একটির চূড়া অপরটির চূড়া বরাবর থাকবে)। এ কারণে তরঙ্গের শক্তি বেড়ে যাবে। তবে বেশির ভাগ জায়গায়ই এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি ঘটনা ঘটবে। এর ফলে, আলো- আঁধারির কিছু বৈশিষ্ট্যময় নকশা চোখে পড়বে।

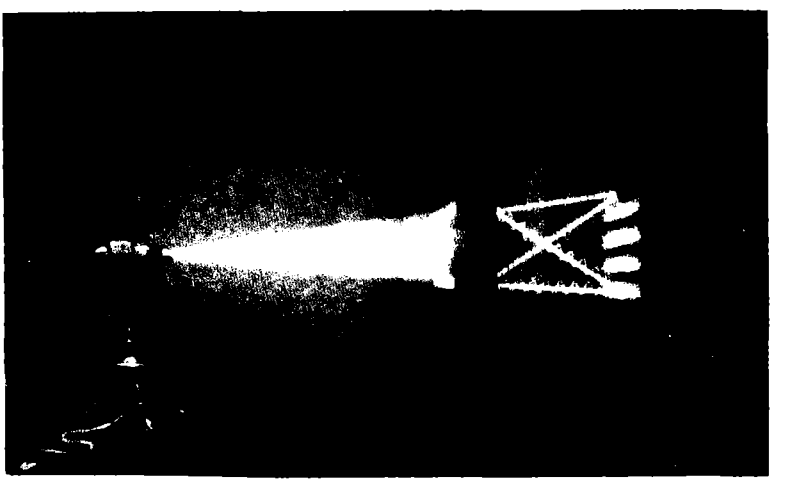

চিত্র : পথের দূরত্ব ও ব্যতিচার

[দ্বি-চির পরীক্ষায় ওপরের ও নিচের ছিদ্র দিয়ে পর্দার বিভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছা তরঙ্গের দূরত্ব ভিন্ন হওয়ায় কোথাও তরঙ্গ একে অপরেকে শক্তিশালী করে, আবার কোথাও একে অপরকে নাকচ করে দেয়। এই ব্যতিচারের ফলে তৈরি হয় একটি নকশা।]

মজার ব্যাপার হলো, আপনি যদি আলোক উৎসের বদলে কণা নিঃসারকও (যেখান থেকে নির্দিষ্ট গতিসম্পন্ন কণা যেমন ইলেকট্রন নির্গত হবে) ব্যবহার করেন, তবুও একই ধরনের নকশা পাওয়া যাবে। (কোয়ান্টাম থিওরি অনুসারে ইলেকট্রনকে যদি নির্দিষ্ট বেগ দেওয়া হয় তবে এর জড় তরঙ্গের নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকবে।) মনে করুন, আপনি একটি চির বন্ধ রেখে দেয়ালের দিকে ইলেকট্রন ছুড়ে দিলেন। বেশির ভাগ ইলেকট্রনকে দেয়াল থামিয়ে দেবে। কিন্তু কিছু ইলেকট্রন চির ভেদ করে ওপাশের পর্দায়

www.pathagar.com

পৌঁছবে। মনে হতে পারে, দেয়ালে দ্বিতীয় আরেকটি চির খুলে দিলে পর্দার প্রতিটি বিন্দুতে আঘাত হানা ইলেকট্রনের সংখ্যা আরও বেশি হবে। কিন্তু আরেকটি চির খুলে দিলে দেখা যায়, কিছু বিন্দুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি, আবার কোনোটায় ইলেকট্রনের সংখ্যা খুব কম। মনে হচ্ছে যেন ইলেকট্রনের মধ্যেও আলোর মতোই ব্যতিচার হচ্ছে, যা তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য-কণার নয়।

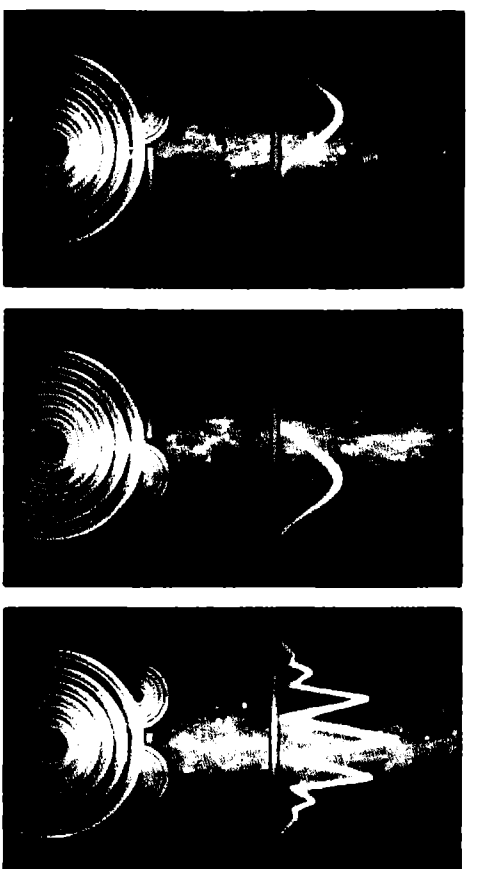

চিত্র : ইলেকট্রনের ব্যতিচার

[দুটি চির দিয়ে ইলেকট্রনের ধারা নিক্ষেপ করা ও প্রত্যেকটি দিয়ে আলাদাভাবে ইলেকট্রন প্রবাহিত করার ফলাফল একই হয় না। এর কারণ এখানেও ব্যতিচার হচ্ছে।]

www.pathagar.com

এবার কল্পনা করুন, চির দুটি দিয়ে একটি করে ইলেক্ট্রন প্রবাহিত করা হলো। এবারেও কি ব্যতিচার ঘটবে? মনে হতে পারে, প্রতিটি ইলেক্ট্রন দুটি চিরের যেকোনো একটি দিয়ে পার হবে। ফলে ব্যতিচার ঘটার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে একটি করে ইলেক্ট্রন পাঠানো হলেও ব্যতিচারের নকশা দেখা যায়। তার মানে প্রতিটি ইলেক্ট্রন একই সাথে দুটো চির দিয়েই যাচ্ছে! ব্যতিচার ঘটাচ্ছে নিজের সাথেই!

কণার এই ব্যতিচার আমাদের পরমাণুর গঠন বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এই পরমাণুই আমরাসহ আমাদের চারপাশের সব কিছুর মূল গাঠনিক উপাদান। বিংশ শতকের শুরুতে মনে করা হতো, পরমাণুতে ঋণাত্মক চার্জধারী কণা ইলেক্ট্রনের ধনাত্মক চার্জধারী নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘোরে, ঠিক যেমনিভাবে গ্রহরা সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। মনে করা হতো, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের আকর্ষণ ইলেক্ট্রনকে কক্ষপথে ধরে রাখে, যেমন করে সূর্য ও গ্রহদের মধ্যে মহাকর্ষীয় টান গ্রহদেরকে কক্ষপথে ধরে রাখে। কিন্তু এই ধারণায় কিছু সমস্যা ছিল। বলবিদ্যা ও তড়িৎ বিজ্ঞানের চিরায়ত সূত্র কোয়ান্টাম মেকানিক্স আসার আগেই বলে দিয়েছিল যে এই প্রক্রিয়ায় ঘুরতে থাকা ইলেক্ট্রন বিকিরণ নির্গত করবে। এর ফলে এরা শক্তি হারাতে থাকবে এবং একসময় পেঁচিয়ে এসে নিউক্লিয়াসে ধাক্কা খাবে। এর ফল দাঁড়াবে, পরমাণু এবং আসলে সকল বস্তুই একসময় গুটিয়ে গিয়ে খুব অল্প জায়গায় অবস্থান নেবে। বাস্তবে কিন্তু এটা ঘটে না।

ড্যানিশ বিজ্ঞানী নিলস বোর ১৯১৩ সালে এর এই সমস্যার কিছু অংশের সমাধান বের করেন। তিনি বললেন, সম্ভবত ইলেক্ট্রনরা নিউক্লিয়াস থেকে যেকোনো দূরত্বে ঘুরতে পারে না, ঘুরতে হয় নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ দূরত্বে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে এই নির্দিষ্ট দূরত্বে শুধু একটি বা দুটি ইলেক্ট্রনই থাকতে পারে, তাহলে গুটিয়ে যাওয়ার সমস্যার সমাধান হয়। কেননা ভেতরের দিকের সীমিত কিছু কক্ষপথ পূর্ণ হয়ে গেলে ইলেক্ট্রনরা আর পেঁচিয়ে ঘুরতে পারবে না। এই মডেলের সাহায্যে সবচেয়ে সরল পরমাণু হাইড্রোজেনের ব্যাখ্যা খুব দারুণভাবে পাওয়া গেল, কারণ এতে নিউক্লিয়াসের চারদিকে একটিমাত্র ইলেক্ট্রন ঘুরছে। কিন্তু এই মডেল দিয়ে কীভাবে আরও জটিল পরমাণুর ব্যাখা দেওয়া যাবে তা বোঝা যাচ্ছিল না। এ ছাড়া সীমিত কিছু অনুমোদিত কক্ষপথের ধারণাকেও যথেষ্ট

www.pathagar.com

মনে হচ্ছিল না। এই কৌশল গাণিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে বেশ মূল্যবান জিনিস, কিন্তু প্রকৃতি কেন এভাবে কাজ করবে তা কারো মাথায় ঢুকছিল না। এর গভীরে আর কী সূত্র থাকতে পারে তাও স্পষ্ট ছিল না।

নতুন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্রের মাধ্যমে সমাধান হাতে এল। বোঝা গেল, নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরতে থাকা ইলেক্ট্রনকে তরঙ্গ ভাবা যেতে পারে। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ভর করে বেগের ওপর। এবার মনে করুন বোরের মত অনুসারে নিউক্লিয়াসের চারদিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে তরঙ্গ ঘুরছে। কিছু কক্ষপথের পরিধির মান হবে ইলেক্ট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পূর্ণ সংখ্যার (ভগ্নাংশ নয়) মানের সমান। এই কক্ষপথগুলোর ক্ষেত্রে তরঙ্গের চূড়া প্রত্যেকবার পাক খেয়ে আগের অবস্থানে আসবে। এর ফলে এই তরঙ্গগুলো শক্তিশালী হবে। এই কক্ষপথগুলোই বোরের অনুমিত অনুমোদিত কক্ষপথ। কিন্তু যেসব কক্ষপথের পরিধি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পূর্ণ সংখ্যা হবে না, তাতে ইলেক্ট্রন একবার পাক খেয়ে এসে তরঙ্গের চূড়া ও খাঁজকে মিলিয়ে দিয়ে তরঙ্গকে নাকচ করে দেবে। এই কক্ষপথগুলো অনুমোদিত হবে না। বোরের সূত্রের অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ কক্ষপথের ব্যাখ্যা এবার পাওয়া গেল।

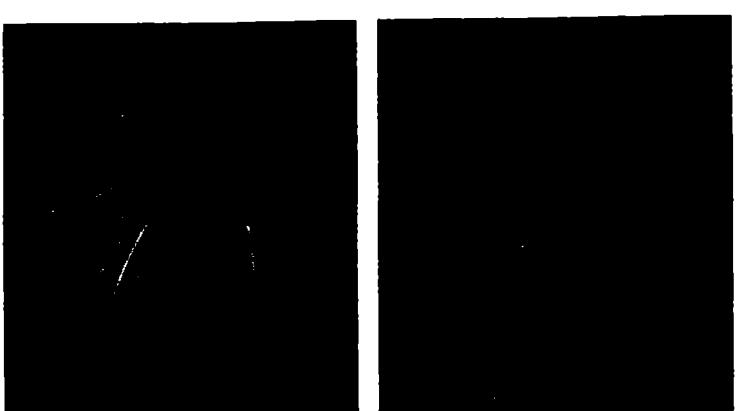

চিত্র : পরমাণুর কক্ষপথের তরঙ্গ

[নিলস বোর কল্পনা করেছিলেন, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারপাশে ইলেক্ট্রনের তরঙ্গ অবিরত ঘুরছে। এই চিত্র অনুসারে, যেসব কক্ষপথের পরিধি ইলেক্ট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পূর্ণ সংখ্যার সমান হবে, শুধু সেই সেই কক্ষপথগুলোই টিকে থাকবে।]

www.pathagar.com

কণা-তরঙ্গের দ্বৈততার চিত্র বোঝার জন্য আমেরিকান বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান একটি সুন্দর কৌশল বের করেন। একে বলা হয় সামষ্টিক ইতিহাস (sum over history)। এই ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, একটি কণার মাত্র একটি ইতিহাস বা গতিপথ থাকে না। একটিমাত্র ইতিহাসের ধারণা ছিল আগের নন-কোয়ান্টাম তত্ত্বে। এখন বলা হচ্ছে, একটি কণা 'ক' বিন্দু থেকে 'খ' বিন্দুতে যাবার জন্য যতগুলো পথ আছে তার সবগুলো ব্যবহার করবে। 'ক' থেকে 'খ' তে যাওয়ার প্রতিটি পথের জন্য ফাইনম্যান সাহেব কিছু সংখ্যা বরাদ্দ করেন। একটি সংখ্যা দ্বারা তরঙ্গের বিস্তার বা আকার বোঝানো হবে। আরেকটি দ্বারা বোঝানো হবে এর দশা বা চক্রে এর অবস্থান (অর্থাৎ, এটি তরঙ্গের খাঁজে, চূড়ায় নাকি এর মধ্যবর্তী অন্য কোথাও আছে)। 'ক' থেকে 'খ' তে যাবার সম্ভাবনা পেতে হলে 'ক' থেকে 'খ' বিন্দুতে যাবার সবগুলো পথের তরঙ্গ যোগ করতে হবে। সাধারণত কাছাকাছি অবস্থিত কিছু পথের তুলনা করলে চক্রের দশা বা অবস্থানের পার্থক্য খুব বেশি দেখা যাবে। এর অর্থ হচ্ছে এই পথগুলোতে অবস্থিত তরঙ্গগুলো একে অপরকে প্রায় পুরোপুরি নাকচ করে দেবে। কিন্তু কাছাকাছিতে অবস্থিত কিছু পথের ক্ষেত্রে দশার পার্থক্য খুব বেশি হবে না। এই পথগুলোর তরঙ্গ টিকে যাবে। এই পথগুলোই হচ্ছে বোরের অনুমোদিত কক্ষপথ।

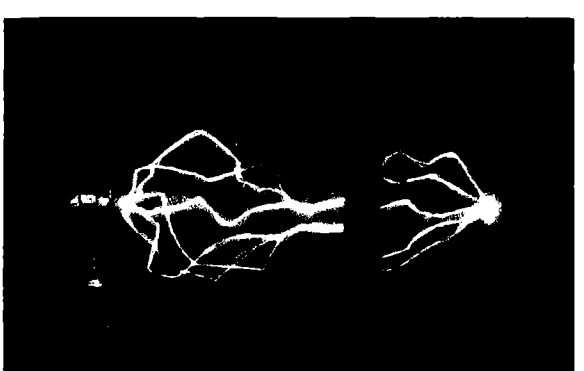

চিত্র : ইলেকট্রনের বহু পথ

[চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, কোয়ান্টাম থিওরির ব্যাখ্যায় রিচার্ড ফাইনম্যানের মত হলো, কোনো কণা উৎস থেকে পর্দায় যেতে সম্ভাব্য প্রতিটি পথ অতিক্রম করে।]

www.pathagar.com

এই ধারণাগুলোকে গণিতের ভাষায় প্রয়োগ করার মাধ্যমে সহজেই জটিল পরমাণুর জন্যও অনুমোদিত কক্ষপথের হিসাব পাওয়া গেল। ব্যাখ্যা পাওয়া গেল অণুরও, যা তৈরি হয় অনেকগুলো পরমাণুর সমন্বয়ে, যেখানে ইলেকট্রনরা একের বেশি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘোরে। রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের একেবারে মৌলিক বিষয় হলো বিভিন্ন অণু ও তাদের মধ্যে বিক্রিয়া। এর ফলে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মাধ্যমে আমরা আমাদের চারপাশের প্রায় সব কিছু অনুমান করতে পারি। অবশ্য তা করতে গিয়ে অনিশ্চয়তা নীতির জন্য কিছু ছাড় তো দিতেই হয়। (বাস্তবে আমরা অবশ্য একটি মাত্র ইলেকট্রনবিশিষ্ট সবচেয়ে সরল পরমাণু হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কোনো পরমাণুর জন্য সমীকরণ সমাধান করতে পারি না। তাই আমরা এ ক্ষেত্রে কাছাকাছি একটা মান ধরে নিই। আরও জটিল অণু ও পরমাণুর জন্য ব্যবহার করি কম্পিউটার।)

কোয়ান্টাম মেকানিক্স দারুণ সফল এক তত্ত্ব। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রায় সব আবিষ্কারের কৃতিত্ব এর। টেলিভিশন ও কম্পিউটারসহ সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রের প্রয়োজনীয় উপাদান হল ট্রান্জিস্টর ও আইসি বা সমন্বিত বর্তনী (integrated circuit)। এই দুটোই মেনে চলে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্র। রসায়ন ও জীববিজ্ঞানেরও ভিত্তি এই কোয়ান্টাম মেকানিক্স। ভৌত বিজ্ঞানের (physical science) যে অংশে এখনো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের হাত পড়েনি তা হল মহাকর্ষ এবং মহাবিশ্বের বড় মাপের (লার্জ স্কেল) কাঠামো। আগে উল্লিখিত আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনিশ্চয়তা নীতি মেনে চলে না। কিন্তু এটিকে অন্যান্য তত্ত্বের সাথে সন্ধি করতে হলে সেটা হওয়া খুব দরকার।

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, আমরা এখনই জানি যে সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বকে সংশোধন করতে হবে। অসীম ঘনত্বের অনুমান করতে গিয়ে চিরায়ত (অর্থাৎ নন-কোয়ান্টাম) সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব নিজেই নিজের দুর্বলতা স্বীকার করছে। ঠিক এভাবেই কৃষ্ণবস্তু অসীম পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করবে বা পরমাণু গুটিয়ে অসীম ঘনত্ব লাভ করবে বলার মাধ্যমে চিরায়ত বলবিদ্যা নিজের দুর্বলতা স্বীকার করেছিল। এই অগ্রহণযোগ্য সিঙ্গুলারিটি (অসীম ঘনত্বের বিন্দু) এড়াতে চিরায়ত সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বকে কোয়ান্টাম থিওরির রূপ দিতে হবে। নতুন থিওরির নাম হবে কোয়ান্টাম থিওরি অব গ্র্যাভিটি বা কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্ব[৯]।

www.pathagar.com

কিন্তু সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব যদি ভুলই হয়, তবে বিভিন্ন পরীক্ষায় এর সত্যতা দেখা যাচ্ছে কেন? আমরা এখনো এই তত্ত্বে কোনো ত্রুটি খুঁজে না পাওয়ার কারণ হলো, আমরা সাধারণত যেসব মহাকর্ষীয়র ক্ষেত্রের দেখা পাই তারা খুব দুর্বল। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, মহাবিশ্বের সকল পদার্থ ও শক্তি আদি অবস্থায় যখন ক্ষুদ্র একটি জায়গায় গুটিয়ে ছিল, তখন এতে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রও ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। এই শক্তিশালী ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি থিওরির প্রভাব হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা এখনো কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্ব হাতে পাইনি। কিন্তু আমাদের মতে এর যে যে বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত তার অনেকগুলোই আমাদের জানা হয়ে গেছে। এর একটি হলো, কোয়ান্টাম থিওরিকে সামষ্টিক ইতিহাসের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হলে ফাইনম্যানের প্রস্তাবনা মেনে চলতে হবে। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এমন, যা যেকোনো চূড়ান্ত তত্ত্বে থাকতে হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এটি হচ্ছে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রকে বক্র স্থান-কালের মাধ্যমে প্রকাশ করা। বক্র স্থানের কোনো কণা নিকটস্থ বিন্দুতে যেতে চায় সরল পথে। কিন্তু মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে স্থান-কাল সমতল না হবার কারণে এই পথকে বাঁকা মনে হয়। ফাইনম্যানের সামষ্টিক ইতিহাসকে আমরা আইনস্টাইনীয় মহাকর্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে কণার ইতিহাসের উদাহরণ এখন পূর্ণাঙ্গ বক্র স্থান-কালের মতো হচ্ছে, যা বলছে পুরো মহাবিশ্বের ইতিহাস।

মহাকর্ষের পুরাতন তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্বের আচরণ মাত্র দু রকম হতে পারে। এক, এটি অনাদি কাল ধরে উপস্থিত ছিল। দুই, একটি সিঙ্গুলারিটি থেকে অতীতের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে এর যাত্রা শুরু। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে মহাবিশ্ব সব সময় উপস্থিত ছিল বলে বিশ্বাস না করার মতো কারণ আমাদের হাতে আছে। কিন্তু তবু এর যদি শুরু থাকেও, তবে প্রচলিত সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব দিয়ে যদি আমরা জানতে চাই যে সমীকরণের কোন সমাধান আমাদের মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে খাটবে, তাহলে আমাদেরকে এর আদি অবস্থা জানতে হবে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের শুরু ঠিক কীভাবে হয়েছিল তা জানা দরকার। ঈশ্বর হয়তো শুরুতে প্রকৃতির নিয়মগুলো জারি করেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এরপর তিনি একে সেই নিয়মের মাধ্যমে বিবর্তিত হতে দিয়েছেন, পরে আর নাক গলাননি। মহাবিশ্বের আদি অবস্থাকে তিনি কোন প্রক্রিয়ায় বাছাই করেছিলেন? সময়ের শুরুতে প্রান্তীয় শর্তগুলো কেমন ছিল? প্রচলিত সার্বিক আপেক্ষিক

www.pathagar.com

তত্ত্বে এটা একটা সমস্যা, কারণ মহাবিশ্বের আদিতে গিয়ে সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব আত্মসমর্পণ করে।

কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্বে কিন্তু আরেকটি সম্ভাবনা আছে। এটা যদি সত্য হয়, তবে এই সমস্যার সমাধান হবে। কোয়ান্টাম থিওরিতে স্থান-কালের সীমানা বা প্রান্ত তৈরি করার মতো কোনো সিঙ্গুলারিটি না থাকলেও তা পরিমাণে নির্দিষ্ট বা সসীম হতে পারে। স্থান-কাল হবে পৃথিবীর পৃষ্ঠের মতো। তবে মাত্রা থাকবে দুটো বেশি। আগেই আমরা বলেছি, আপনি পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে যেকোনো এক দিকে যেতে থাকলে সামনে অভেদ্য কোনো বাধা পাবেন না বা প্রান্তে[১০] গিয়ে পড়েও যাবেন না, শেষ পর্যন্ত যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন সেখানেই ফিরে আসবেন। কোনো সিঙ্গুলারিটিতে গিয়ে পড়তে হবে না। যদি বাস্তবে মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেও এটাই হয়ে থাকে, তবে কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্ব নতুন একটি সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। এতে এমন কোনো সিঙ্গুলারিটি থাকবে না, যেখানে গিয়ে বিজ্ঞানের সূত্রগুলো আত্মসমর্পণ করবে।

যদি স্থান-কালের প্রান্ত বা সীমানাই না থাকে, তাহলে সেই সীমানায় কী হবে তা নিয়েও মাথা ঘামানোর দরকার নেই। মহাবিশ্বের আদি অবস্থা জানারও কোনো দরকার নেই। স্থান-কালের এমন কোনো প্রান্ত থাকবে না, যেখানে ঈশ্বর বা নতুন কোনো সূত্রকে স্থান-কালের প্রান্তীয় শর্ত তৈরি করে দিতে হবে। আমরা বলতে পারি, মহাবিশ্বের প্রান্তীয় শর্ত হচ্ছে, 'এর কোনো প্রান্তই নেই'। মহাবিশ্ব নিজেই নিজেকে ধারণ করবে। বাইরের কোনো কিছু একে প্রভাবিত করবে না। এর সৃষ্টি বা ধ্বংস বলতে কিছু থাকবে না। এর শুধু অস্তিত্বই থাকবে। মহাবিশ্বের শুরু আছে বিশ্বাস করলে স্রষ্টার ভূমিকা পরিষ্কার। কিন্তু মহাবিশ্বের যদি কোনো প্রান্ত বা সীমানা না থাকে, এটি নিজেই নিজেকে ধারণ করে, এর শুরু বা শেষ না থাকে তাহলে ঈশ্বরের ভূমিকা কী হবে, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

অনুবাদকের নোট

১. একটি তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো কম্পন বা পূর্ণ তরঙ্গ উৎপন্ন করে তাকে কম্পাঙ্ক বলে।

২. অর্থাৎ একের পর এক অবিচ্ছিন্নভাবে বা অবিরত সব কম্পাঙ্কের জন্য নির্গত হয় না।

৩. আলোর এই ছড়িয়ে পড়াকে আলোর বিক্ষেপণ (scattering) বলে। সূর্যের আলো আমাদের বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণায় ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়ে বলেই আমরা আকাশ নীল দেখি।

৪. তত্ত্বটির আরও নাম হলো কোয়ান্টাম থিওরি বা কোয়ান্টাম ফিজিক্স। বাংলায় এক কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা বা কণাবাদী বলবিদ্যা ইত্যাদি অনেক কিছু বলা হয়।

৫. যেখানে পরীক্ষা চালানো হয় তাকে সিস্টেম বলা হয়। একই ধরনের সিস্টেম বলতে বোঝায় সিস্টেমের সব শর্ত একই থাকবে।

৬. দুটি তরঙ্গ একটির ওপর দিয়ে আরেকটি যেতে চেষ্টা করলে সেখানে তরঙ্গের উপরিপাতন হয়। ব্যতিচার হলো উপরিপাতন সংক্রান্ত ঘটনা। দুটি তরঙ্গের মধ্যে উপরিপাতনের ফলে একটি বিন্দুতে যদি সমদশা উৎপন্ন হয় তখন সেখানে উজ্জ্বল বিন্দু এবং বিপরীত দশার উপরিপাতন হলে অন্ধকার বিন্দু দেখা যায়। এটিই হলো ব্যতিচার।

৭. যেহেতু সাদা আলো হচ্ছে সব আলোর সমষ্টি, তাই এখান থেকে কয়েকটি রঙের আলো বাদ পড়লে তাকে রঙিন দেখাব।

৮. ফলে আর তরঙ্গের কোনো চিহ্নই থাকে না। যেমন চিত্রের প্রথম অংশের রেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে, এখানে কোনো তরঙ্গ নেই।

৯. কারণ সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের কাজ মহাকর্ষ নিয়ে।

১০. পৃথিবীতে এমন কিছু জায়গা আছে, যেগুলোকে বলা হয় পৃথিবীর প্রান্ত। বাস্তবে এরা পৃথিবীর প্রান্ত নয়। প্রান্ত বলা যেত এমন কোনো বিন্দুকে, যেখানে গেলে আমরা পৃথিবী থেকে নিচে পড়ে যেতাম, আর উঠে আসতে পারতাম না। কিন্তু পৃথিবী গোল হওয়ায় এমন কোনো জায়গা বাস্তবে নেই। ঐ জায়গাগুলোর নাম তাই শুধুই প্রতীকী।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়
ওয়ার্মহোল ও টাইম মেশিন

আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখেছি, ইতিহাসের পরিক্রমায় 'সময়' সম্পর্কে আমাদের ধারণা পাল্টেছে। বিংশ শতকের শুরুতেও মানুষ পরম সময়ের প্রতি বিশ্বাসী ছিল। এর অর্থ হচ্ছে, কোনো ঘটনা কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়েই ঘটতে পারে[১] এবং যেকোনো ভালো ঘড়ি দুটো ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাপ একই দেখাবে। কিন্তু দেখা গেল, দর্শক যেদিকেই যান, আলোর বেগ সব সময় একই থাকে। এর ফলে সময়ের পরম ধারণা ভেঙে গেল। আমরা পেলাম আপেক্ষিক তত্ত্ব। একই ঘটনার সময়ের পরিমাপ বিভিন্ন রকম হতে পারে। প্রত্যেক দর্শক তাঁর নিজের ঘড়িতে অন্যদের থেকে ভিন্ন সময় পাবেন। ফলে সময় একটি একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটি নির্ভর করছে কে মাপছেন তাঁর ওপর। কিন্তু এত কিছুর পরেও সময়কে রেললাইনের পথের মতো সোজা মনে করা হচ্ছিল, যেখানে আপনি শুধু যেকোনো এক দিকেই যেতে পারেন। কিন্তু কেমন হবে যদি রেললাইনের মধ্যে লুপ (চক্র বা ফাঁস) বা শাখা-প্রশাখা থাকে, যাতে চাইলে ট্রেন সামনেও এগিয়ে যেতে পারে আবার চাইলে পেরিয়ে আসা স্টেশনে আবার ফিরেও আসতে পারে। সোজা কথায়, কেউ কি চাইলে ভবিষ্যৎ বা অতীতে যেতে পারে? দি টাইম মেশিন উপন্যাসে এইচ জি ওয়েলস এই সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখেছেন। একই কাজ করা হয়েছে আরও বহু সায়েন্স ফিকশনে। অতীতে দেখা গেছে, সায়েন্স ফিকশনের অনেক কিছুই বাস্তবে সম্ভব হয়েছে, যেমন সাবমেরিন, চন্দ্র ভ্রমণ ইত্যাদি। তাহলে টাইম ট্র্যাভেল বা সময় ভ্রমণের সম্ভাবনা আসলে কেমন?

টাইম ট্র্যাভেল করে ভবিষ্যতে যাওয়া সম্ভব। আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে আমরা এমন একটি টাইম মেশিন বানাতে পারি, যেটা আমাদেরকে ভবিষ্যতে পাঠিয়ে দেবে। টাইম মেশিনে চেপে বসুন, একটু অপেক্ষা করুন, নেমে দেখবেন পৃথিবীতে আপনার নিজের চেয়ে অনেক বেশি সময় পার হয়েছে।

www.pathagar.com

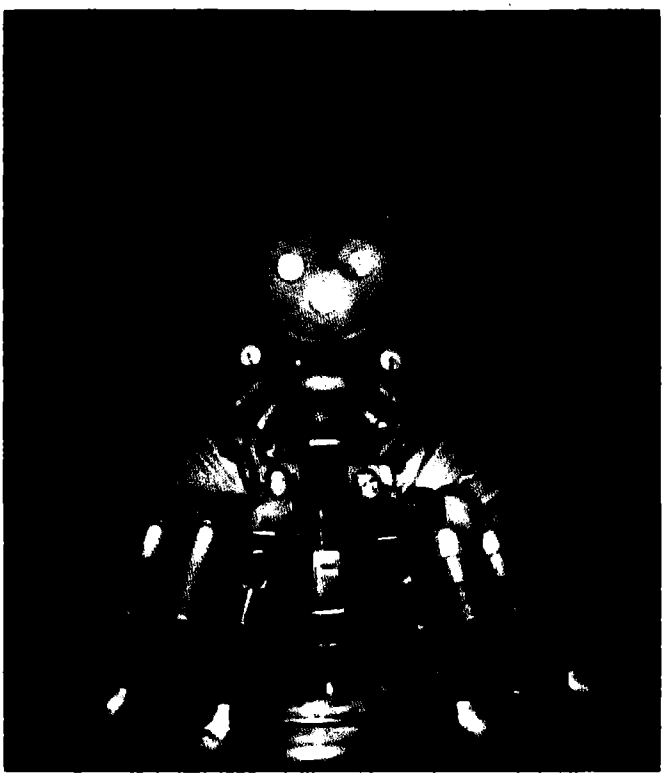

চিত্র : টাইম মেশিন

[টাইম মেশিনে বসে আছেন দুই লেখক]

এই মেশিন বানানোর মতো প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এখনো আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু আমরা জানি এটা বানানো সম্ভব, কী কৌশল প্রয়োগ করতে হবে তাও জানা। আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত টুইন প্যারাডক্সের সুবিধা নিয়ে এমন একটি মেশিন বানানো যেতে পারে। কৌশল হলো, আপনি রকেটে করে উড়াল দেবেন। এটি গতি বৃদ্ধি করে আলোর বেগের কাছাকাছি পৌঁছবে। কিছুক্ষণ এভাবে ভ্রমণ করে ফিরে আসুন (কত সময় এভাবে চলবেন তা নির্ভর করে আপনি কতটুকু ভবিষ্যতে যেতে চান তার ওপর।) আপনি নিশ্চয়ই এতে অবাক হবেন না যে আপনার টাইম মেশিন একই সাথে একটি মহাকাশযানও[২]। পুরো সময়টা আপনি এই টাইম মেশিনের ভেতরেই থাকবেন। বের হয়ে আপনি দেখবেন আপনার নিজের

www.pathagar.com

চেয়ে পৃথিবীতে বেশি সময় পার হয়ে গেছে। আপনি চলে এসেছেন ভবিষ্যতে। কিন্তু আমরা কি পেছনে যেতে পারব? অর্থাৎ, আমরা কি অতীতে যাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করতে পারব?

পদার্থবিদ্যার সূত্র ব্যবহার করে অতীতে ভ্রমণ করার সম্ভাবনা সবার আগে খুঁজে পান কার্ট গোদেল। তিনি ১৯৪৯ সালে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের সমীকরণের একটি নতুন সমাধান বের করেন। এ থেকে দেখা গেল যে নতুন ধরনের একটি স্থান-কাল পাওয়া যাচ্ছে। আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে অনেকগুলো গাণিতিক মডেল বের করা যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এর সবগুলো সমাধানই আমাদের মহাবিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। যেমন, এদের প্রারম্ভিক অথবা প্রান্তীয় শর্তগুলো ভিন্ন হয়। এই মডেলগুলো যা বলছে তা বাস্তব পর্যবেক্ষণের সাথে মিলিয়ে নিয়ে আমরা বুঝতে পারব যে এগুলো আমাদের মহাবিশ্বের জন্য চলবে কি না।

গোদেল ছিলেন একজন গণিতবিদ। একটি গাণিতিক প্রমাণের জন্য তিনি খুব বিখ্যাত। তিনি প্রমাণ করেন যে সব সঠিক বক্তব্য প্রমাণ করা সম্ভব নয় (অর্থাৎ, কিছু কথা এমন থাকবে যা সঠিক, কিন্তু তা প্রমাণ করা যাবে না)। এমনকি আপনি যদি সব সঠিক বক্তব্যের মধ্যে কাটছাঁট করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়, যেমন পাটিগণিতের সবগুলো টপিকও প্রমাণ করতে চান, তবুও তা সম্ভব হবে না। অনিশ্চয়তা নীতির মতোই হয়তো গোদেলের এই ইনকমপ্লিটনেস থিওরিম বা অপূর্ণাঙ্গতার উপপাদ্য (incompleteness theorem) মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অর্জন ও পূর্বাভাস তৈরিতে বিধি-নিষেধ আরোপ করছে। আইনস্টাইন ও গোদেল দুজনেরই জীবনের শেষের মুহূর্তগুলোতে গবেষণার স্থান ছিল প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডি। এ সময় গোদেল সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারেন। গোদেলের প্রস্তাবিত স্থান-কালের মজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি বলছে যে পুরো মহাবিশ্বই আবর্তিত হচ্ছে বা ঘুরছে।

পুরো মহাবিশ্বই আবর্তিত হচ্ছে–এই কথার মানে কী? আবর্তিত হবার মানে হলো, কোনো স্থির প্রসঙ্গ বিন্দুর উপস্থিতি যাকে কেন্দ্র করে বস্তুটি ঘুরবে। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, 'কিসের সাপেক্ষে ঘুরছে?' উত্তরটা হবে একটু গুরুগম্ভীর। মূলত ছোট্ট লাটিম বা জাইরোস্কোপের মুখ যেদিকে থাকে, দূরের বস্তুগুলো মহাবিশ্বের মধ্যে সেদিকে মুখ করে ঘুরবে। গোদেলের স্থান-কালে গাণিতিকভাবে এতে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে।

www.pathagar.com

আপনি যদি পৃথিবী থেকে অনেক দূর ভ্রমণ করে আবার ফিরে আসেন, তবে সম্ভাবনা আছে যে আপনি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন রওনা দেবার আগের কোনো সময়ে!

নিজের সমীকরণ থেকে এই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে বলে আইনস্টাইন খুব হতাশ হয়েছিলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন, সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব কখনো টাইম ট্র্যাভেল বা সময় ভ্রমণের সুযোগ রাখবে না। কিন্তু যদিও গোদেলের সমাধান আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকেই এসেছে, তবু এটি আসলে আমাদের মহাবিশ্বের জন্য খাটবে না। কারণ হলো, পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা জানি যে আমাদের মহাবিশ্ব ঘুরছে না (আবর্তন করছে না), বা করলেও তা খুব নগণ্য। অন্যদিকে আমাদের মহাবিশ্বের মতো গোদেলের মহাবিশ্ব সম্প্রসারিতও হচ্ছে না। কিন্তু তারপর আইনস্টাইনের সমীকরণের পেছনে লেগে থাকা বিজ্ঞানীরা দেখলেন, সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব দ্বারা অনুমোদিত অন্য স্থান-কাল দিয়ে ঠিকই সময় ভ্রমণ করে অতীতে যাবার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু আবার মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ এবং হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মতো মৌলের আধিক্য প্রমাণ করছে যে সময় ভ্রমণের পরিবেশ তৈরির হওয়ার মতো মহাবিশ্বের শুরুতে যে বক্রতা প্রয়োজন, তা ছিল না। প্রান্তহীনতার প্রস্তাবনাও (আগে উল্লিখিত) যদি সঠিক হয়, তাহলে তাত্ত্বিকভাবেও একই ফলাফল আসবে। অতএব প্রশ্ন হচ্ছে : সময় ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ নিয়ে যদি মহাবিশ্বের যাত্রা না হয়ে থাকে, তাহলে কি পরে আমরা স্থানীয় কোনো অঞ্চলের স্থান-কালকে বাঁকিয়ে তার সুযোগ তৈরি করতে পারব?

আবার যেহেতু স্থান ও কাল একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, তাই শুনতে হয়তো অবাক লাগবে না যে অতীতে ভ্রমণের সমস্যা ও আলোর চেয়ে বেশি গতিতে যাওয়া যাবে কি না তা আসলে একই সমস্যা । সময় ভ্রমণের সাথে আলোর চেয়ে বেশি বেগে যাওয়ার ব্যাপারটি যে একই সূত্র গাঁথা তা বোঝা সহজ : আপনি যদি সময় ভ্রমণ করে অতীতেই চলে যান, তাহলে আপনি আপনার সম্পূর্ণ ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়টুকুকে ইচ্ছেমতো কমিয়ে আনতে পারবেন। এর অর্থ হবে আপনি ভ্রমণ করবেন অসীম গতিতে[৬]। কিন্তু আমরা দেখব, উল্টোটাও কাজ করে। আপনি যদি অসীম গতিতে ভ্রমণ করতে পারেন, তাহলেও আপনি অতীতে যেতে পারবেন। একটি ছাড়া অপরটি সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

সায়েন্স ফিকশন লেখকরা আলোর চেয়ে বেশি গতির বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি ভাবেন। সমস্যা হলো, আপেক্ষিক তত্ত্ব বলছে যে আমরা যদি প্রায় চার আলোকবর্ষ দূরের আমাদের নিকটতম (সূর্যের পরে) নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টোরিতে একটি মহাকাশযান পাঠাই, তাহলে এর অভিযাত্রীরা তাদের প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে ফিরে আসতে অন্তত আট বছর পার করবে। আর যদি গন্তব্য হয় আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্র, তাহলে এর ফিরে আসতে সময় লাগবে অন্তত ১ লক্ষ বছর। গ্যালাক্সিব্যাপী যুদ্ধের কাহিনি লেখার জন্য বিষয়টা মোটেই সুখকর নয়। কিন্তু এখানেও আপেক্ষিক তত্ত্বের কাছে আরেকটি উপায় আছে। এর সাথেও সম্পর্ক রয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত টুইন প্যারাডক্সের। পৃথিবীবাসীদের তুলনায় মহাকাশ অভিযাত্রীদের সময় অনেক কম অতিবাহিত হবে বলে মনে হওয়া সম্ভব। কিন্তু মহাকাশযাত্রা থেকে ফিরে এসে আনন্দের খুব বেশি উপলক্ষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ দেখা যাবে পৃথিবীতে আগে যারা ছিল তাদের কেউ বেঁচে নেই, মরে গেছে হাজার হাজার বছর আগেই। এ কারণে পাঠকদের আগ্রহ তৈরি করতে সায়েন্স ফিকশন লেখকদেরকে ধরে নিতে হয়েছে যেকোনো একসময় আমরা আলোর চেয়ে দ্রুত চলার উপায় আবিষ্কার করব। এই লেখকদের অধিকাংশই বুঝতে অক্ষম যে আপনি যদি আলোর চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারেন, তাহলে আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে আপনি অতীতেও যেতে পারবেন।

ইংরেজিতে এ রকমই একটি পঞ্চপদী ছড়া আছে, যার বাংলা হয় এ রকম :

বলব এক বুদ্ধিমতী তরুণীর গল্প
আলোর বেগও যার কাছে ছিল স্বল্প
আপেক্ষিক বেগ নিয়ে,
একদিন গেলেন হারিয়ে,
আর ফিরে এলেন তার আগের রাতে

এই ছড়ার সূত্রও আপেক্ষিক তত্ত্বের সাথেই গাঁথা। এটি বলছে যে কোনো ঘটনার সময়ের পরিমাণ যেমন সবার কাছে একই নাও হতে পারে, তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘটনার ক্রমও দর্শকদের কাছে ভিন্ন হতে পারে। যেমন, যদি দুটো ঘটনা 'ক' ও 'খ' যদি এতটা দূরে ঘটে যে একটি রকেটকে 'ক' থেকে 'খ' তে যেতে হলে আলোর চেয়ে জোরে ছুটতে হবে, তাহলে ভিন্ন

www.pathagar.com

গতিতে ছোটা দুজন দর্শকের একজন বলবেন 'ক' আগে ঘটেছে, আরেকজন বলবেন, না, 'খ' আগে ঘটেছে। মনে করুন যে 'ক' ঘটনাটি হলো ২০১২ অলিম্পিক গেমসের ফাইনালের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা। আর 'খ' ঘটনাটি হলো প্রক্সিমা সেন্টোরির সংসদের ১০০,০০৪তম মিটিং। মনে করুন, পৃথিবীতে থাকা কোনো দর্শকের কাছে মনে হবে 'ক' আগে ঘটেছে, তার পরে ঘটেছে 'খ'। আরো মনে করুন, পৃথিবীর সময় অনুসারে 'খ' ঘটেছে এর এক বছর পরে, ২০১৩ সালে। যেহেতু পৃথিবী ও প্রক্সিমা সেন্টোরি প্রায় চার আলোকবর্ষ দূরত্বে আছে, এই দুটো ঘটনা আগের শর্ত পূরণ করবে। 'ক' ঘটনাটি 'খ' এর আগে ঘটলেও 'ক' থেকে 'খ' তে যেতে আপনাকে আলোর চেয়ে জোরে ছুটতে হবে। এর ফলে পৃথিবী থেকে বিপরীত দিকে যেতে থাকা প্রক্সিমা সেন্টোরির একজন দর্শকের কাছে ঘটনার ক্রম উল্টো মনে হবে। তিনি দেখবেন, 'খ' ঘটনাটি 'ক'-এর আগে ঘটেছে। এই দর্শক বলবেন, আপনি আলোর চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারলে 'খ' ঘটনা থেকে 'ক' তে আসতে পারবেন। আসলে আপনি যদি সত্যিই খুব দ্রুত চলতে পারেন তাহলে পৃথিবীতে দৌড় প্রতিযোগিতা শেষ হবার আগেই প্রক্সিমা সেন্টোরি গিয়ে খেলা নিয়ে বাজি ধরতে পারেন। আপনি জিতবেনই কারণ আপনি তো খেলার ফলাফল জেনেই এসেছেন!

আলোর গতিকে হারাতে গেলে কিন্তু ভীষণ মুশকিলে পড়তে হয়। আপেক্ষিক তত্ত্ব বলছে যে কোনো রকেটের গতি আলোর গতির কাছাকাছি পর্যন্ত নিয়ে যেতে হলে রকেটের ক্ষমতা ক্রমেই বাড়াতে হয়। আমাদের কাছে এর পরীক্ষিত প্রমাণ আছে। তা অবশ্য রকেট দিয়ে করা নয়, করা হয়েছে ফার্মিল্যাব বা সার্নের (ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ বা সংক্ষেপে CERN) কণা ত্বরকযন্ত্রে মৌলিক কণিকা ব্যবহার করে। কোনো কণিকার বেগ আলোর বেগের ৯৯.৯৯ শতাংশ পর্যন্ত করা সম্ভব। কিন্তু যত বেশিই জ্বালানি ব্যবহার করা হোক না কেন, আলোর বেগকে কোনোক্রমেই অতিক্রম করানো যায় না। একই কথা খাটবে মহাকাশযানের ক্ষেত্রেও। রকেটের ক্ষমতা যতই হোক, এর গতি বাড়িয়ে আলোর গতির ওপরে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অথচ সময় ভ্রমণ সম্ভব হবে যদি আলোর চেয়ে বেশি গতি পাওয়া যায়। ফলে, দেখা যাচ্ছে দ্রুতগতির মহাকাশ ভ্রমণ ও অতীতে ভ্রমণ–দুটোই ভেস্তে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

কিন্তু উপায় আছে আরেকটি। আপনি হয়তো স্থান-কালকে বাঁকিয়ে 'ক' ও 'খ' ঘটনার মধ্যে কোনো শর্টকাট পথ বানিয়ে ফেলতে পারেন। এর একটি উপায় হবে 'ক' ও 'খ'-এর মাঝখানে ওয়ার্মহোল তৈরি। নাম থেকেও বোঝা যাচ্ছে, ওয়ার্মহোল হচ্ছে অনেক দূরের প্রায় সমতল দুটো অঞ্চলের মাঝে স্থান-কালের একটি সরু সুড়ঙ্গ। এটা অনেকটা এ রকম যেন আপনি কোনো উঁচু পাহাড়-শ্রেণির এক পাশের পাদবিন্দুতে আছেন। স্বাভাবিক উপায়ে অন্য পাশে যেতে হলে আপনাকে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে অপর পাশ দিয়ে নামতে হবে। কিন্তু যদি পাহাড়ের এপাশ থেকে ওপাশে একটি বিশাল ওয়ার্মহোল থাকে তাহলে আর তা করতে হবে না। আমাদের সৌরজগতের কাছ থেকে প্রক্সিমা সেন্টোরি পর্যন্তও একটি ওয়ার্মহোল তৈরি করা বা খুঁজে বের করার কথা কল্পনা করা যেতে পারে। ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল হতে পারে, যদিও সাধারণ হিসেবে পৃথিবী ও প্রক্সিমা সেন্টোরি ২০ লক্ষ কোটি দূরত্বে অবস্থিত। আমরা ১০০ মিটার দৌড়ের খবরটি ওয়ার্মহোল দিয়ে পাঠাতে পারলে ওদের কংগ্রেসের মিটিং হবার বেশ আগেই এটি ওখানে পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে পৃথিবীর দিকে আসা একজন দর্শকও সেই ওয়ার্মহোল দিয়ে প্রক্সিমার সেন্টোরির মিটিং থেকে অলিম্পিক রেসের আগে আগে পৌঁছে যেতে পারবেন। ফলে আলোর চেয়ে বেশি গতির মাধ্যমে অর্জিত সময় ভ্রমণের মতোই ওয়ার্মহোলও অতীতে যাবার সুযোগ করে দিচ্ছে।

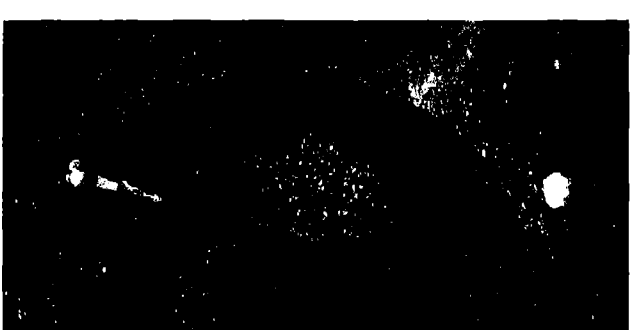

চিত্র : ওয়ার্মহোল

[ওয়ার্মহোল যদি থাকে তবে তা দুটো দূরবর্তী স্থানের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত পথ তৈরি করবে।]

www.pathagar.com

স্থান-কালের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ওয়ার্মহোল থাকার ভাবনাটি সায়েন্স ফিকশন লেখকদের মাথা থেকে আসেনি, এসেছে খুব উঁচু জায়গা থেকে। ১৯৩৫ সালে আইনস্টাইন ও ন্যাথান রোজেন একখানা গবেষণাপত্র লেখেন। এতে তাঁরা দেখালেন যে সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের সমাধান থেকে ওয়ার্মহোল পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা অবশ্য এটাকে ওয়ার্মহোল না বলে ব্রিজ বা সেতু বলেছিলেন। জিনিসটি আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ নামে খ্যাতি লাভ করে। কিন্তু এর ভেতর দিয়ে একটি মহাকাশযানকে পেরিয়ে যেতে হলে যেটুকু সময় দরকার এটি তত বেশি সময় পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। ওয়ার্মহোলটি গুটিয়ে যেতে যেতে মহাকাশযানের স্থান হবে সিঙ্গুলারিটিতে। কিন্তু ধারণা করা হয়, কোনো উন্নত সভ্যতার প্রাণীরা হয়তো একটি ওয়ার্মহোলকে সময় ভ্রমণ করার মতো যথেষ্ট সময় পর্যন্ত খোলা রাখার ব্যবস্থা করতে পারে। এটা করতে হলে, অর্থাৎ, সময় ভ্রমণের জন্যে স্থান-কালকে বাঁকাতে হলে দেখা যায়, প্রয়োজন হয় নেগেটিভে কার্ভেচার বা ঋণাত্মক বক্রতার। ঋণাত্মক বক্রতা দেখতে ঘোড়ার জিনের পৃষ্ঠের মতো। সাধারণ বস্তুতে শক্তির ঘনত্ব ধনাত্মক হওয়ায় এর স্থান-কালের মধ্যে পাওয়া যায় ধনাত্মক বক্রতা। যেমন, কোনো গোলকের পৃষ্ঠ। অতএব, স্থান-কালকে বাঁকিয়ে অতীতে যেতে হলে প্রয়োজন এমন পদার্থ, যার শক্তির ঘনত্ব ঋণাত্মক।

চিত্র : বিভিন্ন রকম বক্রতা

শক্তির ঘনত্ব ঋণাত্মক হবার মানে কী? শক্তি হচ্ছে টাকার মতো। আপনার কাছে যদি পজিটিভ ব্যালেন্স থাকে, তাহলে আপনি তা অনেকভাবে ব্যয় করতে পারেন। কিন্তু এক শ বছর আগের পুরাতন সূত্র অনুসারে, আপনার ব্যালেন্সের চেয়ে বেশি টাকা আপনি উঠাতে পারবেন না। এভাবে এই পুরাতন সূত্রগুলো শক্তির ঘনত্ব ঋণাত্মক হওয়া মেনে না নিয়ে অতীতে

www.pathagar.com

ভ্রমণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়। কিন্তু আগের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে যে পুরাতন সূত্রগুলো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের হাতে রাজত্ব ছেড়ে দিয়েছে, যার ভিত্তি হলো অনিশ্চয়তা নীতি। কোয়ান্টাম সূত্রগুলো খুব উদার। এই সূত্রগুলো আপনাকে দু-একটি অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যালেন্সের চেয়ে কিছু বেশি টাকা উঠাতেও বাধা দেয় না, অবশ্য যদি মোট ব্যালেন্স পজিটিভ থাকে। অন্য কথায়, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্রের মাধ্যমে কোনো কোনো জায়গায় শক্তির ঘনত্ব ঋণাত্মক হতে পারে, যদি অন্য কোনো জায়গার শক্তির ধনাত্মক ঘনত্ব তা পূরণ করে দেয়, যাতে শক্তির মোট পরিমাণ ধনাত্মকই থাকে। অতএব, স্থান-কালকে বাঁকানো যাবে বলে যেমন আমরা বিশ্বাস করি, তেমনি একে বাঁকিয়ে সময় ভ্রমণ করা যাবে বলেও বিশ্বাস করার মতো কারণ রয়েছে।

ফাইনম্যানের সামষ্টিক ইতিহাস অনুসারে একটি নির্দিষ্ট কণিকার দৈর্ঘ্যের স্কেলে সময় ভ্রমণ হচ্ছে। ফাইনম্যানের কৌশল অনুসারে, একটি সাধারণ কণিকার ক্ষেত্রে সময় বেয়ে সামনে যাওয়া আর একটি প্রতিকণিকার (যার চার্জ কণিকার বিপরীত, বাকি সব একই) ক্ষেত্রে পেছনে যাওয়া একই কথা। তাঁর দেখানো গাণিতিক হিসাব অনুসারে, আপনি এক জোড়া কণিকা ও প্রতিকণিকার একই সাথে সৃষ্টি ও পরে ধ্বংস হবার ঘটনাকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করতে পারেন। এটি হলো, কণিকা আসলে মাত্র একটিই, যা স্থান-কালের আবদ্ধ চক্র বেয়ে চলছে। এই চিত্র বুঝতে হলে প্রথমে গতানুগতিক উপায়ে ভাবুন। কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে, ধরুন 'ক' সময়ে একটি কণিকা ও প্রতিকণিকা তৈরি হলো। দুটিই সময় বেয়ে সামনে যাচ্ছে। এর পরে অন্য কোনো সময় 'খ' তে পৌঁছে দুটো কণিকার দেখা হলো, আর সাথে সাথে দুটোই ধ্বংস। 'ক'-এর আগে এবং 'খ'-এর পরে এদের কোনোটিই ছিল না। ফাইনম্যান বলছেন, এই ঘটনাকে আরেকভাবে দেখার সুযোগ আছে। 'ক' সময়ে একটি মাত্র কণিকাই সৃষ্টি হয়েছে। এটি সময় বেয়ে চলতে চলতে 'খ' তে পৌঁছে আবার 'ক' সময়ে ফিরে এল। একটি কণিকা ও একটি প্রতিকণিকা একই সাথে সময় বেয়ে সামনে যায়নি, বরং একটি মাত্র কণিকাই চক্রাকারে 'ক' থেকে 'খ' তে এবং উল্টো পথে চলাচল করেছে। বস্তুটি যখন সময় বেয়ে সামনে যাচ্ছে ('ক' থেকে 'খ'), তখন একে আমরা কণিকা বলছি। আর এটি যখন পেছনে চলছে ('খ' থেকে 'ক'), তখন একে দেখে মনে হচ্ছে একটি প্রতিকণিকা সময় বেয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

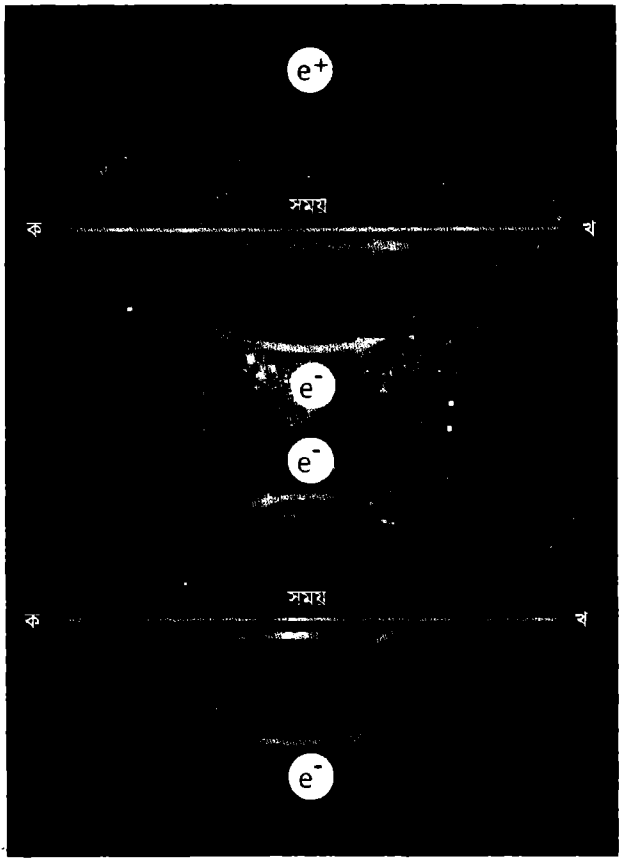

চিত্র : ফাইনম্যানের দৃষ্টিতে প্রতিকণিকার ব্যাখ্যা

[প্রতিকণিকাও আসলে এমন একটি কণিকা, যা সময় বেয়ে পেছনে চলে। ফলে ভার্চুয়াল কণিকা ও প্রতিকণিকার একটি জোড়াকে স্থান-কালের আবদ্ধ চক্রে একই কণিকার গতি মনে করা যায়।]

এই ধরনের সময় ভ্রমণের প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। যেমন ধরুন, কণিকা বা প্রতিকণিকার কোনো একটি (ধরুন প্রতিকণিকা) ব্ল্যাকহোলে পড়ে গেল। এর ফলে আরেকটি গেল একা হয়ে, এটি ধ্বংস হবার মতো কোনো সঙ্গীকে খুঁজে পাচ্ছে না। হতভাগা কণাটিও ব্ল্যাকহোলে পড়ে যেতে পারে, আবার ব্ল্যাকহোলের খুব কাছ থেকে পালিয়েও[৪] আসতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে দূর থেকে মনে হবে

www.pathagar.com

কণিকাটি ব্ল্যাকহোল থেকে বের হয়ে এসেছে। ব্ল্যাকহোল থেকে আসা বিকিরণকে আপনি আরেকটি ভিন্ন কিন্তু সমতুল্য উপায়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন। দুই কণিকার মধ্যে যেটি ব্ল্যাকহোলে পড়ে গেছে (আমরা ধরে নিয়েছি, প্রতিকণিকা) তাকে আমরা ব্ল্যাকহোল থেকে সময় বেয়ে পেছনে চলা একটি কণিকা বলতে পারি। এটি যখন সেই জায়গায় পৌঁছে, যেখানে কণিকা বা প্রতিকণিকা একই সাথে উৎপন্ন হয়েছিল, তখন এটি ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়ে সময় বেয়ে সামনে চলতে থাকে এবং ব্ল্যাকহোল থেকে পালিয়ে আসে। অথবা যদি দুটোর মধ্যে কণিকাটি ব্ল্যাকহোলে পতিত হয় তাহলে আপনি একে এমন একটি প্রতিকণিকা বলতে পারেন, যা ব্ল্যাকহোল থেকে বেরিয়ে সময় বেয়ে পেছনে চলছে। তাই ব্ল্যাকহোলের বিকিরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, আণুবীক্ষণিক জগতে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অতীতে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে।

অতএব, আমরা প্রশ্ন করতেই পারি যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব কি এই অনুমতি দেয় যে ভবিষ্যতের উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা শেষ পর্যন্ত একটি টাইম মেশিন বানাতে পারব? প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, হ্যাঁ, দেওয়া উচিত। ফাইনম্যানের সামষ্টিক ইতিহাসকে সামগ্রিক বা সম্পূর্ণ ইতিহাস ধরা হয়। অতএব, এতে সেই ইতিহাসও থাকবে, যাতে স্থান-কাল এত বেশি বক্র যে অতীতে চলে যাওয়া সম্ভব। যদিও পদার্থবিদ্যার পরিচিত কোনো সূত্র সময় ভ্রমণকে উড়িয়ে দিচ্ছে না, তবু এমন কিছু বিষয় আছে, যা একে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়।

একটি প্রশ্ন এ রকম : যদি অতীত ভ্রমণ সম্ভবই হয় তাহলে কেউ ভবিষ্যত থেকে ফিরে আসেনি কেন? কেন ফিরে এসে আমাদেরকে বলেনি কীভাবে এ কাজ করা হলো? আমাদের মতো কম উন্নত জাতির কাছে সময় ভ্রমণের গোপন রহস্য ফাঁস করা কেন বোকামি হবে তার অনেকগুলো ভালো কারণ থাকতে পারে। কিন্তু মানুষের স্বভাব যদি ভবিষ্যতেও না পাল্টায়, তাহলে বিশ্বাস করা কঠিন যে ভবিষ্যতের কোনো আগন্তুক এই তথ্য ফাঁস করে দেবে না। কেউ কেউ অবশ্যই বলবেন যে বিভিন্ন সময় দেখা যাওয়া ইউএফও (Unidentified Flying Object বা অচেনা উড়ন্ত বস্তু) এলিয়েন বা ভবিষ্যতের আগন্তুকদের প্রমাণ বহন করে। (যদি এলিয়েনরা উপযুক্ত সময়ে এখানে আসতেও চায়, তবু নক্ষত্রদের মধ্যে যে বিশাল দূরত্ব তাতে তাদেরকে আলোর চেয়ে জোরে ছুটতে হবে। ফলে

www.pathagar.com

দুটো সম্ভাবনা সম্ভবত একই হয়ে যাচ্ছে) ভবিষ্যতের কোনো আগন্তুক দেখা না যাওয়ার আরেকটি কারণ সম্ভবত অতীত নির্দিষ্ট, কারণ আমরা এটি দেখে ফেলেছি এবং এও দেখেছি যে এতে ভবিষ্যৎ থেকে ফিরে আসার মতো প্রয়োজনীয় বক্রতা নেই। অন্যদিকে ভবিষ্যৎ হচ্ছে অজানা এবং উন্মুক্ত। ফলে তাতে হয়তো প্রয়োজনীয় বক্রতা থাকতে পারে। এর অর্থ হবে হয়তো যেকোনো টাইম ট্র্যাভেল শুধু ভবিষ্যতের দিকেই হতে পারে। স্টার ট্রেক মুভি সিরিজের ক্যাপ্টেন কার্ক ও স্টারশিপ এন্টারপ্রাইজের বর্তমানে উপস্থিত থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।

আমরা ভবিষ্যতের কোনো আগন্তুককে কেন দেখিনি এটা তার ব্যখ্যা হতে পারে। কিন্তু আরেকটি সমস্যা থেকেই যাবে। আমরা কি অতীতে গিয়ে ইতিহাস বদালতে পারব? ইতিহাস কিন্তু এখানে সমস্যা করবে। মনে করুন কেউ অতীতে গিয়ে নাৎসি সরকারকে পরমাণু বোমার কৌশল বলে দিল, অথবা ধরুন কেউ ফিরে গিয়ে দাদার দাদার দাদাকে মেরে ফেলল, মৃত্যুর আগে বেচারা দাদা কোনো সন্তানের বাবা হবারও সুযোগ পাননি। এই প্যারাডক্সকে[৫] (পরস্পরবিরোধী ঘটনা) অনেকভাবেই বলা যায়। কিন্তু সবগুলো আসলে একই অর্থ বহন করে। আমরা যদি অতীতকে বদলাবার ক্ষমতা পাই, তাহলে বৈপরীত্যে জড়িয়ে পড়ব।

সময় ভ্রমণের প্যারাডক্সের দুটো সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে। প্রথমটিকে বলা যায় ধারাবাহিক ইতিহাস (consistent history) পদ্ধতি। এটি বলছে যে স্থান-কালের বক্রতা অতীতে যাবার সুযোগ করে দিলেও সেখানে গিয়ে যা ঘটবে তা হবে পদার্থবিদ্যার সূত্র মেনেই। এই মত অনুসারে, আপনি শুধু তখনই অতীতে যেতে পারবেন, যখন ইতিহাস থেকে দেখা যাবে যে আপনি অতীতে গিয়েছিলেন এবং আপনার দাদার দাদার দাদাকে খুন করেননি বা এমন কিছু করেননি, যাতে আপনার বর্তমান ইতিহাস সৃষ্টিতে বাধা পড়ে। এ ছাড়া আপনি অতীতে গেলেও এর আগের ইতিহাস বদলাতে পারবেন না, শুধু পর্যবেক্ষণই করে যেতে পারবেন। এই মত অনুসারে, অতীত নির্দিষ্ট। আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন না।

আপনি অবশ্য বলতে পারেন, স্বাধীন ইচ্ছা আসলে একটি ভ্রম। যদি পদার্থবিদ্যার আসলেই কোনো পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব থাকে, তাহলে সেটি আমাদের কাজকর্মও নির্ধারণ করবে। কিন্তু সূত্রটি আমাদের মতো জটিল প্রাণীদের ক্ষেত্রে এত জটিলভাবে কাজ করে যে তা হিসাব করে বের করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রভাবের কারণে এতে কিছু দৈব ঘটনা থাকবে। সুতরাং আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা থাকার একটি অর্থ এমন হতে পারে যে আমরা আসলে জানি না, এই সূত্রগুলো কী করবে। কিন্তু একজন মানুষ যদি রকেটে করে ভ্রমণ করে তার রওনা দেবার আগের কোনো সময়ে ফিরে আসে তাহলে আমরা বলতে পারব সে কী করবে, কারণ এটা ইতিহাসে লেখা আছে। অতএব, এই পরিস্থিতিতে সময়ের অভিযাত্রীর আসলেই কোনো স্বাধীন ইচ্ছা থাকবে না।

সময় ভ্রমণের প্যারাডক্সের আরেকটি সমাধানকে বলা যেতে পারে বিকল্প ইতিহাস (alternative history) তত্ত্ব। এই মত অনুসারে, সময়ের অভিযাত্রীরা অতীতে গিয়ে আগের ইতিহাসের বদলে বিকল্প ইতিহাসে প্রবেশ করবেন, যা আগের ইতিহাস থেকে ভিন্ন হবে। এখানে তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন, আগের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বা সীমাবদ্ধতা মানতে হবে না। স্টিভেন স্পিলবার্গ তাঁর ব্যাক টু দি ফিউচার মুভিতে এই ধারণা ব্যবহার করে মজা করেছেন। মুভিতে মারটি ম্যাকফ্লাই অতীতে গিয়ে তাঁর মা-বাবার সম্পর্ককে আরো সুখকর করে তুলেছেন।

রিচার্ড ফাইনম্যান কোয়ান্টাম তত্ত্বে সামষ্টিক ইতিহাস দিয়ে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (নবম অধ্যায়) তার সাথে বিকল্প ইতিহাস তত্ত্বের মিল আছে। এটি বলছে, মহাবিশ্বের ইতিহাস একটি নয়, এতে সম্ভাব্য সব রকম ইতিহাস তাদের নিজস্ব সম্ভাবনা নিয়ে টিকে আছে। তবে ফাইনম্যানের প্রস্তাবের সাথে বিকল্প ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। ফাইনম্যানের সমষ্টিতে প্রত্যেকটি ইতিহাসের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ স্থান-কাল ও তার ভেতরের সব কিছু অন্তর্ভুক্ত। স্থান-কাল এতটা বক্র হতেও পারে যে রকেট নিয়ে অতীতে চলে আসা যাবে। কিন্তু রকেট একই স্থান-কালের মধ্যেই থাকবে এবং তার ফলে তার ইতিহাসও একই হবে, যাতে করে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। ফলে দেখা যাচ্ছে ফাইনম্যানের প্রস্তাবনা আসলে বিকল্প ইতিহাসের বদলে ধারাবাহিক ইতিহাসের পক্ষ নিচ্ছে।

এই সমস্যাগুলো আমরা এড়াতে পারি ঘটনাপঞ্জি সংরক্ষণ তত্ত্বের (chronology protection) মাধ্যমে। এর বক্তব্য হচ্ছে, ম্যাক্রোস্কোপিক[৬] বা বড় সাইজের বস্তুরা যাতে কোনো তথ্য অতীতে নিতে না পারে পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলো তাতে কড়া নজর রাখে। এই তত্ত্বের কোনো প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু একে সত্য মনে করার পক্ষে যুক্তি আছে।

www.pathagar.com

যুক্তি হলো, যখন স্থান-কালকে বাঁকিয়ে অতীতে যাওয়া সম্ভব করে তোলা হবে, তখন কোয়ান্টাম তত্ত্বের হিসাব-নিকাশ থেকে দেখা যায় কণিকা বা প্রতিকণিকারা আবদ্ধ চক্রের মধ্যে ঘুরতে থাকে। এতে করে শক্তির ঘনত্ব এত বেশি হয় যে স্থান-কালের বক্রতা হয়ে পড়ে ধনাত্মক, যার ফলে যে বক্রতার মাধ্যমে সময় ভ্রমণ সম্ভব হয়েছিল সেই বক্রতা আর থাকে না। এটা আসলেই ঘটে কি না তা নিশ্চিত না হবার কারণে সময় ভ্রমণের দুয়ার এখনো বন্ধ হয়ে যায়নি। কিন্তু এর পক্ষে বাজি ধরা ঠিক হবে না, কারণ আপনার প্রতিপক্ষ হয়তো ভবিষ্যত জেনে ফেলে সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে যাবে!

www.pathagar.com

অনুবাদকের নোট

১. অর্থাৎ, কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটতে যে সময় লাগবে, তার পরিমাণ যেকোনো দর্শকের কাছে একই মনে হবে।

২. টাইম মেশিনকে সব সময় মহাকাশযানই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এখানে বিশেষ উদাহরণটি এ রকম দেওয়া হয়েছে বলে এর কথা বলা হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, আপনি যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠেও সোজা কোনো রেললাইন বানিয়ে এতে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে ট্রেন চালিয়ে দেন তাতেও একই ঘটনা ঘটবে। বিষয়টি বেগের সাথে জড়িত, কোনো নির্দিষ্ট স্থান, যেমন মহাকাশের সাথে নয়। স্থানের সাথে সম্পর্ক আছে অন্যভাবে, যা আমরা পরে দেখব।

৩. কারণ সময় ও গতি গুণ করে দূরত্ব পাওয়া যায়। এখন একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের ক্ষেত্রে, সময় যদি কম হয় গতি তো বেশি হতেই হবে। আর সময় যেহেতু ইচ্ছেমাফিক কম করা যাচ্ছে, গতিও তাহলে ইচ্ছেমাফিক বড় হবে। যেমন ধরুন, আমরা ৪ আলোকবর্ষ দূরের প্রক্সিমা সেন্টোরিতে গিয়ে আবার ফিরে এলাম। সাধারণ হিসাবে এই ভ্রমণ শেষ করতে ৮ আলোকবর্ষের চেয়ে বেশি সময় লাগবে। সে ক্ষেত্রে ৮ বছরের আগে আমাদের ফিরে আসার কথা নয়। ধরুন, আমরা রওনা দিলাম ২০১৬ সালে। ২০২০ সালে ওখান থেকে ফিরতি পথে রওনা দিলে ফিরে আসার কথা ২০২৪ সালের পরে। কিন্তু অতীতে ভ্রমণ করে আমরা ফিরে এলাম ২০১৭ সালে। তার মানে ২০২০ সালে ওখান থেকে নির্গত কোনো আলোক রশ্মির চেয়েও দ্রুত চলে এলাম আমরা। এভাবে আমরা যত বেশি অতীতে আসব, আলোর বেগকে তত বেশি বড় ব্যবধানে পরাজিত করা হবে।

৪. ব্ল্যাকহোল থেকে কোনো কিছু বের হতে পারে না–এই কথা একেবারে চূড়ান্ত নয়। এই বইয়ের অন্যতম লেখক ড. হকিং ই আবিষ্কার করেন, কোয়ান্টাম সূত্রের কল্যাণে ব্ল্যাক হোল থেকে কিছু কণা বের হতেও পারে। তাঁর নাম অনুসারেই এই প্রক্রিয়ার নাম হল হকিং বিকিরণ (hawking radiation)।

৫. একে বলা হয় গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্স। দাদার কোনো সন্তান হবার আগেই কেউ যদি অতীতে গিয়ে তার দাদাকে মেরে ফেলেন, তাহলে তার বাবার জন্ম হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাহলে তিনি এলেন কোত্থেকে? এভাবেই সময় ভ্রমণ করতে গেলে মুখোমুখি হতে হয় বিভিন্ন প্যারাডক্সের।

৬. খালি চোখে দৃশ্যমান–এমন সাইজের জিনিসকে ম্যাক্রোস্কোপিক বলা হয়।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়
প্রকৃতির বলসমূহ এবং পদার্থবিদ্যার একীভবন

তৃতীয় অধ্যায়েই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, মহাবিশ্বের সব কিছুকে এক বাক্যে প্রকাশ করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব প্রস্তুত করা বেশ কঠিন একটি কাজ। ফলে আমরা একবারে তা না করে আংশিক তত্ত্ব বের করে করে এগিয়েছি। এ তত্ত্বগুলো অল্প কিছু ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম, বাকি প্রতিক্রিয়াগুলোকে হয় বাদ দিতে হয়, না হয় কিছু সংখ্যার মাধ্যমে কাছাকাছি একটি মান নেওয়া হয়। আজ পর্যন্ত আমরা বিজ্ঞানের সূত্রগুলোকে যে পর্যায়ে আনতে পেরেছি তাতে অনেকগুলো সংখ্যা রয়ে গেছে। যেমন ধরুন, এখনও আমরা ইলেক্ট্রনের চার্জের পরিমাণ এবং প্রোটন ও ইলেক্ট্রনের ভরের অনুপাত তত্ত্ব প্রয়োগ করে বলতে পারি না, তথ্যগুলো পেতে হয় পর্যবেক্ষণ থেকে। আর দেখে জেনে নেওয়া এই তথ্য আমরা বসাই সমীকরণে[১]। কেউ কেউ এগুলোকে মৌলিক ধ্রুবক বলেন। অন্যরা বলেন এগুলোর কোনো মৌলিকত্ব নেই, শুধু কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের সাথে মেলানোর জন্যই বসাতে হয়েছে।

আপনি যে মতের পক্ষেই থাকুন না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে এই সংখ্যাগুলোর মান প্রাণের উদ্ভবের পেছনে বেশ সূক্ষ্ম ভূমিকা পালন করেছে। যেমন, ইলেক্ট্রনের চার্জ যদি সামান্য এদিক-ওদিক হতো তবে তা নক্ষত্রের মধ্যে তড়িচ্চুম্বকীয় ও মহাকর্ষীয় বলের ভারসাম্য নষ্ট করত। হয় এরা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পোড়াতে ব্যর্থ হতো অথবা এরা বিস্ফোরিত হয়ে যেত[২]। দুই ক্ষেত্রেই প্রাণের অস্তিত্ব হতো অসম্ভব। আমারা আশা করছি, শেষ পর্যন্ত এমন একটি পূর্ণাঙ্গ, সুসংগত ও একীভূত তত্ত্ব পাওয়া যাবে, যা থেকে সবগুলো আংশিক তত্ত্বও বের করে নেওয়া যাবে এবং যাকে পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সংশোধন করে বিশেষ কিছু সংখ্যা, যেমন ইলেক্ট্রনের চার্জ ইত্যাদি যুক্ত করতে হবে না।

www.pathagar.com

এমন একটি তত্ত্বের অনুসন্ধানকে বলা হয় পদার্থবিদ্যার একীভবন (unification of physics)। এই তত্ত্ব খুঁজতে খুঁজতেই আইনস্টাইন তাঁর শেষ জীবনের বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেছেন। কিন্তু সময়টা উপযুক্ত ছিল না। সে সময় মহাকর্ষ ও তড়িচ্চুম্বকীয় বলের জন্য আংশিক তত্ত্ব ছিল, কিন্তু নিউক্লিয়ার বলসমূহ সম্পর্কে তখনকার সময়ে জ্ঞান ছিল খুব সামান্য। উপরন্তু আমরা নবম অধ্যায়ে দেখেছি যে আইনস্টাইন কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপর আস্থা রাখতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু তবু দেখা যাচ্ছে অনিশ্চয়তা নীতি আমাদের মহাবিশ্বের একেবারে মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্য। অতএব একীভূত কোনো তত্ত্বকে সফলতার মুখ দেখতে হলে এই নীতিকে অগ্রাহ্য করে তা সম্ভব হবে না।

বর্তমানে এমন একটি তত্ত্ব খুঁজে পাবার সম্ভাবনা বেড়েছে। এখন আমরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনেক বেশি জানি। কিন্তু আমাদেরকে সতর্কও হতে হবে, বেশি আত্মবিশ্বাসে গা ভাসিয়ে দেওয়া যাবে না। অতীত ইতিহাসেও আমরা অনেক নকল সাফল্য দেখেছি। বিংশ শতকের শুরুতে মনে করা হতো, অবিচ্ছিন্ন বস্তুর স্থিতিস্থাপকতা ও তাপের পরিবহন ইত্যাদি জাতীয় ধর্মগুলো দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করা যাবে। পরমাণুর কাঠামো এবং অনিশ্চয়তা নীতি আবিষ্কারের মাধ্যমে এই ধারণা বাতিল হয়ে গেল। ১৯২৮ সালে কিছু দর্শনার্থী গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ ম্যাক্স বর্নের সাথে দেখা করতে যান। তিনি তখন মন্তব্য করেন, 'আমরা যে পদার্থবিদ্যাকে চিনি তা ছয় মাস পর বিলুপ্ত হয়ে যাবে।' তার কিছুদিন আগে বিজ্ঞানী পল ডিরাকের ইলেকট্রনের সমীকরণ আবিষ্কার থেকে তিনি এই আত্মবিশ্বাস পেয়েছিলেন। মনে করা হয়েছিল যে একই রকম একটি সমীকরণ প্রোটনের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করবে। তখন শুধু এই দুটো কণিকার কথাই জানা গিয়েছিল। অতএব, মনে করা হলো তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার এখানেই সমাপ্তি। কিন্তু ১৯৩২ সালে নিউট্রন আবিষ্কারের মাধ্যমে লক্ষ্য আরো দূরে সরে গেল। তবুও এই সাবধানতার কথা মাথায় রেখে আমরা আশা করতে পারি যে প্রকৃতির চূড়ান্ত সূত্রের অনুসন্ধান সাফল্যের খুব নিকটে চলে এসেছে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুসারে, সকল জড় কণিকাদের মধ্যে বল ও মিথস্ক্রিয়া বহন করে কণিকারাই। এ ক্ষেত্রে যা ঘটে তা হলো, একটি জড় কণিকা, যেমন ইলেকট্রন বা কোয়ার্ক একটি বলবাহী (force carrying)

www.pathagar.com

কণিকা নির্গত করে। এই নির্গমনের ধাক্কায় জড় কণিকার বেগ বদলে যায়। এই একই কারণে গোলা নিক্ষেপের পর কামান একটু পেছনে সরে আসে। এই বলবাহী কণিকা তখন আরেকটি আরেকটি জড় কণিকার সাথে মিলিত হয়, যেটি একে শোষণ করে নেয়। ফলে এই জড় কণিকাটির বেগও পরিবর্তন হয়। দুটি জড় কণিকার মধ্যে কোনো বল কাজ করলে যে ফলাফল হতো, নির্গমন ও শোষণের এই প্রক্রিয়াও ঠিক সে রকমই।

প্রত্যেকটি বল পরিবাহিত হয় এর নিজস্ব বলবাহী কণার মাধ্যমে। বলবাহী কণার ভর বেশি হলে এদেরকে উৎপন্ন করা ও বেশি দূরত্বে পাঠানো কঠিন। ফলে এদের বহন করা বলের পাল্লা হবে ছোট্ট। অন্যদিকে বলবাহী কণার যদি নিজস্ব ভর না থাকে, তাহলে বলের পাল্লা হবে অনেক বিশাল। জড় কণিকাদের মধ্যে বিনিময় হওয়া বলবাহী কণিকাদেরকে ভার্চুয়াল কণা বলার কারণ হচ্ছে এদেরকে বাস্তব কণিকার মতো সরাসরি শনাক্ত করা যায় না। পার্টিকেল ডিটেকটর এখানে ব্যর্থ। কিন্তু এদের পরিমাপযোগ্য প্রভাব থাকার কারণে আমরা জানি যে এদের অস্তিত্ব আছে। জড় কণিকাদের মধ্যে এরাই বল উৎপন্ন করে।

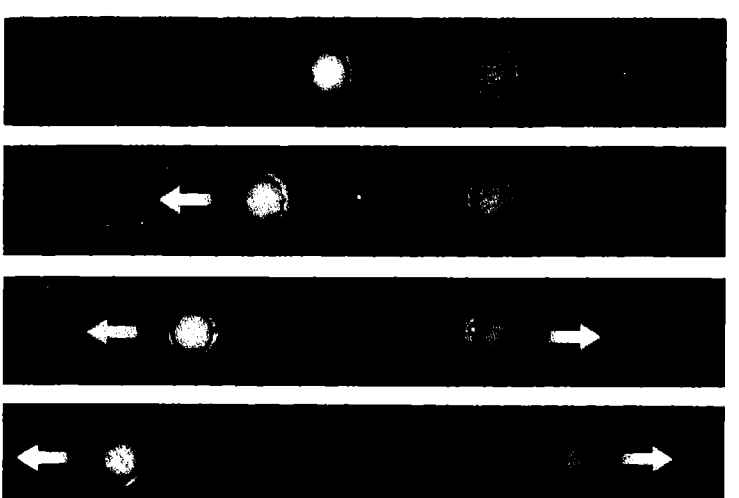

চিত্র : কণার বিনিময়

[কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে বলের উদ্ভব ঘটে বলবাহী কণা বিনিময়ের মাধ্যমে।]

www.pathagar.com

বলবাহী কণাদের চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। এখানে বলে রাখা ভালো, এই যে চারটি ভাগ তা কিন্তু আমাদের মানুষেরই বানানো, আমাদের আংশিক তত্ত্ব তৈরির জন্য এতে সুবিধা হয় বলে। কিন্তু এই বিভাজন আরো গভীরে নাও কাজ করতে পারে। বেশির ভাগ পদার্থবিজ্ঞানীর আশা, চারটি বলের সবগুলোকে একটি বলেরই বিভিন্ন রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করার মতো একটি একীভূত তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। অনেকের মতে বর্তমানে এটাই পদার্থবিদ্যার প্রধান লক্ষ্য।

প্রথমটি হলো মহাকর্ষী বল। এই বলটি সর্বজনীন। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি কণাই এর ভর বা শক্তি অনুসারে মহাকর্ষ অনুভব করে। মহাকর্ষ অন্য বলগুলোর তুলনায় অনেক অনেক দুর্বল। এটি এতই দুর্বল যে এর বিশেষ দুটি বৈশিষ্ট্য না থাকলে এর কথা আমরা জানতামই না। এক, এটি বিশাল দূরত্ব পর্যন্ত কাজ করতে পারে। দুই, এটি সব সময় আকর্ষণ করে, কখনো বিকর্ষণ করে না। এর ফলে পৃথিবী ও সূর্যের মতো দুটো বিশাল বস্তুর প্রতিটি কণিকার মধ্যকার দুর্বল মহাকর্ষীয় বলও সব মিলিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বল তৈরি করবে। অন্য তিনটি বল হয় স্বল্পপাল্লায় কাজ করে, নয়তো কখনো আকর্ষণ করে এবং কখনো বিকর্ষণ করে প্রতিক্রিয়া হারিয়ে ফেলে।

এর পরে বলতে হয় তড়িচ্চুম্বকীয় বলের কথা। এটি ইলেকট্রন ও কোয়ার্কের মতো তড়িতগ্রস্ত (চার্জিত) কণিকাদের সাথে প্রতিক্রিয়া করে। নিউট্রনের মতো চার্জহীন কণাদের নিয়ে এটি কাজ করে না। মহাকর্ষ বলের চেয়ে এটি অনেক বেশি শক্তিশালী। দুটি ইলেকট্রনের মধ্যে ক্রিয়াশীল তড়িচ্চুম্বকীয় বল এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বলের তুলনায় ১ কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি (১-এর পরে ৪২টি শূন্য) গুণ শক্তিশালী। আবার ইলেকট্রিক চার্জ হতে পারে দু রকম। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। দুটি ধনাত্মক বা দুটি ঋণাত্মক চার্জের মধ্যে বিকর্ষণ কাজ করে। কিন্তু একটি ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের মধ্যে কাজ করে আকর্ষণ বল।

সূর্য বা পৃথিবীর মতো বিশাল বস্তুদের মধ্যে প্রায় সমানসংখ্যক ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ থাকে। এর ফলে স্বতন্ত্র কণিকাদের মধ্যকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল একে অপরকে প্রায় পুরোপুরি নাকচ করে দেয় এবং খুব সামান্য পরিমাণ তড়িচ্চুম্বকীয় বল বাকি থাকে। কিন্তু পরমাণু বা অণুর খুব ক্ষুদ্র স্কেলে তড়িচ্চুম্বকীয় বলই রাজত্ব করে। মহাকর্ষের ফলে যেমন পৃথিবী

www.pathagar.com

সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে, তেমনি ঋণাত্মক চার্জধারী ইলেক্ট্রন ও নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক চার্জধারী প্রোটনের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বলের কারণেই পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেক্ট্রনরা ঘুরতে থাকে। ফোটন নামক বিপুলসংখ্যক ভার্চুয়াল কণিকা বিনিময়ের মাধ্যমে তড়িচ্চুম্বকীয় বল কাজ করে। এখানেও ফোটনদের বিনিময় ঘটে ভার্চুয়াল কণা হিসেবেই। কিন্তু একটি ইলেক্ট্রন এক কক্ষপথ থেকে নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি আরেক কক্ষপথে চলে গেলে কিছু শক্তি নির্গত হয় এবং একটি বাস্তব ফোটন বেরিয়ে আসে। যদি এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট মানের মধ্যে থাকে, তবে একে দৃশ্যমান আলোতে আমাদের চোখ বা কোনো ফোটন ডিটেকটর, যেমন ফটোগ্রাফিক ফিল্ম দিয়ে দেখা সম্ভব। একইভাবে একটি বাস্তব ফোটন কোনো পরমাণুর সাথে ধাক্কা খেলে নিউক্লিয়াসের কাছের কোনো কক্ষপথ থেকে একটি ইলেক্ট্রন আরো দূরে সরে যেতে পারে। এতে করে ফোটনের শক্তি ব্যবহৃত হয়ে যাবার কারণে এটি শোষিত হয়ে যায়।

তৃতীয় ধরনের বল হলো দুর্বল নিউক্লিয়ার বল। আমরা চলতে-ফিরতে কখনও সরাসরি এই বলের সাক্ষাৎ পাই না। কিন্তু এই বলটিই পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভেঙে উৎপন্ন হওয়া তেজস্ক্রিয়তার জন্য দায়ী। ১৯৬৭ সালে দুর্বল নিউক্লিয়ার বল সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা ছিল না। ঐ বছর লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজের ড. আব্দুস সালাম এবং হার্ভাডের স্টিভেন উইনবার্গ একই সাথে তড়িচ্চুম্বকীয় বলের সাথে এই বলের একীভবনের একটি তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। এর প্রায় একশ বছর আগে ম্যাক্সওয়েল এভাবেই তড়িৎ ও চুম্বকীয় বলকে একত্র করেছিলেন। এই তত্ত্বের অনুমান পরীক্ষার সাথে খুব ভালোমতো মিলে যাওয়ায় ১৯৭৯ সালে সালাম ও উইনবার্গ পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। একই সাথে নোবেল পান হার্ভাডের আরেক বিজ্ঞানী শেলডন গ্ল্যাশো। তিনিও তড়িচ্চুম্বকীয় ও দুর্বল নিউক্লিয়ার বলকে একত্রিত করতে একই রকম একটি তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন।

চতুর্থ ধরনের বল হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী। এর নাম সবল নিউক্লিয়ার বল। আগেরটির মতো এই বলটির সাথেও আমাদের সরাসরি কোনো যোগাযোগ নেই। কিন্তু আমাদের চারপাশের প্রায় সব কিছুকে এই বলটিই যুক্ত করে রেখেছে। প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে কোয়ার্কদেরকে যুক্ত করেছে এই বল। এই বলটিই পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও ইলেক্ট্রনকে ধরে রেখেছে। সবল বল না থাকলে ধনাত্মক চার্জধারী প্রোটনদের মধ্যকার

www.pathagar.com

বিকর্ষণের ফলে মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভেঙে তছনছ হয়ে যেত। একমাত্র ব্যতিক্রম হাইড্রোজেন গ্যাস, কারণ এর নিউক্লিয়াসে মাত্র একটি প্রোটন থাকে[৩]। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, গ্লুওন (gluon) নামে একটি কণা এই বলটিকে বহন করে। এই গ্লুওন প্রতিক্রিয়া করতে পারে শুধু কোয়ার্ক ও নিজের সাথে[৪]।

তড়িচ্চুম্বকীয় ও দুর্বল নিউক্লিয়াস বলকে সফলভাবে একীভূত করার পর এই দুটোকে সবল নিউক্লিয়ার বলের সাথে একীভূত করার জন্যও অনেকগুলো প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। প্রস্তাবিত এই একীভূত তত্ত্বের নাম গ্র্যান্ড ইউনিফাইড থিওরি (GUT)। নামটিতে আসলে কিছুটা বাড়াবাড়ি প্রকাশ পেয়েছে। কারণ এখানে তত্ত্বটি একদিকে খুব বেশি গ্র্যান্ড বা বড় নয়, আবার এটি পরিপূর্ণভাবে একীভূত তত্ত্বও নয়, কারণ এতে মহাকর্ষের কথা নেই। অন্যদিকে এটি আসলে পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বও নয়, কেননা এতে অনেকগুলো এমন ধ্রুবক আছে, যাদের মান তত্ত্ব থেকে বলা যায় না, পরীক্ষা করে বের করে নিতে হয়। তবে যাই হোক, পূর্ণাঙ্গ একীভূত তত্ত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে এটি প্রস্তুত করা সম্ভব হলেও তো অন্তত এক ধাপ সামনে যাওয়া হবে।

মহাকর্ষকে অন্যান্য তত্ত্বের সাথে যুক্ত করতে প্রধান সমস্যা হলো, মহাকর্ষের সূত্র বা সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব হচ্ছে একমাত্র তত্ত্ব, যা কোয়ান্টাম তত্ত্ব মেনে চলে না (মানে এটি একটি ননকোয়ান্টাম থিওরি)। এটি অনিশ্চয়তা নীতির ধার ধারে না। কিন্তু যেহেতু অন্যান্য বলের আংশিক তত্ত্বগুলো অনিবার্যভাবে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ওপর নির্ভরশীল, তাই মহাকর্ষকে অন্যান্য তত্ত্বের সাথে একীভূত করতে হলে সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্যে অনিশ্চয়তা নীতিকে স্থান দিতেই হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউই কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্ব প্রস্তুত করতে পারেননি।

কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্ব তৈরি করা এতটা কঠিন হয়ে ওঠার পেছনেও অনিশ্চয়তা নীতির হাত আছে। নীতিটি বলছে যে 'শূন্য' স্থানেও প্রচুর পরিমাণ ভার্চুয়াল কণা ও প্রতিকণার জোড়া রয়েছে। যদি তা না হতো, মানে 'শূন্য' স্থান যদি আসলেই সম্পূর্ণ খালি হতো, তাহলে তার অর্থ হতো মহাকর্ষীয় এবং তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রসহ সবগুলো ক্ষেত্রের মান একেবারে শূন্য হতো। কিন্তু একটি ক্ষেত্রের মান ও সময়ের সাথে তার পরিবর্তনের হার একটি কণার অবস্থান ও বেগের (অবস্থানের পরিবর্তন) সাথে তুলনীয়। অনিশ্চয়তা নীতি বলছে যে আপনি এই দুটি রাশির একটিকে যত বেশি

www.pathagar.com

সঠিকভাবে পরিমাপ করতে চাইবেন, আরেকটিতে ভুলের পরিমাণ ততই বেড়ে যাবে। অতএব শূন্য স্থানের কোনো ক্ষেত্রের মান যদি পুরোপুরি শূন্য হয়, তার মানে একই সাথে এর মান (অর্থাৎ শূন্য) এবং পরিবর্তনের হার (এটাও শূন্য) দুটোরই একটি সূক্ষ্ম হিসাব পাওয়া যাবে। এটি অনিশ্চয়তা নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। অতএব ক্ষেত্রের মানের মধ্যে কিছু পরিমাণ অনিশ্চয়তা থাকতেই হবে। একে বলা হয় কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন।

কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনকে এমন এক জোড়া কণা ভাবে যেতে পারে, যারা একই সময়ে একত্রে আবির্ভূত হয়, ভিন্ন দিকে চলে, এরপর একই দিকে আসে এবং একে অপরকে ধ্বংস করে দেয়। বল বহনকারী কণিকাদের মতো এরাও ভার্চুয়াল কণিকা। বাস্তব কণিকাদের মতো এদেরকে পার্টিকেল ডিটেকটরের সাহায্যে সরাসরি শনাক্ত করা যায় না। কিন্তু এদের পরোক্ষ প্রভাব পরিমাপ করা যায়। যেমন, ইলেকট্রনের কক্ষপথের শক্তির ক্ষুদ্র পরিবর্তন পরিমাপ করা যায়। এই তথ্য তাত্ত্বিক অনুমানের সাথে বেশ নির্ভুলভাবে মিলে যায়। তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের ফ্লাকচুয়েশনের ক্ষেত্রে এই কণিকাগুলো হলো ভার্চুয়াল ফোটন, আর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মধ্যেই এই কণিকারা হলো ভার্চুয়াল গ্র্যাভিটন। কিন্তু দুর্বল ও সবল নিউক্লিয়ার বলের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল জোড়া হলো ইলেকট্রন, কোয়ার্ক ও তাদের প্রতিকণিকা ইত্যাদির মতো জড় কণিকাদের জোড়া।

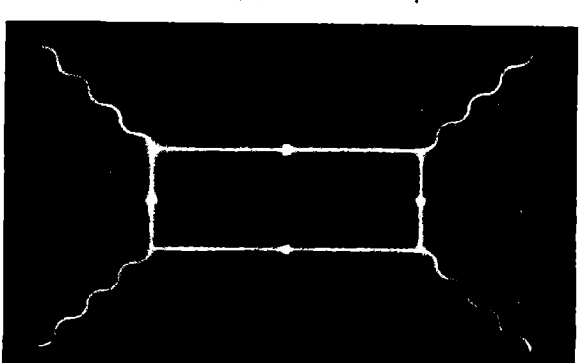

চিত্র : ভার্চুয়াল কণা ও প্রতিকণারর জোড়াবিষয়ক ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম

[অনিশ্চয়তা নীতিকে ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে এমনকি শূন্য স্থানেও কণা ও প্রতিকণার জোড়া থাকে, যারা প্রতি মুহূর্তে তৈরি হয় এবং একে অপরকে ধ্বংস করে দেয়।]

www.pathagar.com

সমস্যা হলো, এই ভার্চুয়াল কণিকাদেরও এনার্জি বা শক্তি আছে। আবার যেহেতু ভার্চুয়াল কণিকার সংখ্যা অসীম, তাই এদের শক্তির পরিমাণও হবে অসীম। এর ফলে, আইনস্টাইনের সমীকরণ $E = mc2$ অনুসারে (পঞ্চম অধ্যায় দেখুন) এদের ভরের পরিমাণও হবে অসীম। সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের ভাষায় এর অর্থ হলো, মহাকর্ষ পুরো মহাবিশ্বকে গুটিয়ে অসীম ক্ষুদ্র বানিয়ে ফেলবে। কিন্তু বাস্তবতা তো তা নয়! সবল, দুর্বল ও তড়িচ্চুম্বকীয় বলের মতো আংশিক তত্ত্বগুলোতেও একই রকম অদ্ভুত অদ্ভুত অসীম জিনিসের দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু এদের তিনটার ক্ষেত্রেই একটি এই অসীমের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি উপায় আছে। এই কৌশলের নাম রিনর্মালাইজেশন। এর কারণেই এই বলগুলো নিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

রিনর্মালাইজেশনের মাধ্যমে নতুন অসীম সংখ্যা নিয়ে এসে তত্ত্বে উপস্থিত অসীম সংখ্যার সাথে কাটাকাটি করা হয়। কিন্তু এদেরকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার প্রয়োজন হয় না। আমরা নতুন অসীম রাশিগুলো এমনভাবে নিতে পারি, যাতে ভাগশেষ খুব ছোট্ট হয়। এই ছোট্ট ভাগশেষদেরকে তত্ত্বে রিনর্মালাইজড রাশি বলা হয়।

গাণিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই কৌশলকে গোঁজামিল মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু এতে কাজ হয়। এই কৌশল কাজে লাগিয়ে সবল, দুর্বল ও তড়িচ্চুম্বকীয় বল সম্পর্কে যে অনুমান করা হয়েছিল, তা খুব দারুণভাবে পর্যবেক্ষণের সাথে মিলে গেছে। কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ থিওরি প্রস্তুত করার কথা চিন্তা করলে রিনর্মালাইজেশনের বড় একটি দুর্বলতা রয়েছে। এর কারণ হলো, এটি অনুসারে বলের প্রকৃত শক্তি ও ভরের মান তত্ত্ব থেকে অনুমান করা সম্ভব হয় না, জেনে নিতে হবে পর্যবেক্ষণ থেকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, রিনর্মালাইজেশন ব্যবহার করে সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের অসীম রাশিগুলোকে দূর করতে গেলে মাত্র দুটি রাশিকে মানিয়ে নেওয়া যায়। এর একটি হলো মহাকর্ষের শক্তি ও অপরটি হলো মহাজাগতিক ধ্রুবক, যেটিকে আইনস্টাইন তাঁর সমীকরণে যুক্ত করেছিলেন মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে না মনে করে (সপ্তম অধ্যায় দেখুন)। কিন্তু বাস্তবতা হলো, শুধু এই দুটি রাশিকে ঠিক করে সব অসীম সংখ্যার হাত থেকে বাঁচা যায় না। ফলে কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্ব আমাদেরকে বলছে যে স্থান-কালের বক্রতার মতোই কিছু রাশি আসলেই অসীম হবে। অথচ এই রাশিগুলো পরিমাপ করে আমরা সম্পূর্ণ সসীম বা নির্দিষ্ট মান পাই!

www.pathagar.com

সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং অনিশ্চয়তা নীতিকে একীভূত করতে গেলে যে এই সমস্যা তৈরি হবে তা অনেক দিন থেকেই আঁচ করা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালে বিস্তারিত হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে এটি নিশ্চিত হয়। চার বছর পরে একটি সম্ভাব্য সমাধান এল। এর নাম সুপারগ্র্যাভিটি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, সুপারগ্র্যাভিটি তত্ত্বে শেষ পর্যন্ত কোনো অসীম রাশি থাকবে কি না, তা জানতে হলে এত বিশাল হিসাব-নিকাশ করতে হয় যে তা করার সাহস কারোই হয়নি। এমনকি কম্পিউটার ব্যবহার করে এই হিসাব করলেও তাতে বছরের পর বছর লেগে যাবে। আর এতেও যে অন্তত একটি বা সম্ভবত তারও বেশি ভুল থেকে যাবার সম্ভাবনাও খুব বেশি। ফলে, আমরা তখনই জানব যে এটি সঠিক উত্তর, যখন অন্যও কেউও এই হিসাব-নিকাশ করে একই উত্তর পাবেন। আর এমন সম্ভাবনাও কিন্তু খুব ক্ষুদ্র। এ ছাড়া সুপারগ্র্যাভিটি তত্ত্বের কণিকারা পর্যবেক্ষণে পাওয়া কণিকাদের সাথে মেলে না। কিন্তু তবু বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর বিশ্বাস ছিল, এই থিওরিকে ঠিকঠাক করে নেওয়া যেতে পারে এবং মহাকর্ষকে অন্যান্য বলগুলোর সাথে একীভূত করার ক্ষেত্রে সম্ভবত এটাই হবে সঠিক পথ। এরপর ১৯৮৪ সালে এসে মতামত দারুণভাবে পাল্টে গেল। লাইমলাইটে চলে এল স্ট্রিং থিওরি।

স্ট্রিং থিওরি আসার আগে মনে করা হতো প্রত্যেকটি মৌলিক কণিকা একটি নির্দিষ্ট স্থান দখল করে রাখে। স্ট্রিং থিওরি অনুসারে মৌলিক বস্তুরা কোনো বিন্দু কণা নয় বরং এমন বস্তু যার শুধু দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু অন্য কোনো দিক (প্রস্থ বা উচ্চতা) নেই, অসীম পাতলা এক টুকরো সুতোর মতো। এই স্ট্রিংদের প্রান্তও থাকতে পারে (এদেরকে ওপেন বা উন্মুক্ত স্ট্রিং বলা হয়), আবার এদের কয়েকটি যুক্ত হয়ে আবদ্ধ লুপ বা চক্রও গঠন করতে পারে (এদের নাম ক্লোজড বা বদ্ধ স্ট্রিং)। প্রত্যেকটি মুহূর্তে কোনো কণিকা স্থানের একটিমাত্র বিন্দুতে অবস্থান করে। অন্য দিকে, স্ট্রিং প্রতি মুহূর্তে স্থানের একটি লাইন বা রেখা বরাবর অবস্থান করে। দুটো স্ট্রিং জোড়া লেগে একটিমাত্র স্ট্রিং গঠিত হতে পারে। ওপেন স্ট্রিংদের ক্ষেত্রে এরা প্রান্ত বরাবর যুক্ত হয়। আর ক্লোজড স্ট্রিংদের ক্ষেত্রে এদেরকে এক জোড়া ট্রাউজারের দুই পায়ের সংযোগ এর মতো দেখায়। একইভাবে একটিমাত্র স্ট্রিং ভেঙে দুটি আলাদা স্ট্রিং তৈরি হতে পারে।

স্ট্রিংই যদি মহাবিশ্বের মৌলিক বস্তু হয়, তাহলে আমরা বিভিন্ন পরীক্ষায় যে কণিকাদের দেখি তারা কী? স্ট্রিং থিওরি বলছে, আগে আমরা

www.pathagar.com

যাকে বিভিন্ন বিন্দু কণা বলতাম, সেটা আসলে স্ট্রিং-এর বিভিন্ন তরঙ্গ ছাড়া কিছুই নয়, অনেকটা ঘুড়ির কম্পমান সুতার মতো। তবে স্ট্রিং ও এর ওপর দিয়ে চলতে থাকা কম্পন এত ক্ষুদ্র যে আমাদের সেরা প্রযুক্তি দিয়েও এদের আকৃতি বুঝতে পারা সম্ভব নয়। ফলে আমাদের সব পরীক্ষায় এরা বৈশিষ্ট্যহীন ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো আচরণ করে। নিকট থেকে বা ম্যাগনিফাইয়ং গ্লাস দিয়ে একটি বালুকণার দিকে তাকালে এতে হয়তো এলোমেলো ছোপ ছোপ দাগ দেখা যাবে, স্ট্রিং-এর মতো আকৃতিও হয়তো দেখা যেতে পারে। কিন্তু দূর থেকে দেখলে একেও বৈশিষ্ট্যহীন বিন্দুর মতোই লাগবে।

একটি কণিকা দ্বারা আরেকটির নির্গমণ বা শোষণকে স্ট্রিং থিওরিতে স্ট্রিং-এর বিভাজন বা সংযোজন হিসেবে দেখা হয়। যেমন কণা তত্ত্বে পৃথিবীর ওপর সূর্যের মহাকর্ষীয় বলের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল এভাবে : সূর্যে উপস্থিত কোনো জড় কণিকা সূর্য থেকে বলবাহী কণা গ্র্যাভিটন নির্গত করে এবং পৃথিবীতে উপস্থিত কোনো জড় কণিকা তা শোষণ করে। স্ট্রিং থিওরিতে এই কাজটি হয় ঐ আকৃতির নল বা পাইপের মাধ্যমে (এক অর্থে স্ট্রিং থিওরি বিল্ডিং-এর পাইপ সিস্টেমের মতো)। এর খাড়া বাহু দুটি সূর্য ও পৃথিবীর কণিকার মতো কাজ করে, আর অনুভূমিক দাগটি হচ্ছে তাদের মধ্যে চলাচলকারী গ্র্যাভিটন।

স্ট্রিং থিওরির ইতিহাস বেশ আকর্ষণীয়। এর প্রথম উদ্ভব ঘটে ১৯৬০-এর দশকে। উদ্দেশ্য ছিল স্ট্রিং-এর (সুতা, তার বা দড়ি) টান বলের ব্যাখ্যা দেওয়ার তত্ত্ব খুঁজে বের করা। ভাবা হয়েছিল, প্রোটন ও নিউট্রনের মতো কণিকাদেরকে স্ট্রিং-এর তরঙ্গ মনে করা যেতে পারে। মাকড়সার জালের মতো এক স্ট্রিং-এর বিটের মধ্যে চলে আসা অন্য স্ট্রিং-এর টুকরোগুলোকে বিভিন্ন কণিকার মধ্যে ক্রিয়াশীল 'সবল বল' হিসেবে ধরা যেতে পারে। কণিকাদের মধ্যকার সবল বলের বাস্তব মান এই তত্ত্ব থেকে পেতে হলে স্ট্রিংদেরকে প্রায় দশ টন ওজনের রবারের চুড়ির মতো হওয়া দরকার ছিল।

১৯৭৪ সালে প্যারিসের জোয়েল শের্ক ও ক্যালটেকের (ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি) বিজ্ঞানী জন সোয়ার্জ একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এতে তাঁরা দেখালেন, স্ট্রিং থিওরি মহাকর্ষীয় বলের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। তবে শর্ত হলো স্ট্রিং-এর টান হতে হবে দশ হাজার কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি (এক-এর পরে ৩৯টি শূন্য) টন। সাধারণ দৈর্ঘ্যের স্কেলে স্ট্রিং থিওরির অনুমান সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের সাথে হুবহু

www.pathagar.com

মিলে যাবে। কিন্তু এক সেন্টিমিটারের এক লক্ষ কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগের (বা এক সেন্টিমিটারকে এক-এর পরে ৩৩টি শূন্য দিলে যা হয় সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে যা হয়) চেয়ে ক্ষুদ্র দূরত্বে এদের অনুমান ভিন্ন হয়।

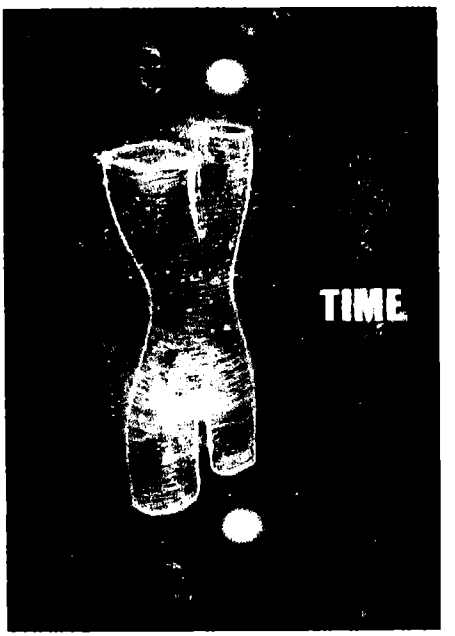

চিত্র : স্ট্রিং থিওরির ফাইনম্যান চিত্র

[স্ট্রিং থিওরি বলছে যে দীর্ঘ পাল্লার বলগুলো বলবাহী কণিকা বিনিময়ের বদলে নলের সংযোগের মাধ্যমে কাজ করে।]

কিন্তু তাঁদের এই গবেষণা খুব বেশি/কাড়তে পারেনি নজর, কারণ প্রায় ঠিক একই সময়ে বেশির ভাগ মানুষ সবল বলের মূল স্ট্রিং থিওরিকে পরিত্যাগ করেন এবং পর্যবেক্ষণের সাথে ভালো মিল দেখে কোয়ার্ক ও গ্লুওনভিত্তিক থিওরির দিকে ঝুঁকে পড়েন। একটি মর্মান্তিক অবস্থায় শের্ক মৃত্যুবরণ করেন (তিনি ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন এবং পরে একসময় কোমায় চলে যান। দরকার ছিল ইনসুলিন নেওয়ার। কিন্তু আশপাশে ইঞ্জেকশন দেওয়ার মতো কেউ ছিল না।) ফলে স্ট্রিং থিওরির পক্ষে সোয়ার্জ হয়ে গেলেন একা। তবে তিনি স্ট্রিংয়ের টান বলের প্রস্তাবিত মান অনেক বেশি বৃদ্ধি করলেন।

www.pathagar.com

১৯৮৪ সালে হঠাৎ করে স্ট্রিং থিওরি নতুন করে আলোচনায় চলে এল। এর পেছনে কাজ করেছে দুটি কারণ। এক, সুপারগ্র্যাভিটি সসীম অথবা এটি আমাদের পর্যবেক্ষণে পাওয়া কণিকাদের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম–এমন প্রমাণ পাওয়ার একটা সম্ভাবনা খুব দেখা যাচ্ছিল না। দুই, জন সোয়ার্জ এবারে লন্ডনের কুইন মেরি কলেজের মাইক গ্রিনের সাথে যৌথভাবে আরেকটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এখানে তাঁরা দেখালেন, আমাদের দেখা কিছু কণিকার মতো যেসব কণিকারা সহজাতভাবেই বামধর্মী তাদের অস্তিত্ব স্ট্রিং থিওরির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। (দর্পণের মধ্যে প্রতিফলিত করে পরীক্ষার পরিবেশ পাল্টিয়ে নিলেও বেশির ভাগ কণিকার আচরণ একই থাকে, কিন্তু এই কণিকাদের আচরণ একই থাকে না। এরা হয় বাম, নয়তো ডানধর্মী। দর্পণ দিয়ে দেখলে তাই ভিন্ন রকম দেখায়।) কারণ যেটাই হোক, বিপুলসংখ্যক মানুষ স্ট্রিং থিওরি নিয়ে কাজ শুরু করলেন। তৈরি হলো নতুন আরেকটি সংস্করণ। আমরা বিভিন্ন ধরনের যেসব কণিকা দেখি এটি তার ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম বলে মনে হলো।

স্ট্রিং থিওরিগুলোও অসীম রাশি থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু মনে করা হয় এদের সঠিক সংস্করণটিতে অসীম রাশিগুলো কাটাকাটি হয়ে যাবে (যদিও নিশ্চিত নয়)। কিন্তু স্ট্রিং থিওরিগুলোতে এর চেয়েও বড় একটি সমস্যা আছে। এরা শুধু তখনই কাজ করে যখন, স্থান-কালের মাত্রা সাধারণ চারের পরিবর্তে দশ বা ছাব্বিশ হয়। স্থান-কালের এই বাড়তি মাত্রাগুলো সায়েন্স ফিকশনে খুব সহজেই পাওয়া যায়। আর আলোর চেয়ে বেশি গতিতে ভ্রমণ করার বিপক্ষে আপেক্ষিক তত্ত্ব যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছে তা অমান্য করারও কিন্তু একটি উপায় হলো এটি (দশম অধ্যায় দেখুন)। কৌশলটা হলো বাড়তি মাত্রার সুযোগ কাজে লাগিয়ে শর্টকাট বা সংক্ষিপ্ত পথে ভ্রমণ করা। মনে করুন আমরা যে স্থানে বাস করছি তা শুধু দুটি মাত্রা নিয়ে গঠিত এবং আংটি বা ডোনাটের পৃষ্ঠের মতো বাঁকানো।

আপনি যদি এর বলয়ের ভেতরের প্রান্ত থেকে এর ঠিক উল্টো পাশের কোনো বিন্দুতে আসতে চান, তাহলে আপনাকে বলয়ের ভেতরের প্রান্ত বরাবর বৃত্ত অনুসরণ করে টার্গেটে পৌঁছতে হবে। কিন্তু তৃতীয় মাত্রায় ভ্রমণ করতে পারলে আপনি বলয় ধরে না এগিয়ে সোজা অপর পাশে চলে আসতে পারেন।

www.pathagar.com

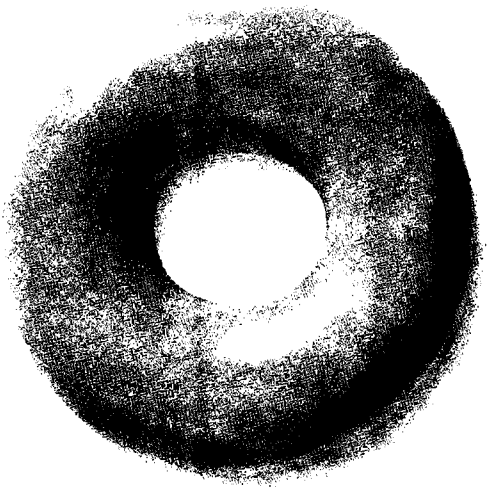

চিত্র : ডোনাটের (এক ধরনের পিঠা) আকৃতি

বাস্তবে যদি থেকেই থাকে তাহলে এই বাড়তি মাত্রাগুলোকে আমরা দেখি না কেন? আমরা কেন শুধু স্থানের তিনটি ও সময়ের একটি মাত্রা দেখি? এর উত্তরে বলা হয়, অন্য মাত্রাগুলো আমাদের পরিচিত মাত্রা থেকে ভিন্ন। এরা খুব ক্ষুদ্র সাইজের স্থানের মধ্যে কুঞ্চিত হয়ে আছে, অনেকটা এক ইঞ্চির একশ কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগের দৈর্ঘ্যের মতো। এটা এত ক্ষুদ্র যে একে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা সময়ের একটি ও স্থানের তিনটি মাত্রা দেখি, যেখানে স্থান-কাল প্রায় সমতল বা চ্যাপ্টা। এর ব্যাখ্যা বুঝতে হলে একটি স্ট্র (তরল পানীয় গ্রহণের জন্য আমরা যে নল ব্যবহার করি) এর পৃষ্ঠের কথা ভাবুন। কাছ থেকে এর দিকে তাকালে আপনি এর পৃষ্ঠকে দ্বিমাত্রিক দেখবেন। অর্থাৎ, স্ট্র-এর মধ্যে অবস্থিত কোনো বিন্দুকে দুটি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এরা হলো এর দৈর্ঘ্য এবং বৃত্তাকার মাত্রার চারদিকে (পরিধি বরাবর) দূরত্ব। কিন্তু এর বৃত্তাকার মাত্রা এর দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক ছোট হওয়াতে দূর থেকে দেখলে এর পুরুত্ব চোখে পড়ে না। মনে হয় এটি একটি একমাত্রিক বস্তু। অর্থাৎ

www.pathagar.com

এর উপরস্থ কোনো বিন্দুর অবস্থান বোঝানোর জন্য শুধু এর দৈর্ঘ্য বলাই যথেষ্ট। তাই স্ট্রিং থিওরির সমর্থকরা বলেন, খুব ক্ষুদ্র স্কেলে স্থান-কাল দশটি মাত্রা নিয়ে গঠিত এবং এর বক্রতাও খুব বেশি। কিন্তু আরো বড় স্কেলে এই বাড়তি মাত্রাগুলোর বক্রতা দেখা যায় না।

এই ধারণা যদি সঠিক হয়, তবুও তা ভবিষ্যৎ মহাকাশ যাত্রীদের জন্য কোনো সুসংবাদ দিতে পারছে না। এই বাড়তি মাত্রাগুলো এত বেশি ক্ষুদ্র হবে যে এদের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করা সম্ভব হবে না। তবে বিজ্ঞানীদের জন্যও এটি একটি সমস্যা জমা রেখেছে। সবগুলো মাত্রার বদলে অল্প কিছু মাত্রাই কেন ক্ষুদ্র জায়গায় গুটিয়ে থাকবে? খুব সহজেই বোঝা যায়, আদি মহাবিশ্বে সবগুলো মাত্রাই কুঞ্চিত ছিল। কিন্তু সময়ের একটি ও স্থানের তিনটি মাত্রাই কেন ছড়িয়ে পড়ল? অন্য মাত্রাগুলো কেন গুটিয়েই থাকল?

এর একটি সম্ভাব্য উত্তর হলো অ্যানথ্রোপিক নীতি (anthropic principle)। সংক্ষেপে এর ব্যাখ্যা হলো, 'মহাবিশ্বকে আমরা এখন যে রূপ দেখছি তার কারণ হলো আমাদের অস্তিত্ব আছে'। অ্যানথ্রোপিক নীতির আবার দুর্বল ও শক্তিশালী নামে দুটি আলাদা রূপ আছে। দুর্বল অ্যানথ্রোপিক নীতি অনুসারে, স্থান-কালের হিসেবে অনেক বড় বা অসীম মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ শুধু নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলেই তৈরি হবে। ফলে এই অঞ্চলের বুদ্ধিমান প্রাণীরা নিজদেরকে বাসযোগ্য পরিবেশে দেখে মোটেই অবাক হবে না। এটা অনেকটা একজন ধনী ব্যক্তির সচ্ছল সমাজে বাস করার মতো, যে আশপাশে কোনো গরিব মানুষকে দেখতে পায় না।

কেউ কেউ আরেক ধাপ এগিয়ে এই নীতির শক্তিশালী রূপটি উত্থাপন করেন। এই নীতি অনুসারে, হয় মহাবিশ্ব আছে অনেকগুলো, অথবা একটি মহাবিশ্বেরই অনেকগুলো অঞ্চল আছে। এদের প্রতিটির নিজস্ব প্রাথমিক পরিবেশ এবং সম্ভবত এক গুচ্ছ আলাদা সূত্র রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ মহাবিশ্বেই জটিল প্রাণী সৃষ্টির জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। আমাদের মতো অল্প কিছু মহাবিশ্বেই বুদ্ধিমান জীবদের জন্ম হয়েছে, যাদের প্রশ্ন, 'আমরা যেমন দেখি, মহাবিশ্ব কেন এমন হলো?' এর উত্তর খুব সোজা আমরা যেমন দেখছি মহাবিশ্ব যদি তেমন না হতো, তাহলে আমরা থাকতামই না।

www.pathagar.com

দুর্বল অ্যানথ্রোপিক নীতির বিপক্ষে আপত্তি করবেন তেমন কেউ না। কিন্তু মহাবিশ্বের দেখা রূপের ব্যাখ্যায় শক্তিশালী অ্যানথ্রোপিক নীতির বিপক্ষে অনেকগুলো আপত্তি তোলা যেতে পারে। যেমন, এতগুলো মহাবিশ্ব থাকার অর্থ ঠিক কী? এরা যদি একটি অপরটি থেকে আলাদা হয়, তাহলে অন্য কোনো মহাবিশ্বে কী ঘটছে তার কোনো প্রভাব আমাদের মহাবিশ্বে পড়ার কথা নয়। অতএব আমাদেরকে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করে সেই মহাবিশ্বগুলোকে আমাদের তত্ত্ব থেকে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু এরা যদি একই মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হয়ে থাকে, তাহলে প্রত্যেকটি অঞ্চলেই বিজ্ঞানের সূত্রগুলোকে একই হতে হবে। তা না হলে আমরা ক্রমাগত এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যেতে পারব না। এ ক্ষেত্রে এসব অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হবে এদের প্রারম্ভিক পরিবেশ। এর ফলে অ্যানথ্রোপিক নীতির শক্তিশালী রূপ দুর্বল রূপে পর্যবসিত হবে।

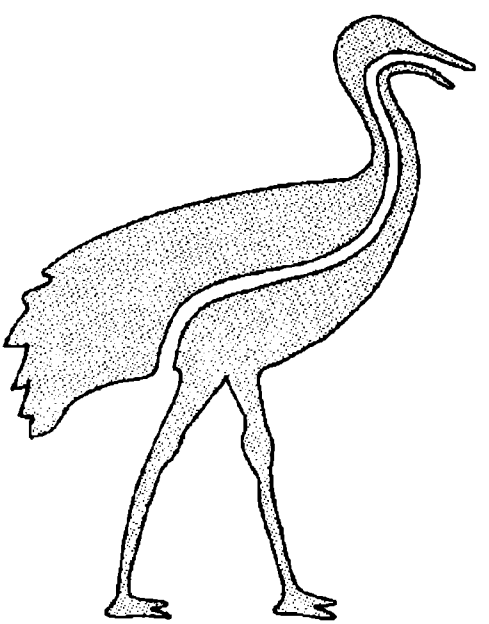

চিত্র : দ্বিমাত্রিক প্রাণীর খাদ্যনালির দুটি প্রান্ত থাকলে প্রাণীটিই দুই ভাগ হয়ে যাবে।
ছবি : অনুবাদক, সূত্র : ইন্টারনেট।

www.pathagar.com

স্ট্রিং থিওরির বাড়তি মাত্রাগুলো কেন গুটিয়ে গেল তার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা অ্যানথ্রোপিক নীতির মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের মতো জটিল প্রাণীদের সৃষ্টির জন্য স্থানের মাত্র দুটি মাত্রা যথেষ্ট মনে হচ্ছে না। যেমন বৃত্তে (একটি দ্বিমাত্রিক পৃথিবীর পৃষ্ঠে) বসবাসকারী প্রাণীরা একে অপরকে পার হয়ে যেতে হলে মাথার ওপর দিয়ে যেতে হবে। আবার দ্বিমাত্রিক প্রাণীরা খাবার খাওয়ার পর তা পুরোপুরি হজমও করতে পারবে না। যে পথে এটি খাবার গিলেছে সে পথেই আবার তা বের করে দিতে হবে। এর কারণ হলো, এর দেহের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোনো পথ থাকলে তা একে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলবে। আমাদের দ্বিমাত্রিক প্রাণীটির জন্য সমবেদনা! একইভাবে এটা বোঝাও কঠিন যে দ্বিমাত্রিক প্রাণীর দেহে রক্ত সঞ্চালন কীভাবে হবে।

আবার তিনের বেশি মাত্রা হলেও সমস্যা হবে। দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে এখানে মহাকর্ষ বলের মান তিন মাত্রার তুলনায় খুব দ্রুত কমবে। (আমাদের ত্রিমাত্রিক জগতে দূরত্ব দ্বিগুণ হলে মহাকর্ষ চার ভাগের এক ভাগ হয়। চতুর্মাত্রিক জগতে তা আট ভাগের এক ভাগ হবে, পঞ্চমাত্রিক জগতে হবে ষোলো ভাগের এক ভাগ ইত্যাদি) এর ফলে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর মতো গ্রহদের কক্ষপথ হতো অস্থিতিশীল। ফলে বৃত্তাকার কক্ষপথ থেকে সামান্য বিচ্যুতি (যা অন্য গ্রহদের আকর্ষণে ঘটে) ঘটলেই পৃথিবী পেঁচিয়ে সূর্যের দিকে বা উল্টো দিকে চলে যেত। আমরা হয় ঠাণ্ডা হয়ে জমে যেতাম, নয়তো পুড়ে ছারখার হয়ে যেতাম। এমনকি তিনের চেয়ে বেশি মাত্রায় দূরত্বের সাথে মহাকর্ষের কমতির কারণে সূর্য নিজেও ঠিক থাকতে পারত না। এর বাইরের দিকের চাপ ও মহাকর্ষ ভারসাম্য ধরে রাখতে পারত না। সূর্য হয় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত, নয়তো গুটিয়ে গিয়ে ব্ল্যাকহোল হয়ে যেত। দুই ক্ষেত্রেই এটি পৃথিবীর জন্য তাপ ও আলোর ভালো উৎস হতে পারত না। আবার ছোট পারমাণবিক জগতের ক্ষেত্রেও মহাকর্ষের মতোই ঘটনা ঘটবে। যে বলের কারণে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘোরে তা বিপর্যস্ত হতো, যার ফলে ইলেকট্রন হয় নিউক্লিয়াস ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেত, অথবা চলে আসত নিউক্লিয়াসের দিকে। দুই ক্ষেত্রেই আমাদের পরিচিত কোনো পরমাণু গঠিত হতে পারত না।

www.pathagar.com

চিত্র : ত্রিমাত্রিক হবার গুরুত্ব

[স্থানের তিনের অধিক মাত্রার ক্ষেত্রে গ্রহদের কক্ষপথ অস্থিতিশীল হতো, গ্রহরা হয় সূর্যের দিকে চলে যেত, নয়তো ছিটকে দূরে সরে যেত।]

এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আমরা অন্তত প্রাণ বলতে যা বুঝি, সেটা তৈরি হবার জন্য সময়ের একটি এবং স্থানের তিনটি মাত্রাকে কোনোভাবেই গুটিয়ে থাকা চলবে না। এর অর্থ হচ্ছে আমরা দুর্বল অ্যানথ্রোপিক নীতি মেনে নিতে পারি। শর্ত হচ্ছে, আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে স্ট্রিং থিওরি মহাবিশ্বের এ রকম অঞ্চলের অনুমোদন দেয়। হতে পারে যে মহাবিশ্বের অন্য কোনো অঞ্চল বা অন্য কোনো মহাবিশ্বের (এর অর্থ যাই হোক না কেন) সবগুলো মাত্রাই গুটিয়ে আছে, অথবা চারের বেশি মাত্রা প্রায় সমতল অবস্থায় আছে। কিন্তু এসব অঞ্চলে ঠিক কয়টি মাত্রা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে তা দেখার জন্য কোনো বুদ্ধিমান জীব থাকবে না।

www.pathagar.com

মাত্রা ছাড়াও স্ট্রিং থিওরিতে আরেকটি সমস্যা আছে। স্ট্রিং থিওরির অন্তত পাঁচটি আলাদা সংস্করণ আছে (দুটি ওপেন স্ট্রিং নিয়ে এবং বাকি তিনটি ক্লোজড স্ট্রিং নিয়ে)। আর থিওরির অনুমিত বাড়তি মাত্রাগুলো লক্ষ লক্ষ ভিন্ন উপায়ে কুঞ্চিত থাকতে পারে। একটি বিশেষ স্ট্রিং থিওরিকেই কেন বেছে নেওয়া হবে, আর কোন ধরনের কুঞ্চনই বা সঠিক হবে? কিছুদিন ধরে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে সব অগ্রগতি মুখ থুবড়ে পড়ল। ১৯৯৪ সালের দিকে আবার কিছু আবিষ্কার হাতে এল। একে বলা হচ্ছে ডুয়ালিটি বা দ্বৈততা। ভিন্ন ভিন্ন স্ট্রিং থিওরি এবং বাড়তি মাত্রাদের বেঁকে যাওয়ার ভিন্ন ভিন্ন উপায় চার মাত্রার ক্ষেত্রে হয়তো একই ফলাফল দেবে। এ ছাড়া স্থানের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে থাকা কণিকা এবং রেখার মতো স্ট্রিং ছাড়াও পি-ব্রেইন (p-brane) নামে কিছু বস্তু পাওয়া গেল। এরা দুই বা তার বেশি মাত্রার স্থানের আয়তনে থাকে।

(একটি কণিকার ব্রেইন ০ (p=0), স্ট্রিং-এর ব্রেইন ১ এবং এভাবে p=2, থেকে p=9 পর্যন্ত আছে। ২-ব্রেইনকে দ্বিমাত্রিক মেমব্রেন মনে করা যেতে পারে। আরো বেশি মাত্রার কথা চিন্তা করা আরো কঠিন।) এসব থেকে মনে হচ্ছে সুপারগ্র্যাভিটি, স্ট্রিং ও পি-ব্রেইন থিওরির মধ্যে এক ধরনের গণতন্ত্র (বক্তব্যের সমান অধিকার থাকার অর্থে) কাজ করছে। এদের সবগুলোকে ঠিক মনে হচ্ছে, কিন্তু কোনোটাকেই অন্য কোনোটার চেয়ে বেশি মৌলিক বলা চলে না। বরং সবগুলোই মনে হচ্ছে অন্য কোনো মৌলিক থিওরি থেকে আসা। প্রতিটিই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সঠিক।

এই মৌলিক তত্ত্ব খোঁজারও কম চেষ্টা চলেনি। কিন্তু এ পর্যন্ত সাফল্য ধরা দেয়নি। এমনও হতে পারে যে একগুচ্ছ গাণিতিক স্বীকার্যের মাধ্যমে যে মৌলিক তত্ত্ব তৈরি করা সম্ভব, তার বাইরে মৌলিক তত্ত্বের কোনো একক রূপ নেই। বরং এটি হয়তো মানচিত্রের মতো–আপনি একটি সমতল ম্যাপে পৃথিবীর গোলাকার পৃষ্ঠ বা আংটির পৃষ্ঠের ছবি তুলতে পারবেন না। প্রতিটি বিন্দু দেখাতে হলে পৃথিবীর ক্ষেত্রে আপনার অন্তত দুটি ম্যাপ লাগবে, আর আংটির ক্ষেত্রে লাগবে চারটি ম্যাপ৫। প্রত্যেকটি ম্যাপ একটি সীমিত অঞ্চলে জন্য সঠিক থাকবে। তবে ভিন্ন ভিন্ন ম্যাপের মধ্যেও কিছু অঞ্চল একই রকম হবে। সবগুলো ম্যাপ মিলিয়ে পৃষ্ঠের একটি পূর্ণ চিত্র তৈরি হবে। একইভাবে পদার্থবিদ্যায় হয়তো ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সূত্র প্রযোজ্য হবে, কিন্তু দুটি আলাদা সূত্র আবার একই পরিবেশেও হয়তো কাজ করতে পারে।

www.pathagar.com

এটা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে সবগুলো আলাদা সূত্রের সংগ্রহকে একটি পূর্ণ একীভূত তত্ত্ব বলা যেতে পারে, যদিও এই তত্ত্বটিকে একটিমাত্র বক্তব্যের মাধ্যমে লেখা যাবে না। প্রকৃতির কাছ থেকে এটাই হবে অনেক বড় পাওয়া। এটা কি সম্ভব যে বাস্তবে কোনো একীভূত তত্ত্বই নেই? আমরা মরীচিকার পেছনে ছুটছি না তো? এখানে সম্ভাবনা আছে তিনটি :

এক. বাস্তবিকই একটি পূর্ণ একীভূত তত্ত্ব (অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল আছে এমন কিছু সূত্রের সমাবেশ) আছে । আমরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান হলে একদিন সেটা আবিষ্কার করতে পারব।

দুই. মহাবিশ্বের চূড়ান্ত কোনো তত্ত্ব নেই। একটির পর একটি তত্ত্ব হাতে আসে, যা মহাবিশ্বকে আরেকটু ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। এভাবে অসীম পর্যন্ত চলেও কখনো প্রকৃত তত্ত্ব পাওয়া যাবে না।

তিন. মহাবিশ্বের আসলে কোনো তত্ত্বই নেই, কোনো ঘটনার অনুমান একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত করা যাবে, তার বেশি নয়। ঘটনা ঘটে এলোমেলোভাবে। কেউ কেউ তৃতীয় যুক্তির পক্ষে অবস্থান নিয়ে বলবেন, যদি পূর্ণাঙ্গ একগুচ্ছ সূত্র থেকে থাকে তবে তা হবে ঈশ্বরের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা। এ ক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছামতো তাঁর মন বদলিয়ে বিশ্বের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না[৬]।

কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু সর্বশক্তিমান, তিনি কি চাইলেই নিজের স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করতে পারেন না? এর সাথে পুরাতন একটি প্যারাডক্সে কিছুটা মিল আছে। ঈশ্বর কি এমন কোনো পাথর বানাতে পারেন, যা তিনি নিজেই তুলতে পারবেন না? সেন্ট অগাস্টিনের মতে, আসলে ঈশ্বর মন পরিবর্তন করবেন কি না, এমন প্রশ্ন করা খোদ তাঁকেও সময়ের মধ্যে উপস্থিত হিসেবে কল্পনা করার সমতুল্য, যা একটি ভুল পদ্ধতি। সময় হলো ঈশ্বরের সৃষ্ট মহাবিশ্বের একটি বৈশিষ্ট্য মাত্র। ধরে নেওয়া যায় যে তিনি কী তৈরি করতে চাচ্ছিলেন তা ভালোমতোই জানতেন।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আবির্ভাবের ফলে আমাদেরকে মানতে হচ্ছে, কোনো ঘটনা সম্পর্কে একশ ভাগ নির্ভুল করে কিছু অনুমান করা সম্ভব নয়। সব সময় কিছু অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। আপনি চাইলে এই র‍্যান্ডম বা দৈব[৭] হস্তক্ষেপের জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করতে পারেন। কিন্তু এই হস্তক্ষেপটা বড়ই অদ্ভুত। এমন কোনো প্রমাণ নেই যে এটি কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ সে ক্ষেত্রে একে দৈব বলা যেত না। এখন

www.pathagar.com

আমরা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যকে নতুন করে নির্ধারণ করে নিয়েছি। ফলে তৃতীয় সম্ভাবনাটি বাদ পড়ে গেছে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন এক গুচ্ছ সূত্র বের করা, যা আমাদেরকে অনিশ্চয়তা নীতির বেঁধে দেওয়া সীমার মধ্যে থেকে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অনুমান করতে সহায়তা করবে।

অন্যদিকে এত দিনের আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দ্বিতীয় সম্ভাবনাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ সূত্রগুলো প্রতিনিয়ত পরিমার্জিত হবে। এভাবেই চলবে অসীম পর্যন্ত। বিভিন্ন সময় আমরা আমাদের পরিমাপের সূক্ষ্মতা বাড়িয়েছি অথবা নতুন নতুন পর্যবেক্ষণ পেয়েছি। পেয়েছি এমন এমন নতুন পর্যবেক্ষণ, যা প্রচলিত তত্ত্ব অনুমানও করতে পারেনি। এই পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তৈরি করতে হয়েছে নতুন তত্ত্ব। এখন আমরা কোয়ার্ক ও ইলেক্ট্রনকে 'মৌলিক' কণিকা বিবেচনা করি। যেসব কণিকারা আরো বেশি বেশি শক্তি নিয়ে একে অপরের সাথে প্রতিক্রিয়া করে, তাদেরকে নিয়ে গবেষণা করে হয়তো আমরা আরো মৌলিক কোনো স্তর খুঁজে পাব।

'বক্সের ভেতরে বক্স' জাতীয় এই ধারায় মহাকর্ষ হয়তো বাদ সাধতে পারে। আমাদের কাছে যদি এমন কোনো কণিকা থাকে, যার শক্তি কথিত প্ল্যাঙ্ক এনার্জির চেয়ে বেশি, তাহলে এটি এত বেশি সঙ্কুচিত হবে যে এটি মহাবিশ্বের বাকি অংশ থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলবে, তৈরি করবে একটি ছোট্ট ব্ল্যাকহোল। কাজেই মনে হচ্ছে, আরো বেশি বেশি পরিমার্জিত সূত্রের ধারার একটি সীমা আছে। এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর শক্তি নিয়ে গবেষণা করতে করতে আমরা হয়তো মহাবিশ্বের চূড়ান্ত কোনো সূত্রের দেখা ঠিকই পাব। কিন্তু এখনো আমরা পরীক্ষাগারে যে শক্তি প্রস্তুত করতে পারি, প্ল্যাঙ্ক এনার্জি তা থেকে অনেক দূরে। আমাদের অনুমিত ভবিষ্যতেও পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর (যেখানে বিভিন্ন কণিকাকে উচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে বেগ বাড়িয়ে সংঘর্ষ ঘটানো হয়) এই গ্যাপ পূরণ করতে পারবে না। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রারম্ভিক সময়গুলোতে এই শক্তি নিশ্চয় ছিল। মহাবিশ্বের আদি অবস্থা নিয়ে গবেষণা করে তা গাণিতিকভাবে সুসঙ্গত উপায়ে তুলে ধরতে পারলে যে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ একীভূত তত্ত্ব পাব তার সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল। এবং তা হতে পারে আমরা যারা এখন বেঁচে আছি তারা বেঁচে থাকতেই, যদি না আমরা তার আগেই নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলি!

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের চূড়ান্ত তত্ত্ব আবিষ্কারের ফল কী হবে? তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, আমরা যদি সঠিক তত্ত্বটি পেয়েও যাই, আমরা বুঝতেও পারব না এটাই সেই কাঙ্ক্ষিত তত্ত্ব, কারণ তত্ত্ব প্রমাণ করা যায় না[৮]। কিন্তু যদি তত্ত্বটি গাণিতিকভাবে সুসঙ্গত হয় এবং এর অনুমান পর্যবেক্ষণের সাথে মিলে যায়, তাহলে আমরা ধরে নিতেই পারি যে এটাই সত্যিকারের সূত্র। এর ফলে ইতিহাসের সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়টির ইতি ঘটবে, যা মহাবিশ্বের কলাকৌশল উদ্ঘাটন করার বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে ভরপুর। পাশাপাশি মহাবিশ্বের সূত্রগুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের জগতেও বিপ্লব ঘটবে।

নিউটনের সময়েও একজন শিক্ষিত মানুষ সবগুলো জ্ঞান আয়ত্তে রাখতে পারতেন, অন্তত মূলনীতিগুলো জানতেন। কিন্তু তার পর থেকে বিজ্ঞানের গতি এই কাজটিকে অসম্ভব করে তুলেছে। যেহেতু সব সময় নতুন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটে, তাই এই তত্ত্ব কখনোই সাধারণ মানুষের বোঝার মতো সহজ হয় না। বুজতে পারেন শুধু বিশেষজ্ঞরাই, এবং তার পরেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর অল্প অংশই বুঝে ওঠা সম্ভব হয়। উপরন্তু অগ্রগতি এত দ্রুত হচ্ছে যে আপনি স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা জানতে পারছেন তাও কিছুটা সেকেলে হয়ে পড়ে। অল্প কিছু মানুষই জ্ঞানের পরিধি বেড়ে যাবার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন। এটা করতে গিয়ে তাঁদেরকে পুরো সময়টা একটি বিশেষ দিকের প্রতি ঝুঁকে থাকতে হয়। বাকি মানুষরা নতুন নতুন অগ্রগতি সম্পর্কে কমই জানতে পারেন, তার উত্তেজনাও অনুভব করেন কম। অন্যদিকে বিজ্ঞানী এডিংটনের মত অনুসারে, সত্তর বছর আগে মাত্র দুই ব্যক্তি আপেক্ষিক তত্ত্ব বুঝতেন। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা হাজার হাজার শিক্ষার্থী তা বোঝে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্তত এই ধারণার সাথে পরিচিত। একইভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ একীভূত তত্ত্ব পাওয়া গেলে মুহূর্তের মধ্যেই সবাই এটি বুঝে ফেলবে, পড়ানো হবে স্কুলেও, অন্তত প্রাথমিক ধারণাটুকু। তখন আমরা কিছুটা বুঝতে পারব যে মহাবিশ্ব কোন সূত্রগুলো দিয়ে চলছে এবং আমরাইবা কীভাবে এলাম।

যদি আমরা একটি সম্পূর্ণ একীভূত তত্ত্ব হাতে পাইও, তবু এর মাধ্যমে যে সব ধরনের ঘটনা সম্পর্কে অনুমান করা যাবে তা কিন্তু নয়। এর পেছনে আছে দুটো কারণ। প্রথমটি হচ্ছে অনিশ্চয়তা নীতি, যা আমাদের অনুমানের

www.pathagar.com

ক্ষমতাকে খর্ব করে দেয়। আমরা কোনোভাবেই এর হাত থেকে বাঁচতে পারি না। তবে দ্বিতীয় কারণটি আরো বেশি মারাত্মক। বাস্তবে এমন তত্ত্বের সমীকরণ শুধু সরল ক্ষেত্রগুলোতে সমাধান করা যায়। আগেও আমরা বলেছি, কোনো পরমাণুর একটি নিউক্লিয়াস ও একের বেশি ইলেকট্রনের জন্য কোয়ান্টাম সমীকরণের প্রকৃত সমাধান বের করা যায় না। এমনিক, নিউটনের সহজ-সরল মহাকর্ষ তত্ত্ব থেকেও আমরা তিনটি বস্তুর গতির সমাধান বের করতে ব্যর্থ। বস্তুর সংখ্যা আরো বাড়লে এই কাজ হয়ে পড়ে আরো কঠিন, তত্ত্ব হয়ে পড়ে জটিল থেকে জটিলতর। বাস্তবে আসন্ন সমাধান (প্রকৃত সমাধানকে সরল করে কাছাকাছি একটি মান বের করা) দ্বারা কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু সকল কিছুর একীভূত তত্ত্ব পাওয়ার আকাশচুম্বী প্রত্যাশা তো এর মাধ্যমে পূরণ হয় না।

বর্তমানে আমরা জেনে ফেলেছি যে কোন সূত্রগুলো বস্তুর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তবে চরম অবস্থায় (extreme condition) এ সূত্রদের প্রভাব কী হবে তা জানা সম্ভব হয়নি। যেমন, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের সবগুলো মৌলিক সূত্র আমরা জানি। এর পরেও আমরা চূড়ান্তভাবে বলতে পারি না যে এদের সমাধান পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে। তার ওপর মানুষের আচরণকে গাণিতিক সমীকরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বলা চলে আমরা প্রায় ব্যর্থ। ফলে আমরা একগুচ্ছ মৌলিক সূত্র যদি পাইও, তবে তার আগে বহু বছর ধরে প্রচলিত সূত্রগুলো থেকে ক্রমেই বেশি নির্ভুল আসন্ন মান পাওয়ার মতো কঠিন কাজটি করে যেতে হবে। তাহলে আমরা বিভিন্ন ঘটনার জটিল ও বাস্তবে ক্ষেত্রে উপযোগী অনুমান তৈরি করতে পারব। একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসঙ্গত একীভূত তত্ত্ব পাওয়ার মাধ্যমে মাত্র এক ধাপ কাজ হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের অস্তিত্বসহ চারপাশে যেসব ঘটনা ঘটছে তার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান।

www.pathagar.com

অনুবাদকের নোট

১. ব্যাপারটা অনেকটা এ রকম : কল্পনা করুন যে কোন দিন কয়টায় সূর্য উঠবে আমরা তা জানি না, যার ফলে প্রতিদিন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় এটি কয়টায় ওঠে তা দেখার জন্য। বাস্তবে এটা আমরা জানি। সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের সময় বলার মতো তত্ত্ব আমাদের কাছে আছে। কিন্তু ইলেকট্রনের ভর বলার মতো তত্ত্ব নেই। এটা জানতে হয় পর্যবেক্ষণ থেকে। অর্থাৎ তথ্য পাওয়ার দুটো উৎস আছে। একটি হলো তত্ত্ব, আরেকটি হলো পর্যবেক্ষণ। অবশ্য পর্যবেক্ষণ থেকেই ধীরে ধীরে তত্ত্বের জন্ম হয়।

২. আমরা জানি, নক্ষত্রের জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় ধরে এর মধ্যে ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেনরা নিজেদের সাথে যুক্ত হয়ে হিলিয়াম হতে থাকে। এর ফলে তৈরি বাইরের দিকের চাপ নক্ষত্রের মহাকর্ষীয় টানকে প্রতিহত করে। কিন্তু এই ভারসাম্য বজায় থাকার পেছনে ইলেকট্রনের চার্জের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৩. দুই বা তিন ভরবিশিষ্ট হাইড্রোজেন, অর্থাৎ যথাক্রমে ডিউটেরিয়াম ও টিট্রিয়ামও স্থিতিশীল থাকত, কারণ এদের মধ্যেও প্রোটন একটি করেই থাকে, বেশি থাকে একটি করে নিউট্রন, যার কোনো চার্জ নেই বলে আকর্ষণ বা বিকর্ষণের মাধ্যমে পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা এর নেই।

৪. গ্লুওন (gluon) শব্দটির সাথে glue এর মিল আছে, যার অর্থ আঠা, বা আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো। যেহেতু এই কণাটি কোয়ার্কদের জোড়া লাগিয়ে নিউট্রন ও প্রোটন গঠন করে, তাই বলা যায় নামটি সার্থক হয়েছে।

৫. কারণ এর ওপরের দিকে একটি পৃষ্ঠ, আবার ভেতরের দিকেও আংটির ভাঁজের কারণে আরেকটি পৃষ্ঠ আছে।

৬. কিন্তু এমন তো হতেই পারে যে ঈশ্বর আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে সূত্র দিয়ে দেবার পর তিনি আর মহাবিশ্বের কোনো কর্মকাণ্ডে নাক গলাবেন না বা মন পরিবর্তন করবেন না, অন্তত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। অথবা এমনও হতে পারে যে তিনি যে পরে কিছু সময়ের জন্য আর নাক গলাবেন না বা মন পরিবর্তন করবেন না, এটাও সূত্রেরই অংশ হবে।

৭. গাণিতিক পরিসংখ্যানের ভাষায় সে ঘটনাকে দৈব বলা হয়, যেটি ঘটবে কি না নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, বড়জোর ঘটার একটি সম্ভাবনা বলা যাবে।

৮. অর্থাৎ, কোনো তত্ত্ব আসলে ঠিক কি না তা আমরা বলতে পারি না, আমরা শুধু বলতে পারি একে এখনো ভুল বলার মতো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়
উপসংহার

আমরা যে জগতে বাস করছি তা আসলে বড়ই অদ্ভুত। আমরা চারপাশে যা ঘটতে দেখছি তার ব্যাখ্যা জানার জন্য উদ্‌গ্রীব। মহাবিশ্বের স্বভাব কী রকম? এতে আমাদের অবস্থান কোথায়? মহাবিশ্ব এবং আমরা কোথা থেকে এলাম? আমরা যেমন দেখছি, সব কিছু কেনইবা এমন হলো?

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমরা জগৎ সম্পর্কে কিছু ধারণা তৈরি করি। সমতল একটি পৃথিবীকে বহুসংখ্যক কচ্ছপের টাওয়ারের মাথায় অবস্থিত বলে ধরে নেওয়াও এমন একটি ধারণা। আবার সুপারস্ট্রিং থিওরিও একটি ধারণা। দুটি থিওরিরই উদ্দেশ্য মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করা। কিন্তু আগেরটির চেয়ে পরেরটি অনেক বেশি গণিতনির্ভর এবং বেশি সূক্ষ্ম। কোনোটির পক্ষেই নেই পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ। কেউ কখনো এমন কোনো দৈত্যাকার কচ্ছপ দেখেনি, যে তার পিঠে পৃথিবীকে বসিয়ে রেখেছে। আবার কেউ কিন্তু কখনও সুপারস্ট্রিংও দেখেনি। কিন্তু কচ্ছপ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে কার্যকর নয়, কারণ এটি সঠিক হলে মানুষ পৃথিবীর প্রান্তে গিয়ে নিচে পড়ে যেত। আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে এমন কিছু দেখা যায় না, যদি না বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে হারিয়ে যাওয়া মানুষের ভাগ্যে এমনটি ঘটে থাকে![১]

মহাবিশ্বের ব্যাখ্যায় সর্বপ্রথম যে তত্ত্বটি দাঁড় করা হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে আত্মারা। এদের মধ্যে মানুষের মতো আবেগ আছে। এরা মানুষের স্টাইলেই কাজ করে, কিন্তু কখন যে কী করবে সেটা আগে থেকে বলা যায় না। এই আত্মাদের বাস বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুতে। এই যেমন নদী, পাহাড় এবং সূর্য ও চন্দ্রসহ আকাশের বস্তুরা। কৃষিজমির উর্বরতা ও ঋতুর পরিবর্তনের জন্য এই আত্মাদেরকে শান্ত রাখতে হতো এবং প্রার্থনা করতে হতো। আস্তে আস্তে

www.pathagar.com

দেখা গেল, সব কিছু নিয়ম মেনেই চলছে। দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ না করলেও সূর্য সব সময় পূর্ব দিকেই উঠছে এবং পশ্চিমে ডুবে যাচ্ছে। এ ছাড়াও সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহরা আকাশের নির্দিষ্ট পথ ধরে চলছে। আকাশের এসব ঘটনা আবার অনেকটা নির্ভুলভাবে আগে থেকেই বলা যায়। সূর্য ও চন্দ্র যদি দেবতাও হয় তবু তারা এমন দেবতা, যারা কিছু নিয়ম খুব শক্তভাবে মেনে চলে। এতে কোনো দৃশ্যমান ব্যতিক্রম চোখে পড়ছিল না, যদিও সূর্যের থেমে যাবার একটি ব্যতিক্রম গল্প দেখা যায় বাইবেলের জোশুয়ার গল্পে।

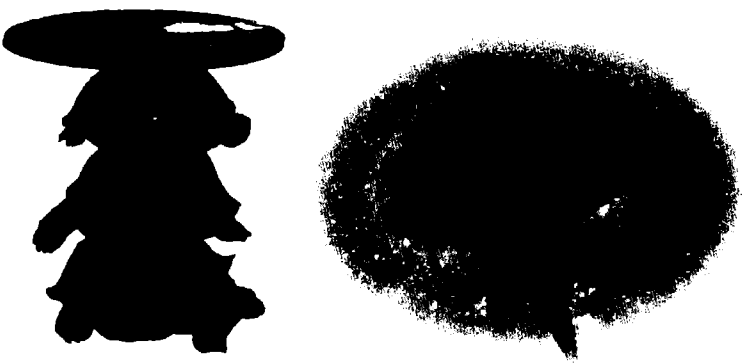

চিত্র : কাছিম থেকে বক্র স্থান
[মহাবিশ্বের প্রাচীন ও আধুনিক ধারণা]

এই নিয়ম ও সূত্রগুলো শুরুতে শুধু জ্যোতির্বিদ্যা ও এর বাইরের অল্প কিছু ক্ষেত্রে স্পষ্ট ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সভ্যতার উন্নতি হলে, বিশেষ করে গত তিন শতকে যে উন্নতি হলো, তাতে আরো বেশি সূত্র আবিষ্কৃত হলো। এই সূত্রগুলোর সাফল্যে মুগ্ধ হয়েই ঊনবিংশ শতকের শুরুতে ল্যাপ্লাস বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তাবাদ (scientific determinism) প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি বললেন, এমন কিছু সূত্র থাকবে, যা দ্বারা কোনো এক সময়ের মহাবিশ্বের অবস্থা জেনে ফেলার পর সঠিকভাবে এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করা যাবে।

ল্যাপ্লাসের নিশ্চয়তাবাদ দুটি কারণে অসম্পূর্ণ ছিল। প্রথমত, এতে বলা ছিল না যে সূত্রগুলো কীভাবে বাছাই করা হবে। দ্বিতীয়ত, এটি মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থাও নির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি। কাজগুলো রেখে দেওয়া হয়েছিল ঈশ্বরের জন্য। ঈশ্বরই ঠিক করবেন কীভাবে মহাবিশ্বের শুরু হবে

www.pathagar.com

এবং একে কোন সূত্রগুলো মেনে চলতে হবে। একবার মহাবিশ্বের শুরু হয়ে গেলে ঈশ্বর আর এই সূত্রগুলোতে নাক গলাবেন না। সত্যি বলতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান যা বুঝতে পারেনি তা ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

আমরা এখন জানি যে বাস্তবে ল্যাপ্লাসের নিশ্চয়তাবাদ সম্ভব নয়, অন্তত তিনি যে ভাষায় বুঝতেন সেই অর্থে তো নয়ই। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনিশ্চয়তা নীতি বলছে, কিছু জোড়া রাশি যেমন, অবস্থান ও বেগ, একই সাথে পুরোপুরি নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে কোয়ান্টাম মেকানিক্স একগুচ্ছ কোয়ান্টাম সূত্র দিয়ে কাজ করে, যাতে কণিকাদের সুনির্দিষ্ট কোনো অবস্থান ও বেগ থাকে না। বরং এদেরকে বিবেচনা করা হয় তরঙ্গ হিসেবে। এই কোয়ান্টাম থিওরিগুলো এই অর্থে 'পূর্বনির্ধারিত' যে এদের মাধ্যমে সময়ের সাথে সাথে তরঙ্গের পরিবর্তন জানা যায়। কাজেই আমরা কোনো একসময়ে তরঙ্গের অবস্থা জেনে নিয়ে অন্য সময়ে এর অবস্থা বের করতে পারি। অনুমানের অতীত এবং অনিয়মতান্ত্রিক ঘটনা তখনই ঘটে, যখন আমরা তরঙ্গকে কণার অবস্থান ও বেগের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করি। কিন্তু হতে পারে আমরা ভুল করছি। হয়তো কণিকাদের কোনো বেগ বা অবস্থান নেই, আছে শুধুই তরঙ্গ। হয়তো আমরা আমাদের মনে আসন গেঁড়ে থাকা অবস্থান ও বেগের পূর্বধারণা দিয়ে তরঙ্গকে বুঝতে চাচ্ছি। এতে করে বাস্তবতার সাথে যে অমিল তৈরি হয় তার ফলেই আমরা অননুমেয়তার (unpredictability) সম্মুখীন হই।

ফলে আমরা বিজ্ঞানের দায়িত্ব কী হবে তা নতুন করে ঠিক করেছি। এর কাজ হবে অনিশ্চয়তা নীতির সীমার মধ্যে থেকেই কোনো ঘটনা সম্পর্কে অনুমান করতে পারার মতো সূত্র আবিষ্কার করা। প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে : কীভাবে ও কেন মহাবিশ্বের সূত্রগুলো এবং আদি অবস্থা বাছাই করা হয়েছিল?

এই বইয়ে মহাকর্ষ সূত্রের দিকে একটু বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর কারণ, এই মহাকর্ষই মহাবিশ্বের বড় স্কেলের কাঠামো নির্ধারণ করে, যদিও চার প্রকারের বলের মধ্যে এটিই সবচেয়ে দুর্বল। কিছুদিন আগ পর্যন্ত ও যে অপরিবর্তনশীল মহাবিশ্বের ধারণা প্রচলিত ছিল, তা মহাকর্ষীয় সূত্রের সাথে খাপ খাচ্ছিল না। যেহেতু মহাকর্ষ সব সময় আকর্ষণ করে, তাই মহাবিশ্ব হয় প্রসারিত নয়তো সঙ্কুচিত হতে থাকবে। সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব

www.pathagar.com

অনুসারে অসীম ঘনত্বের একটি পরিবেশ নিশ্চয়ই ছিল। এখান থেকে বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে সময়ের শুরু। একইভাবে মহাবিশ্ব গুটিয়ে গেলে ভবিষ্যতে আবারো অসীম ঘনত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে সময় বিলুপ্ত হবে। এই ঘটনাকে বলা হয় বিগ ক্রাঞ্চ (big crunch) বা মহা ধস। যদি মহাবিশ্বের পুরোটা নাও গুটিয়ে যায়, তবু নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল গুটিয়ে ব্ল্যাকহোল তৈরির মাধ্যমে সিঙ্গুলারিটি তৈরি হবে। বিগ ব্যাং ও অন্য সিঙ্গুলারিটিগুলোতে সবগুলো সূত্র অকার্যকর হয়ে পড়বে। ফলে মহাবিশ্বের শুরু কীভাবে হবে বা কী ঘটবে তাতে ঈশ্বরের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের সাথে মিশ্রিত করলে নতুন একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়, যা আগে ছিল না। স্থান ও কাল মিলিত হয়ে হয়তো এমন একটি সসীম ও চতুর্মাত্রিক স্থান তৈরি হতে পারে, যাতে কোনো সিঙ্গুলারিটি বা সীমান্ত নেই। এটা হবে পৃথিবীর পৃষ্ঠের মতো, তবে মাত্রা হবে আরো বেশি। দেখা যাচ্ছে এই পদ্ধতিতে মহাবিশ্বের অনেকগুলো পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। যেমন গ্যালাক্সি, নক্ষত্র এবং মানুষ ইত্যাদিসহ বড় দৈর্ঘ্যের হিসাবে মহাবিশ্ব সব দিকে একই রকম দেখায় কেন এবং ছোট স্কেলে কেন এটি এই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মহাবিশ্ব যদি হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ (self- contained), যেখানে কোনো সিঙ্গুলারিটি বা সীমান্ত (প্রান্ত) থাকবে না এবং যাকে একটি একীভূত থিওরি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে, তাতে স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরের ভূমিকা হবে আলোচনাসাপেক্ষ।

আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন, 'মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় ঈশ্বরের স্বাধীনতা কতটুকু ছিল?' যদি স্ট্রিং থিওরির ভাষ্য সঠিক হয় এবং আসলেই প্রান্ত না থাকে তাহলে আদি অবস্থা বাছাই করার ক্ষেত্রে করতে ঈশ্বর স্বাধীন ছিলেন না। এর পরেও অবশ্য ঈশ্বর নিজের ইচ্ছেমতো মহাবিশ্বের জন্য সূত্রগুলো তৈরি করার স্বাধীনতা রাখেন। অবশ্য এই স্বাধীনতা হয়তো খুব বেশি ছিল না। হতে পারে মাত্র একটি অথবা স্ট্রিং থিওরির মতো অল্প কিছুসংখ্যক পূর্ণাঙ্গ একীভূত তত্ত্ব আছে, যেগুলো সুসঙ্গত[২] এবং মানুষের মতো জটিল প্রাণীর সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করে, যারা মহাবিশ্বের সূত্রগুলো নিয়ে গবেষণা করে এবং ঈশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন করে।

আর যদি মাত্র একটি সম্ভাব্য একীভূত তত্ত্বই থেকে থাকে, তবে তাও হবে কিছু নিয়ম ও সমীকরণের সমাবেশ। সেই সমীকরণগুলোকে বাস্তবে নিয়ে এসে তাদেরকে মেনে চলার মতো মহাবিশ্ব কে তৈরি করবে।

www.pathagar.com

গাণিতিক মডেল তৈরির প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে ব্যর্থ যে কেন কোনো একটি মডেলকে মেনে চলার মতো একটি মহাবিশ্ব থাকবে। মহাবিশ্বের অস্তিত্বই থাকবে কেন? একীভূত তত্ত্ব কি এতটা শক্তিশালী যে এটি নিজেই নিজেকে তৈরি করে। অথবা এর কি স্রষ্টার প্রয়োজন আছে এবং যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে মহাবিশ্বের উপর কি তাঁর অন্য কোনো প্রভাব আছে[৩]? এবং তাহলে তাঁকে কে সৃষ্টি করেছে?[৪]

এখন পর্যন্ত বেশির ভাগ বিজ্ঞানী মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম এমন নতুন তত্ত্ব তৈরি করতে গিয়ে এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে এই কেন জাতীয় প্রশ্নগুলো করার সময় তাঁদের হয় না। অন্যদিকে এই কেন জাতীয় প্রশ্ন করার কাজ যারা করেন, সেই দার্শনিকরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দার্শনিকরা বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের পুরো ক্ষেত্রকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করতেন। মহাবিশ্বের শুরু আছে কি নেই–এই জাতীয় প্রশ্নগুলো করতেন। কিন্তু উনিশ ও বিশ শতকে এসে বিজ্ঞান এতটা টেকনিক্যাল ও গণিত নির্ভর হয়ে পড়েছে যে অল্প কিছু বিশেষজ্ঞ ছাড়া দার্শনিক বা অন্য কারো পক্ষে তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়েছে। দার্শনিকরা তাঁদের প্রশ্নের জগৎকে এতটা সীমিত করে ফেলেছেন যে বিংশ শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক ভিটজেনস্টাইন বলেছিলেন, 'দার্শনিকদের জন্য ভাষা নিয়ে গবেষণা করা ছাড়া আর কিছুই বাকি রইল না।' দর্শনের ঐতিহ্য অ্যারিস্টটলের থেকে কান্ট পর্যন্ত এসে এভাবেই মুখ থুবড়ে পড়ল!

যদি আমরা একটি একীভূত তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারি, তবে সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝার উপযোগী হতে হবে, শুধু কিছু বিজ্ঞানীকে বুঝলেই চলবে না। তখন বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং সাধারণ মানুষ–সবাই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন। আমরা যদি এই উত্তর পাই, তবেই তা হবে মানুষের বুদ্ধির জগতের চূড়ান্ত বিজয়, কারণ তখনই আমরা ঈশ্বরের মন (mind of God) জানতে পারব।

www.pathagar.com

অনুবাদকের নোট

১. বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের অধিকাংশ রহস্যই আসলে রহস্য না। এখানে যে পরিমাণ দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এত বেশি হারে জাহাজ বা বিমান চলাচল করা একটি এলাকার জন্য খুবই স্বাভাবিক। ২০১৩ সালে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর ন্যাচার নৌযান চলাচলের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রধান দশটি জলপথের তালিকা তৈরি করে। এই তালিকায় বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের স্থান হয়নি। আমেরিকান নেভির মতে এমন কোনো অঞ্চলের বাস্তবে অস্তিত্বই নেই। এমন না যে লেখকদ্বয় বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে বিশ্বাসী বরং তাঁরা একটুখানি রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারেননি।

২. অর্থাৎ এমন কোনো অংশ নেই, যাতে অন্য কোনো অংশের সাথে অমিল আছে।

৩. অর্থাৎ একবার সৃষ্টি করে ফেলার পর পরে আর মহাবিশ্বে হস্তক্ষেপ করেন কি না।

৪. অনেক সময় এই সমস্যার জবাব দেওয়া হয় এভাবে যে সৃষ্টিকর্তার সংজ্ঞাই হলো, তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি। যেমন একজন চিত্রকর (painter) একটি ছবি আঁকল। ছবি সম্পর্কে প্রশ্ন করা যায় যে একে কে এঁকেছে। কিন্তু চিত্রকর সম্পর্কে বলা যায় না যে বা চিত্রকরকে কে এঁকেছে? চিত্রকরের জন্য 'আঁকা' শব্দটা প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

www.pathagar.com

পরিভাষা

(বাংলা বর্ণ অনুসারে সাজাতে গিয়ে মূল পরিভাষাগুলোর ক্রমানুসার পরবর্তন হয়েছে। ব্র্যাকেটের কথাগুলো অনুবাদকের যোগ করা। * চিহ্নিত পরিভাষাগুলো অনুবাদকের যোগ করা। -অনুবাদক)

অনিশ্চয়তা নীতি (Uncertainty principle) : হাইজেনবার্গের প্রদান করা এই নীতি যে, কোনো কণিকার অবস্থান ও বেগ একই সাথে নিশ্চিত করে জানা সম্ভব নয়। এর একটি যত বেশি নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা হবে, অপরটি সম্পর্কে পাওয়া তথ্য ততই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

*** অবলোহিত আলো বা বিকিরণ (infrared light) :** যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশি এবং মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের তুলনায় কম। দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যই সর্বোচ্চ।

আইনস্টাইন-রোজেন সেতু (Einstein-Rosen bridge) : স্থান-কালের একটি সরু নল, যা দুটি ব্ল্যাকহোলকে যুক্ত করে। আরো দেখুন, *ওয়ার্মহোল*।

*** আবর্তন (rotation) :** কোনো বস্তুর নিজের অক্ষের সাপেক্ষে যে ঘূর্ণন তাকে আবর্তন বলে। যেমন আপনি যদি একটি বল বা গ্লোবকে হাতের তালুতে নিয়ে ঘোরাতে থাকেন, অথবা একটি কয়েনকে টোকা দিয়ে পাক খাওয়াতে থাকেন, তবে এদের আবর্তন হবে। আরো দেখুন, *প্রদক্ষিণ*।

আলোকবর্ষ (light-year) : আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে। (মনে রাখতে হবে, এটিসহ আলোক-সেকেন্ড এবং এই জাতীয় এককগুলো দূরত্বের একক, সময়ের নয়। আলোর বেগ হলো, সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল।)

www.pathagar.com

আলোক-সেকেন্ড (Light-second) : আলো এক সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে।

অ্যানথ্রোপিক নীতি (Anthropic principle) : এই ধারণা যে, আমরা মহাবিশ্বকে এখন যেমন দেখছি এর এমন হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে, এটি যদি এমন না হতো তাহলে একে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে আমরা এখানে থাকতামই না।

ইলেকট্রন (Electron) : নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘূর্ণনরত ঋণাত্মক চার্জধারী কণিকা।

ইলেকট্রিক চার্জ বা তড়িৎ আধান (Electric charge) : কণিকার এমন ধর্ম যার মাধ্যমে এটি বিপরীত চার্জধারী অন্য কণিকাকে আকর্ষণ করে এবং একই রকম চার্জধারী কণিকাকে বিকর্ষণ করে।

ইলেকট্রোউইক ইউনিফিকেশন এনার্জি (Electroweak unification energy) : শক্তির যে পরিমাণকে (প্রায় ১০০ গিগা ইলেকট্রোভোল্ট) ছাড়িয়ে গেলে তড়িচ্চুম্বকীয় বল এবং দুর্বল নিউক্লিয়ার বলের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

ওজন (Weight) : মহাকর্ষীয় (বা অভিকর্ষীয়) ক্ষেত্র দ্বারা কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল। এটি ভরের সমানুপাতিক কিন্তু সমান নয়। (* আমরা সাধারণত যাকে ওজন বলি, সেটি আসলে ভর। ভরের সাথে অভিকর্ষীয় ত্বরণ গুণ করলে ওজন পাওয়া যায়)। আরো দেখুন, *অভিকর্ষীয় ত্বরণ*।

ওয়ার্মহোল (Wormhole) : মহাবিশ্বের দূরবর্তী দুটি অঞ্চলের সংযোগ প্রদানকারী একটি পাতলা টিউব বা সুড়ঙ্গ। ওয়ার্মহোলের অপর প্রান্তে সমান্তরাল বা শিশু মহাবিশ্ব থাকতে পারে, যার মাধ্যমে সময় ভ্রমণ সম্ভব হতে পারে।

কণা ত্বরকযন্ত্র (Particle accelerator) : যে মেশিনের সাহায্যে ইলেকট্রোম্যাগনেট বা তড়িচ্চুম্বক ব্যবহার করে বেশি শক্তি দিয়ে দিয়ে গতিশীল চার্জধারী কণিকাদের বেগ বৃদ্ধি করা যায়।

কণা-তরঙ্গ দ্বৈততা (Wave/particle duality) : কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এই নীতি যে, কণা ও তরঙ্গের মধ্যে কোনো পার্থক্য

www.pathagar.com

নেই। কোনো সময় কণা আচরণ করে তরঙ্গের মতো, আবার কখনো তরঙ্গ কণার মতো আচরণ করে।

কসমোলজি বা মহাবিশ্বতত্ত্ব (Cosmology) : সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্ব নিয়ে আলোচনা করা হয় যে শাস্ত্রে।

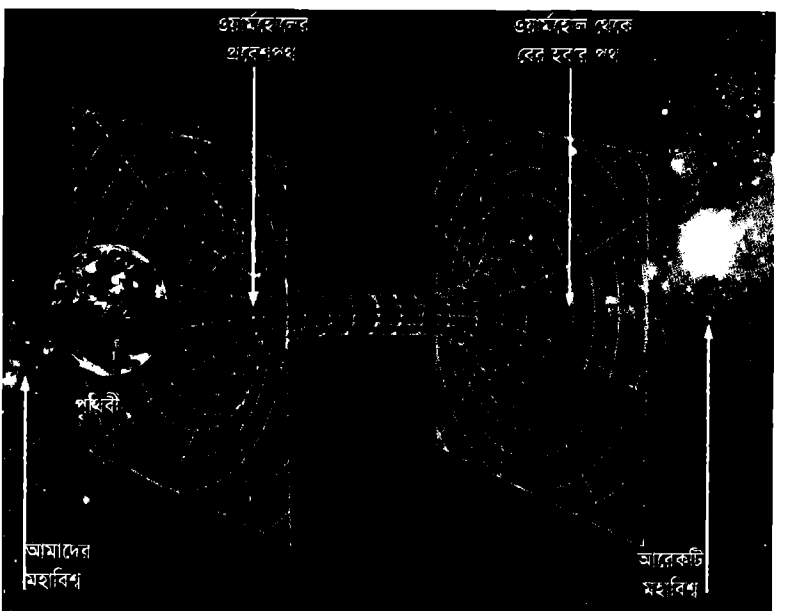

চিত্র : ওয়ার্মহোল। (অনুবাদকের যোগ করা)

কোয়ান্টাম (Quantum) : কোনো পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ায় বস্তুর সর্বনিম্ন যে পরিমাণ অংশ নিতে পারে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স (Quantum mechanics) : প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম নীতি ও হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি থেকে প্রস্তুত তত্ত্ব।

কোয়ার্ক (Quark) : একটি চার্জধারী মৌলিক কণিকা, যা সবল নিউক্লিয়ার বল অনুভব করে। প্রোটন ও নিউট্রন দুটি কণিকাই তিনটি করে কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত।

কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকুয়েন্সি (Frequency) : কোনো তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো চক্র বা কম্পন সম্পন্ন করে।

www.pathagar.com

ক্ষেত্র (Field) : এমন কিছু যা স্থান-কাল জুড়ে বিস্তৃত থাকে। এটি কণিকার বিপরীত, যা নির্দিষ্ট কোনো সময়ে শুধু একটি বিন্দুতেই অবস্থান করে।

গামা রশ্মি (Gamma rays) : খুব ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মি। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বা মৌলিক কণিকাদের সংঘর্ষের ফলে এটি উৎপন্ন হয়। আরো দেখুন, *তেজস্ক্রিয়তা*।

গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি বা মহা-সমন্বয় তত্ত্ব (Grand unified theory বা GUT) : যে তত্ত্ব তড়িচ্চুম্বকীয় এবং সবল ও দুর্বল নিউক্লিয়ার বলকে একীভূত করে।

ঘটনা (Event) : স্থান-কালের উপরস্থ এমন কোনো বিন্দু, যাতে সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করে বলা আছে।

ঘটনা দিগন্ত (Event horizo) : ব্ল্যাক হোলের সীমানা (ব্ল্যাকহোলের চারপাশের যে অঞ্চলের বাইরে আলো আসতে পারে না)।

চৌম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড (Magnetic field) : চৌম্বক বলের জন্য দায়ী ক্ষেত্র। তড়িৎ ক্ষেত্রের (electric field) সাথে সমন্বিত হয়ে এটি এখন তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের অংশ।

*** ছায়াপথ (galaxy) :** মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধ অনেকগুলো নক্ষত্র, আন্তনাক্ষত্রিক মেঘ, নাক্ষত্রিক ধ্বংসাবশেষ ও ডার্ক ম্যাটারের সমাবেশ নিয়ে তৈরি সর্পিল, উপবৃত্তাকার বা অনিয়মিত আকারের মহাজাগতিক কাঠামো।

*** জড়তা (inertia) :** কোনো বস্তু যে অবস্থায় আছে সে অবস্থার থাকতে চাওয়ার প্রবণতা। গতিশীল বস্তুর গতিশীল থাকার প্রবণতা হলো গতি জড়তা, আর স্থির বস্তুর স্থির থাকতে চাওয়ার প্রবণতা হলো স্থিতি জড়তা। ভরের একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয় জড়তার পরিমাপের মাধ্যমে। যে বস্তুর ভর যত বেশি, তার জড়তাও তত বেশি হবে।

ডার্ক ম্যাটার (Dark matter) : গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সিপুঞ্জ ও এদের মাঝে অবস্থিত সেসব বস্তু, যাদেরকে এখনো সরাসরি দেখা সম্ভব হয়নি, কিন্তু মহাকর্ষীয় প্রভাবের কারণে এদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। মহাবিশ্বের অন্তত ৯০ ভাগ ভরই ডার্ক ম্যাটার।

www.pathagar.com

তড়িচ্চুম্বকীয় বল (Electromagnetic force) : ইলেকট্রিক চার্জধারী কণিকাদের মধ্যে যে বল কাজ করে। চার প্রকার মৌলিক বলের মধ্যে শক্তিতে এটি দ্বিতীয়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wavelength) : কোনো তরঙ্গের পাশাপাশি অবস্থিত দুটি চূড়া বা খাঁজের মধ্যে দূরত্ব।

তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity) : কিছু কিছু পরমাণু নিজেই নিজেই অন্য পরমাণুতে পরিণত হবার যে প্রক্রিয়া।

দশা (Phase) : নির্দিষ্ট সময়ে কোনো তরঙ্গের অবস্থান। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে তরঙ্গের অবস্থান কি খাঁজে, চূড়ায় নাকি এই দুইয়ের মাঝে অন্য কোথাও আছে।

দুর্বল নিউক্লিয়ার বল (Weak force) : চার প্রকার মৌলিক বলের মধ্যে দ্বিতীয় দুর্বল বল। এটি মহাকর্ষের চেয়ে শক্তিশালী। এরও পাল্লা খুব ছোট। এটি যেকোনো বস্তু কণাকে আকর্ষণ করে, তবে বলবাহী কণিকাকে আকর্ষণ করে না। (একে সংক্ষেপে বলা হয় দুর্বল বল।)

নিউক্লিয়ার ফিউশন (Nuclear fusion) : যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস সংঘর্ষের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটিমাত্র ভারী নিউক্লিয়াস গঠন করে।

নিউক্লিয়াস (Nucleus) : পরমাণুর কেন্দ্রীয় অংশ। এতে সবল বলের মাধ্যমে প্রোটন ও নিউট্রন যুক্ত থাকে।

নিউট্রন (Neutron) : অনেকটা প্রোটনের মতোই একটি কণিকা, তবে এতে কোনো চার্জ নেই। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রায় অর্ধেক কণিকা এই নিউট্রন দিয়ে পূর্ণ থাকে।

নিউট্রন নক্ষত্র (Neutron star) : সুপারনোভা বিস্ফোরণের পরে অনেক সময় যে শীতল অংশ বাকি থেকে যায়। এটি ঘটে যখন কোনো নক্ষত্রের কেন্দ্রভাগের বস্তু গুটিয়ে নিউট্রনের ঘন ভরের বস্তুতে পরিণত হয়। (এর মহাকর্ষ এতটা শক্তিশালী যে ইলেকট্রন ও প্রোটন এক হয়ে গিয়ে পুরোটা চার্জহীন নিউট্রনে পরিণত হয়।) আরো দেখুন, *নিউট্রন*।

নিউট্রিনো (Neutrino) : একটি অসম্ভব হালকা কণিকা, যা শুধু মহাকর্ষ এবং দুর্বল নিউক্লিয়ার বল দ্বারা প্রভাবিত হয়।

www.pathagar.com

জিওডেসিক (Geodesic) : দুটি বিন্দুর মধ্যে সর্বনিম্ন (বা সর্বোচ্চ) পথ। (গোলকের মতো ধনাত্মক বক্রতার ক্ষেত্রে এটি হবে সর্বনিম্ন পথ। আর ঘোড়ার জিনের মতো আকৃতির বস্তুর ঋণাত্মক বক্রতার ক্ষেত্রে এটি হবে সর্বোচ্চ দূরত্ব)

ত্বরণ (Acceleration) : যে হারে (সময়ের পরিবর্তনের সাথে) কোনো বস্তুর বেগ পরিবর্তন হয়।

দ্বৈততা (duality) : আপাত দৃষ্টিতে আলাদা হলেও একই ফলাফল প্রদান করা দুটো তত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক। আরো দেখুন, কণা-তরঙ্গ দ্বৈততা।

পজিট্রন (Positron) : ইলেকট্রনের ধনাত্মক চার্জধারী প্রতিকণিকা। আরো দেখুন : *প্রতিকণিকা*।

পরম শূন্য তাপমাত্রা (Absolute zero temperature) : সর্বনিম্ন সম্ভাব্য সেই তাপমাত্রা, যাতে বস্তুর কোনো তাপ শক্তি থাকে না।

পরমাণু (Atom) : সাধারণ বস্তুর মৌলিক একক। এতে একটি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসের (প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে তৈরি) চারপাশে ইলেকট্রনরা কক্ষপথে ঘুরতে থাকে।

প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম নীতি (Planck's quantum principle) : এই ধারণা যে, আলো (বা অন্য যেকোনো প্রচলিত তরঙ্গ) শুধু বিচ্ছিন্ন কোয়ান্টা আকারে নির্গত হয়, যার শক্তি এর কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক। আরো দেখুন : *সমানুপাতিক* ও *ব্যস্তানুপাতিক*।

প্রতিকণিকা (Antiparticle) : বস্তুর প্রতেকটি কণিকার বিপরীতে একটি প্রতিকণিকা আছে (*যার চার্জ ছাড়া আর সব ধর্ম কণিকার মতোই। যেমন ইলেকট্রনের প্রতিকণিকা পজিট্রন, যার চার্জ +১।)। কণিকা ও প্রতিকণিকার মধ্যে সংঘর্ষ হলে দুটিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, বিনিময়ে পাওয়া যায় শক্তি।

প্রান্তহীনতার শর্ত (No-boundary condition) : এই ধারণা যে, মহাবিশ্বের সাইজ নির্দিষ্ট কিন্তু এর কোনো সীমানা বা প্রান্ত নেই।

প্রোটন (Proton) : প্রায় নিউট্রনের মতোই একটি কণিকা। কিন্তু এর রয়েছে ধনাত্মক চার্জ। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের কণিকাদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যকই এরা।

www.pathagar.com

ফোটন (Photon) : আলোর একটি কোয়ান্টাম। আরো দেখুন : *কোয়ান্টাম*।

বর্ণালি (Spectrum) : একটি তরঙ্গের উপাদান কম্পাঙ্কগুলো। সৌরবর্ণালির দৃশ্যমান অংশ রংধনুতে দেখা যায়।

বিগ ব্যাং (Big bang) : মহাবিশ্বের শুরুতে যে সিঙ্গুলারিটি ছিল। আরো দেখুন, সিঙ্গুলারিটি।

বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব (Special relativity) : মহাকর্ষের অনুপস্থিতিতে যেকোনো বেগে গতিশীল সকল পর্যবেক্ষকের কাছে বিজ্ঞানের সূত্রগুলো একই থাকবে–এই নীতির ভিত্তিতে তৈরি আইনস্টাইনের থিওরি। (কাল দীর্ঘায়ন, দৈর্ঘ সঙ্কোচন, ভর-শক্তি সমতুল্যতা ইত্যাদি এই তত্ত্বের ফসল।)। আরো দেখুন, *সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব*।

*** বিষুব রেখা (equator) :** পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মাঝ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে কল্পিত রেখা।

ব্যস্তানুপাতিক (inversely proportional) : X, Y এর ব্যস্তানুপাতিক হলে এর অর্থ হচ্ছে Y কে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে X-কে সেই সংখ্যা দ্বারা ভাগ দেওয়া হচ্ছে। (অর্থাৎ, Y যত গুণ বাড়বে, X তত গুণ কমে যাবে। যেমন Y দ্বিগুণ হলে X হয়ে যাবে অর্ধেক। Y তিন গুণ হলে X হবে তিন ভাগের এক ভাগ। তবে যদি বলা হয় X, Y এর বর্গের ব্যস্তানুপাতিক, তাহলে Y দ্বিগুণ হলে X হবে চার ভাগের এক ভাগ।) আরো দেখুন, *সমানুপাতিক*।

ব্ল্যাক হোল (Black hole) : স্থান-কালের এমন অঞ্চল যেখানে মহাকর্ষ এত শক্তিশালী যে এখান থেকে কোনো কিছুই বের হয়ে আসতে পারে না, এমনকি আলোও না। (বাংলা নাম কৃষ্ণগহ্বর বা কৃষ্ণবিবর)

ভর (Mass) : কোনো বস্তুতে উপস্থিত পদার্থের পরিমাণ অথবা বস্তুর জড়তা এবং ত্বরণের প্রতি বাধা।

ভার্চুয়াল কণিকা (Virtual particle) : যে কণবিকাদেরকে সরাসরি দেখা যায় না, কিন্তু পরিমাপযোগ্য প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

মহাজাগতিক ধ্রুবক (Cosmological constant) : স্থান-কালের সহজাত ধর্মই হচ্ছে প্রসারিত হওয়া–এমন ব্যাখ্যা দেবার জন্য আইনস্টাইনের উদ্ভাবিত গাণিতিক ধ্রুবক। (পরে দেখা গিয়েছিল এই ধ্রুবক আনা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। কিন্তু এখন আবার এর প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে)।

মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ (Microwave background radiation) : আদি উত্তপ্ত মহাবিশ্ব থেকে নির্গত বিকিরণ। বর্তমানে এর এত বেশি লাল সরণ হয়েছে যে একে আর আলো হিসেবে দেখা যায় না, পাওয়া যায় মাইক্রোওয়েভ হিসেবে। মাইক্রোওয়েভ হলো কয়েক সেন্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ। আরো দেখুন, *লাল সরণ*।

মৌলিক কণিকা (Elementary particle) : এমন কণিকা যাকে আর ভাঙা যায় না বলে বিশ্বাস করা হয়।

রেডার (Radar) : বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের যন্ত্র। যন্ত্র থেকে প্রেরিত সঙ্কেত বস্তুতে পৌঁছে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে যে সময় লাগে তা কাজে লাগিয়ে দূরত্ব বের করা হয়।

লাল বা লোহিত সরণ (Red shift) : ডপলার ক্রিয়ার কারণে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া নক্ষত্রের আলোকে লাল দেখা।

সবল নিউক্লিয়ার বল (Strong force) : চার প্রকারের মৌলিক বলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বল। তবে এর পাল্লা সবচেয়ে ছোট (বেশি দূর পর্যন্ত এর প্রভাব কাজ করে না)। এটি কোয়ার্কদেরকে যুক্ত করে প্রোটন ও নিউট্রন এবং প্রোটন ও নিউট্রনকে যুক্ত করে পরমাণু গঠন করে। একে সংক্ষেপে সবল বলও বলা হয়।

সমানুপাতিক (Proportional) : X, Y এর সমানুপাতিক হলে এর অর্থ হচ্ছে ণ কে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হলে X কেও সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হবে (এর অর্থ হবে Y যে হারে বাড়বে X ও সেই হারে বাড়বে। তবে যদি বলা হয় X, Y এর বর্গের সমানুপাতিক, তবে ণ দ্বিগুণ হলে X চার গুণ হবে; Y তিন গুণ হলে X নয় গুণ হবে ইত্যাদি।) আরো দেখুন, ব্যস্তানুপাতিক।

www.pathagar.com

সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব (General relativity) : যেকোনো গতিতে চলা পর্যবেক্ষকের কাছে বিজ্ঞানের সূত্রগুলো একই হবে–এই ধারণার ভিত্তিতে তৈরি আইনস্টাইনের থিওরি। এই থিওরি মহাকর্ষকে চতুর্মাত্রিক স্থান-কালের সাহায্যে প্রকাশ করে। (বাংলায় সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বও বলা হয়। তবে সার্বিক বলাই বেশি সঠিক)

সিঙ্গুলারিটি (Singularity) : স্থান-কালের এমন বিন্দু যেখানে স্থান-কালের বক্রতা (অথবা অন্য কোনো বস্তুগত রাশি) অসীম হয়। (বাংলায় একে অনন্যতাও বলা হয়।)

স্ট্রিং থিওরি (String theory) : পদার্থবিদ্যার সেই তত্ত্ব, যাতে বিভিন্ন কণিকাকে স্ট্রিং (তার, সুতা বা দড়ি) এর কম্পন মনে করা হয়। স্ট্রিং-এর শুধু দৈর্ঘ্য আছে, অন্য কোনো মাত্রা (উচ্চতা বা প্রস্থ) নেই।

স্থানাংক (Coordinates) : স্থান ও কালের মধ্যে কোনো বিন্দুর অবস্থান প্রকাশ করতে যে সংখ্যাগুলো প্রয়োজন।

স্থান-কাল (Space-time) : চতুর্মাত্রিক স্থান, যার বিন্দুগুলোকে ঘটনা বলা হয়।

স্থানিক মাত্রা (Spatial dimension) : সময় ছাড়া অন্য তিন মাত্রার যেকোনোটি।

www.pathagar.com

আলবার্ট আইনস্টাইন

নিউক্লিয়ার বোমার রাজনীতির সাথে আইনস্টাইনের সম্পর্ক প্রায় সবার জানা। ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের কাছে লেখা একটি বিখ্যাত চিঠিতে তিনি স্বাক্ষর করেন। এতে তিনি আমেরিকাকে পারমাণবিক বোমার বিষয়টি গুরত্বের সাথে দেখার প্রস্তাব দেন। কিন্তু যুদ্ধের পরে তিনি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করার প্রচেষ্টায় অংশ নেন। কিন্তু একজন বিজ্ঞানীর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার পেছনে এ কাজগুলো নিছক বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। আইনস্টাইনের নিজের ভাষায় বললে তাঁর 'জীবনটা রাজনীতি ও সমীকরণের মধ্যে বিভক্ত' ছিল।

তাঁর প্রথম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। তখন তিনি জার্মানির বার্লিনে প্রফেসরগিরি করছেন। মানুষের প্রাণের অপচয় দেখে তিনি যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে জড়িয়ে পড়েন। আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও জোর করে সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তির বিরোধিতার কারণে তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে ভালো চোখে দেখেননি। যুদ্ধের পরে তিনি সমঝোতা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। কিন্তু এই কাজে তিনি খুব বেশি সাড়া পাননি। বরং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক মতের কারণে তাঁর পক্ষে নিছক লেকচার দেবার জন্য হলেও আমেরিকা যাওয়া কঠিন হয়ে গেল।

আইনস্টাইনের মনের আরেক অংশ ঝুঁকে ছিল জায়োনিজমের প্রতি। তিনি বংশীয়ভাবে ইহুদি হলেও বাইবেলের ঈশ্বরের ধারণার সাথে একমত ছিলেন না। (বাইবেল দুই অংশে বিভক্ত–ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট। এই ওল্ড টেস্টামেন্ট ইহুদি ও খ্রিস্টান–দুই ধর্মের লোকদেরই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। নিউ টেস্টামেন্ট শুধু খ্রিস্টানদের। –অনুবাদক) কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অ্যান্টি-সেমিটিজমের (ইহুদিদের বিরোধিতা) তীব্রতা বাড়তে থাকলে তিনি ইহুদি সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে লাগলেন এবং পরবর্তীতে জায়োনিজমের জাঁদরেল সমর্থকে পরিণত হন। আরো

www.pathagar.com

একবার জনপ্রিয়তার অভাব তাঁকে মনের কথা ঘোষণা করতে বাধা দিতে ব্যর্থ হলো। তাঁর থিওরিকেও আক্রমণ করা হলো। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে একটি সংগঠন দাঁড় করানো হয়। আইনস্টাইনকে মারার জন্য মানুষকে উত্তেজিত করায় একজন লোকের সাজা হয় (এবং মাত্র ছয় ডলার জরিমানা হয়)। কিন্তু আইনস্টাইন এসবকে পাত্তা দিতেন না। তাঁর বিরুদ্ধে বই ছাপা হলো, 'আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে ১০০ লেখক', আর তিনি জবাবে বললেন, 'আমি যদি ভুল হতাম, তবে একজনই যথেষ্ট হতো।'

১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসে। এ সময় আইনস্টাইন ছিলেন আমেরিকায়। তিনি বললেন যে জার্মানিতে ফিরে যাবেন না। নাৎসি রক্ষীবাহিনী তাঁর বাড়িতে অভিযান পরিচালনা ও তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করলে বার্লিনের একটি পত্রিকা লিখল, আইনস্টাইনের পক্ষ থেকে সুসংবাদ– 'তিনি ফিরে আসছেন না।' নাৎসিদের হুমকির মুখে তিনিও শান্তির পথ পরিত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত জার্মান বিজ্ঞানীরা নিউক্লিয়ার বোমা বানিয়ে ফেলবে এই চিন্তায় আমেরিকাকেও নিজস্ব বোমা বানানোর প্রস্তাব দেন। কিন্তু প্রথম পারমাণবিক বোমাটি বিস্ফোরিত হবার আগেই তিনি প্রকাশ্যে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে থাকেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে নিউক্লিয়ার অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করেন।

শান্তির পথে আইনস্টাইনের প্রচেষ্টা থেকে সম্ভবত জীবনের কোনো অংশেই স্থায়ীভাবে কিছু অর্জিত হয়নি। অল্প কিছু বন্ধু পেয়েছিলেন–এই যা। জায়োনিজমের প্রতি তাঁর জোরালো সমর্থনের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৫২ সালে তাঁকে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তাঁর কাছে নিজেকে রাজনীতেতে কাঁচা মনে হয়েছিল। কিন্তু মূল কারণ সম্ভবত ভিন্ন ছিল, যা মনে হয় তাঁর এই বক্তব্য থেকে, 'আমার কাছে সমীকরণের গুরুত্ব আরো বেশি, কারণ রাজনীতি তো শুধু বর্তমানের জন্য, কিন্তু একটি সমীকরণ টিকে থাকবে চিরকাল।'

www.pathagar.com

গ্যালিলিও গালিলেই

সম্ভবত আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশে অন্য যে কারো চেয়ে এককভাবে গ্যালিলিওর অবদান বেশি। ক্যাথলিক গির্জার সাথে তাঁর বিখ্যাত দ্বন্দ্বই ছিল তাঁর দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। এর কারণ, তিনি যুক্তি দেখান যে মানুষও জানার আশা করতে পারে যে বিশ্বজগৎ কী নিয়মে কাজ করে এবং এই আশা পূরণের জন্য বাস্তব জগৎকে পর্যবেক্ষণও করা যাবে। গ্যালিলিও শুরু থেকেই ছিলেন কোপার্নিকান তত্ত্বে (গ্রহরা সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এই ধারণা) বিশ্বাসী। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে এটি প্রচার শুরু করেন এই ধারণার পক্ষে প্রমাণ হাতে পাবার পরই। তিনি ইতালিয়ান ভাষায় কোপার্নিকান তত্ত্ব লেখেন (প্রচলিত ল্যাটিনের বদলে)। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর মত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে গৃহীত হতে থাকে। অ্যারিস্টটলপন্থী অধ্যাপকরা গেলেন বিগড়ে। তাঁরা কোপার্নিকান তত্ত্ব নিষিদ্ধ করার জন্য ক্যাথলিক গির্জাকে রাজি করতে এক কাতারে শামিল হলেন।

গ্যালিলিও চিন্তায় পড়ে গিয়ে পাড়ি জমান রোম শহরে। গির্জা কর্তৃপক্ষের কাছে যুক্তি তুলে ধরলেন যে আমাদেরকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে জানানো বাইবেলের কাজ নয় এবং যেখানে স্বাভাবিক বুদ্ধির সাথে বাইবেলের অমিল ঘটবে, ধরে নিতে হবে এখানের কথাগুলো রূপক।

কিন্তু গির্জা ভয় করছিল প্রোটেস্টান খ্রিস্টানদের। (খ্রিস্টানদের প্রধান দুই দল হচ্ছে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান। প্রোটেস্টানরা নিজেদেরকে বেশি মৌলবাদী দাবি করে) তারা কেলেঙ্কারি রটিয়ে দিতে পারে, এই ভয়ে গ্যালিলিওর বিরুদ্ধেই দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলো। ১৬১৬ সালে কোপার্নিকান তত্ত্বকে 'ভুল ও মিথ্যা' বলে ঘোষণা করা হয়। গ্যালিলিওকে নির্দেশ দেওয়া হলো যাতে আর কখনো এই মতকে বিশ্বাস বা সমর্থন করা না হয়। গ্যালিলিও নির্বিবাদে মেনে নিলেন।

www.pathagar.com

১৬২৩ সালে গ্যালিলিওর দীর্ঘদিনের এক বন্ধু পোপ নির্বাচিত হলেন। গ্যালিলিও সাথে সাথে ১৬১৬ সালের আদেশ উঠিয়ে নেবার চেষ্টা চালালেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। তবে অ্যারিস্টটল ও কোপার্নিকাসের থিওরি নিয়ে একটি বই লেখার অনুমতি নিতে পারলেন। অবশ্য শর্ত দেওয়া হলো দুটি। এক, তিনি কোনো পক্ষ নিতে পারবেন না, এবং দুই, তিনি এই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না যে মানুষ কখনো জানতে পারবে যে কীভাবে জগৎ কাজ করে, কারণ ঈশ্বরের কোনো কোনো কাজ মানুষের চিন্তার জগৎকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাই এই সিদ্ধান্ত হবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাজকে সীমিত করা।

১৬৩২ সালে তাঁর বই, 'ডায়ালগ কনসার্নিং দ্য টু চিফ ওয়ার্ল্ড সিস্টেমস' লেখা শেষ হয়ে প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশিত হলো গির্জার বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থেকেই। প্রকাশ হবার পরপরই এটি সাহিত্য ও দর্শনের অনন্য নিদর্শন হিসেবে সমগ্র ইউরোপজুড়ে সমাদৃত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেল, বইটির মাধ্যমে মানুষ কোপার্নিকাসের মতবাদের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। প্রকাশের অনুমতি দিয়ে এখন পোপ আক্ষেপ করতে লাগলেন। পোপ যুক্তি দেখালেন যে যদিও সেন্সর বোর্ড বইটি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে, তবু বইটিতে ১৬১৬ সালের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। গ্যালিলিওকে ইনকুইজিশনে (গির্জার আদালত) ডাকা হলো। তাঁর শাস্তি নির্ধারণ হলো আজীবন গৃহবন্দিত্ব। এ ছাড়া বলা হলো প্রকাশ্যে কোপার্নিকাসের মতবাদ প্রত্যাহার করতে হবে। গ্যালিলিও দ্বিতীয়বারের মতো শান্ত রইলেন।

ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি গ্যালিলিও অনুগতই রইলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের স্বাধীনতার প্রতিও বিশ্বাস হারাননি। ১৬৪২ সালে তাঁর মৃত্যুর চার বছর আগে, গৃহবন্দি থাকার সময়েই তাঁর দ্বিতীয় প্রধান বইটি হল্যান্ডের এক প্রকাশকের কাছে গোপনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর নাম ছিল *টু নিউ সায়েন্সেস*। এতে তিনি শুধু কোপার্নিকাসকে সমর্থনই করেননি, নিজেও বাড়তি কিছু করেছেন। এটাই পরে পরিণত হয়েছিল আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি।

www.pathagar.com

আইজ্যাক নিউটন

নিউটন সাহবে খুব একটা সুবিধার মানুষ ছিলেন না। অন্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুব খারাপ। জীবনের শেষের দিকে তাঁর বেশির ভাগ সময় কেটেছে উত্তপ্ত বিতর্কের মধ্য দিয়ে। নিঃসন্দেহে তাঁর প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী বই। এটি প্রকাশের পরপরই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তাঁকে রয়েল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট বানানো হয়। তিনিই বিজ্ঞানী হিসেবে প্রথম নাইট হবার সুযোগ পান।

অল্প দিনের মধ্যেই তিনি রাজকীয় জ্যোতির্বিদ (প্রচলিত নাম অ্যাস্ট্রোনোমার রয়েল) জন ফ্ল্যামস্টিডের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। অথচ ইনিই নিউটনকে প্রিন্সিপিয়া প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। তবে এবার নিউটনের সহযোগিতার রাস্তা বন্ধ হলো। নিউটনও ছেড়ে কথা বললেন না। তিনি রয়েল অবজারভেটরির পরিচালনা পর্ষদে স্থান করে নিতে সক্ষম হলেন। এবার দ্রুত উপাত্তগুলো প্রকাশনার চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ফ্ল্যামস্টিডের গবেষণাকর্ম জব্দ করে ফেললেন। উপরন্তু এগুলো ফ্ল্যামস্টিডের জানের শত্রু এডমন্ড হ্যালিকে দিয়ে প্রকাশ করার জন্য সব রকম প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। কিন্তু ফ্ল্যামস্টিড চলে গেলেন আদালত পর্যন্ত। ঠিক সময়মতোই তাঁর চুরি হওয়া গবেষণার প্রকাশনা বন্ধ করতে আদালতের আদেশ অর্জন করে নিতে পারলেন। নিউটনের মেজাজ সপ্তমে উঠে গেল। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁর প্রিন্সিপিয়ার পরবর্তী সংস্করণগুলো থেকে ফ্ল্যামস্টিডের সব রেফারেন্স ধীরে ধীরে উঠিয়ে নিলেন।

আরো ভয়াবহ বিবাদে লিপ্ত হন জার্মান দার্শনিক গটফ্রিড লিবনিজের সাথে। নিউটন ও লিবনিজ দুজনেই গণিতের ক্যালকুলাস নামে একটি শাখা তৈরি করেন। আধুনিক পদার্থবিদ্যার অন্যতম ভিত্তি এই ক্যালকুলাস। এখন আমরা জানি যে নিউটন লিবনিজের অনেক বছর আগেই ক্যালকুলাস

www.pathagar.com

আবিষ্কার করেছিলেন। তবে তিনি তা প্রকাশ করেন অনেক দেরি করেন। কে আগে আবিষ্কার করেছেন তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠল। দুই পক্ষেই কিছু বিজ্ঞানী শক্ত অবস্থান নিলেন। তবে মজার ব্যাপার হলো, নিউটনের পক্ষে লেখা বেশির ভাগ রচনাই নিউটন নিজে লিখে বন্ধুদের নাম দিয়ে প্রকাশ করতেন।

বিতর্ক চরমে উঠলে লিবনিজ একটি ভুল করে বসলেন। তিনি রয়েল সোসাইটিকে এই বিতর্ক সমাধান করে দিতে প্রস্তাব দিলেন। এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিউটন অনুসন্ধান চালানোর জন্য একটি 'নিরপেক্ষ' কমিটি করে দিলেন। মজার ব্যাপার হলো, এই কমিটির সদস্যরা সবাই ছিল নিউটনেরই বন্ধু। কিন্তু এটাই শেষ নয়। নিউটন পরে নিজেই কমিটির রিপোর্ট লিখেন। রয়েল সোসাইটি রিপোর্ট প্রকাশও করল। এতে বলা হল, লিবনিজ গবেষণাকর্ম চুরি করেছেন। এতেও নিউটন শান্তি পাননি। তিনি রয়েল সোসাইটির নিজস্ব সাময়িকীতে রিপোর্টটি সম্পর্কে বেনামে একটি রিভিউ লিখেন। জানা যায়, লিবনিজের মৃত্যুর পরে নিউটন বলেন যে তিনি 'লিবনিজের বুক ভাঙতে পেরে' চরম তৃপ্তি পেয়েছেন।

এই দুই বিতর্কের সময়কালের মধ্যেই নিউটন ক্যামব্রিজ ও একাডেমিক জগত ছেড়ে চলে আসেন। তিনি ক্যামব্রিজে ক্যাথলিক বিরোধিতায় এবং পরবর্তীতে পার্লামেন্টের রাজনীতিতে সক্রিয় হন। শেষ পর্যন্ত রয়েল মিন্ট এর ওয়ার্ডেনের মতো লোভনীয় পদ অর্জন করেন। এখানে এসে তিনি এবার সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে তাঁর বুদ্ধি খরচ করতে থাকেন উগ্র অপকৌশলের পেছনে। অবশ্য এখানে তিনি নকলবাজির বিরুদ্ধেও তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু ব্যক্তিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডও দেন।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ISBN 978 984 927730 9